আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ. এর
বক্তৃতামালার অমর সংকলন

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম



আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ. এর
বক্তৃতামালার অমর সংকলন

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম-১

অনুবাদ
মাওলানা আবু সাকী মাহবুব
মুহাদ্দিস, সম্পাদক ও সাহিত্যিক
ফাযেলে হাটহাজারী।

বইঘর
[অভিজাত বইয়ের ঠিকানা]
৪৩ ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
দূরালাপনী : ০১৭১১৭১১৪০৯, ০১৭১৭৫৫৪৭২৭
e-mail: boighorbd@gmail.com, boighor2008@gmail.com
web: www.boighorbd.com

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম-১
কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ.

প্রকাশক
ব ই ঘ র -এর পক্ষে
এস এম আমিনুল ইসলাম

© সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
মে ২০১০
দ্বিতীয় মুদ্রণ
অক্টোবর ২০১১
তৃতীয় মুদ্রণ
আগস্ট ২০১৩
চতুর্থ মুদ্রণ
মে ২০১৬
৫ম মুদ্রণ
জানুয়ারী ২০১৭
৬ষ্ঠ মুদ্রণ
জুলাই ২০১৮

প্রচ্ছদ
আরিফুর রহমান

কম্পোজ
ব ই ঘ র বর্ণসাজ
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৭১১৭১১৪০৯

মুদ্রণ : মাসুম আর্ট প্রেস
২৬/২ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৪০০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-70168-0016-0

KHOTOBAT-E-HAKIMUL ISLAM : Translate by Abu Saki Muhbub
Published by : S M Aminul Islam, BhoiGhor : 43 Islami Tower Ground floor
11/1 Banglabazar, Dhaka-1100 First Edition : May 2010, Sixth Edition : July
2018 © by the publisher

Price : 400 Taka onl

অ র্প ণ

পড়তে শেখার আগে নবী-রাসূলগণের
কাহিনী ও ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্যের
ঘটনাবলী অতি যত্নে তিনি আমাদেরকে
বার বার শুনিয়েছেন। পড়তে শিখে
অনেক পড়েছি, অনেক জেনেছি; কিন্তু এ
মহীয়সীর উচ্চতাকে ছুঁতে পারিনি–
আমার ক্ষুদ্রতা নিয়ে ধন্য আমি **মা**

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

প্রকাশকের নিবেদন

ইদানীং ভিন্ন ভাষার মনীষীদের অনূদিত বক্তৃতা প্রকাশের প্রবল জোয়ার বইছে বলা চলে। বাংলা ভাষাভাষীরা এতে উপকৃতও হচ্ছেন যথেষ্ট। সেই তুলনায় উপমহাদেশের যুগশ্রেষ্ঠ আলেমেদীন বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দের অর্ধশতকেরও অধিক সময়ের মুহতামিম আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ. অনেকটা উপেক্ষিতই রয়েছেন বলা চলে। অথচ উপমহাদেশের ক্ষণজন্মা এ মনীষীর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে হকের পয়গাম মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিতে রয়েছে লেখনি ও বক্তৃতামালার অসামান্য অবদান। সেসব আকর গ্রন্থগুলি আরবি উর্দুসহ নানা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়ে মুসলমানদের আল্লাহমুখী জীবন গঠনে অবদান রেখে চললেও বাংলা ভাষায় তা যথেষ্ট পরিমাণে অনুপস্থিত। উল্লেখ্য, কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ.-এর ব্যক্তিগত জ্ঞান, প্রজ্ঞা, স্মরণশক্তি ও মেধা এবং বংশীয় পরিচিতির সুবাদে তিনি শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করেই দারুল উলুমে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তি লাভ করেন। তেমন যোগ্যতা ছিল বলেই মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের মতো একটি বিশ্বখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মুহতামিমের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। সফল শিক্ষকতা এবং সুদক্ষ পরিচালনা ছাড়াও তিনি ওয়াজ নসীহত এবং বক্তৃতার ক্ষেত্রে অসামান্য যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর সুললিত বক্তৃতা ও আলোচনা শ্রোতাসাধারণকে মুগ্ধ করত। অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও তিনি একটানা কয়েক ঘণ্টা বক্তৃতা করতে পারতেন। শরীয়তের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও গভীর রহস্য আলোচনা এবং বিষয়বস্তুকে সংক্ষেপে বোধগম্য করিয়ে দিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণীও তাঁর বিজ্ঞচিত আলোচনায় উপকার লাভ করতেন। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়সহ ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর

বক্তৃতার আয়োজন করা হতো। কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মুদ্রিত করে প্রকাশও করা হয়। তাঁর সেসব মূল্যবান বয়ানগুলোই 'খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম' নামে দশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, যা একাধারে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার এবং ইসলামী সাহিত্যের সুবিশাল আকর। তাঁর বক্তৃতা সম্পর্কে বলা যায়– নিখিল ভারতের এমন কোন প্রদেশ নেই, যেখানে তাঁর বক্তৃতার ধ্বনি পৌঁছায়নি।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, জ্ঞানতাপস আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই মনীষীর বিখ্যাত সেই বক্তৃতাগুলো এখনো বাংলা ভাষাভাষীদের সামনে অনুপস্থিত। আমরা সীমিত সাধ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও স্বপ্ন দেখার তাওফিক যিনি দিয়েছেন তাঁর ভাণ্ডারে তো কমতি নেই। সেই ভরসা আর দীন প্রসারের অদম্য বাসনাকে পুঁজি করে এই মনীষীর সেরা সংকলন হিসেবে বিবেচিত 'খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম' বাংলায় প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। পাশাপাশি তাঁর অন্যান্য গ্রন্থাদিও বাংলায় প্রকাশের ইচ্ছে আমাদের রয়েছে। প্রথম খণ্ডটি অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদক আবু সাকী মাহবুবকে অনেক জ্বালাতন করেছি। আশা করি এমন নির্মম জ্বালাতনের ভয়ে হলেও তিনি বাকী খণ্ডগুলোর অনূদিত কপি আমাদের হাতে দ্রুততম সময়ে পৌঁছে দিবেন। আমাদের এ কাজ নিতান্ত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে নয়– পাঠক মাত্রই তা বুঝবেন। তাই আমাদের অগ্রযাত্রায় আপনাদের সার্বিক পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করি। কষ্টসাধ্য এ কাজের বদলা মহান আল্লাহ তাআলা এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে দান করুন।

তারিখ : দুআর মুহ্তাজ

১ মে ২০১০ ঈ. এস এম আমিনুল ইসলাম

অনুবাদকের আরয

শায়খুল আরব ওয়াল আজম, আরিফ বিল্লাহ্, জামিউল উলুম ওয়াল মারিফাত, কুতুবুল ইরশাদ হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব (রহ.)কে আল্লাহ তাআলা অশেষ ও অদ্বিতীয় দীনি খেদমতের সৌভাগ্যে সৌভাগ্যশালী করেছেন। লেখনি ও বয়ানের মাধ্যমে তিনি কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক ও কার্যকর তালিম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়েছেন। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকার শতাধিক দেশের কোটি মানুষ দীনের সঠিক বুঝ গ্রহণ ও তাতে অটল থাকার ব্যাপারে তাঁর ইলম দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। দীর্ঘ ৫৯ বছর তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম ছিলেন। এ সময়ে তিনি হাজী ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) ও হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর ভাবনাকে দারুল উলুম দেওবন্দে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আল্লামা ইকবালের ভাষায়– প্রত্যেক সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মুসলমানের মাসলাকে পরিণত হয়েছে। দেওবন্দ মাদরাসার প্রথম ঊনষাট বছরের জীবনে পাঁচজন মুহতামিম তাঁদের খালেস খেদমতের মাধ্যমে জাতীয় জ্ঞান কেন্দ্রের মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। পরবর্তী ঊনষাট বছর হাকীমুল ইসলাম কারী মুহাম্মদ তৈয়ব (রহ.) একা এ দীনি প্রতিষ্ঠানটিকে তাঁর অসাধারণ গুণাবলী ও বিশ্বমানের ব্যক্তিত্ব দিয়ে 'কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে' পরিণত করেছেন।

হাকীমুল ইসলাম (রহ.) যেমনিভাবে আকাবিরগণের রূহানী ফয়েযের ধারক ছিলেন তেমনিভাবে আল্লাহ তাঁকে ইলমী ফয়েযও দান করেছিলেন। বিশেষ করে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর ইলমের সাথে পূর্ণ মুনাসাবাত দান করেছিলেন। এই বিশেষত্বের কারণেই তাঁর বয়ান ও খুতবাসমূহের ফয়েয জাতির কোন বিশেষ স্ত

রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সবার জন্য ব্যাপক বিস্তৃত। আলোচ্য গ্রন্থে হাকীমুল ইসলাম কারী মুহাম্মদ তৈয়ব (রহ.)-এর বয়ানসমূহ সংকলিত হয়েছে। দেওবন্দের 'হাকীমুল ইসলাম একাডেমী' এ বয়ানগুলো সংকলনের দুরূহ কাজটি সম্পাদন করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছে। বহমান গ্রন্থটি দশ খণ্ডে সমাপ্ত প্রাথমিক সংকলনের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ।

এ গ্রন্থটির বিশেষত্ব ও গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে অনেকদিন পূর্বেই এর অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছিলাম। নানা ব্যস্ততার কারণে শেষ করতে দেরি হয়ে গেল। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর ইচ্ছায় গ্রন্থটি এখন আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাষাকে যথাসম্ভব সহজ ও সাবলীল রাখতে চেষ্টা করেছি। বয়ানের আমেজ যেন বজায় থাকে সে দিকটিও বিবেচনায় ছিল।

প্রথম যুগে হযরতের বয়ানগুলো হাতে লিখে সংরক্ষণ করা হত। এ কাজ করার জন্য আলেমদের একটি দল তৈরি হয়ে গিয়েছিল। হযরত বয়ান করার সময় তারা দ্রুততার সাথে প্রতিটি শব্দ লিখে নিতেন। টেপ রেকর্ডারের যুগ আসার পর তাঁর বয়ানগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ক্যাসেটে ধারণ হতে থাকে। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সে বয়ানগুলোকেই সংগ্রহ করে হাকীমুল ইসলাম একাডেমী গ্রন্থরূপে প্রকাশ করেছে। তাই বাংলায় এ অনুবাদ গ্রন্থটি প্রকাশের শুভ মুহূর্তে বিশেষ কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি হাকীমুল ইসলাম একাডেমীর পরিচালক ও হযরতের সাহেবজাদা মাওলানা মুহাম্মদ সালেম কাসেমী সাহেবকে, যাঁর সরাসরি তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনায় বয়ানগুলো গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। এছাড়া স্মরণ করছি মাওলানা মুহাম্মদ ইদরিস হুশিয়ারপুরী সাহেব– যিনি দিন-রাত খেটে ক্যাসেট থেকে শোনে বয়ানগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন। একই সাথে বিশেষ কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি চিন্তাশীল সুলেখক ও সফল অনুবাদক হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীনকে– যিনি আমার অনুপস্থিতিতে প্রথম দুই খণ্ডের প্রচ্ছদের শিল্প নির্দেশনা দিয়ে গ্রন্থদুটিকে

দৃষ্টিনন্দন করে তুলেছেন। আল্লাহ এঁদের শ্রমকে কবুল করুন এবং জাযায়ে খায়ের দান করুন।

গ্রন্থটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে আমার না যতটা কৃতিত্ব তার চেয়ে অনেক বেশি কৃতিত্ব প্রিয় বন্ধু সুসাহিত্যিক সমর ইসলাম ও প্রকাশক এস এম আমিনুল ইসলামের। তাঁদের দু'জনার অবিরাম প্রেরণা, তাগাদা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা না থাকলে এ কাজটি হয়তো কখনোই আমার দ্বারা করা সম্ভব হতো না। তাঁদের প্রতি সত্যিই আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এ ছাড়া আমার পরিবারের লোকজন ও সহকর্মীগণ আমাকে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। আমার অত্যন্ত প্রিয় দুই হাফেয ছাত্র-ছাত্রী আলিমা রহমান ও কণ্ঠশিল্পী আবু বকর সিদ্দিক আহাদ কুরআনের আয়াতের সূত্র খুঁজতে সাহায্য করেছে। আরো যারা নানাভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

অনেকটা তাড়াহুড়োর মধ্যে গ্রন্থটি প্রকাশ করতে হয়েছে। যদিও আমরা নির্ভুল করার প্রাণান্তর চেষ্টা করেছি, তথাপি ভুল-ত্রুটি থাকা বিচিত্র নয়। এক্ষেত্রে আমরা সম্মানিত পাঠকদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দান করুন।

তারিখ :
২৫ এপ্রিল ২০১০ ঈ.

মা'আস্‌সালাম
আবু সাকী মাহবুব

আমাদের প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই–

- খুত্‌বাতে হাকীমুল ইসলাম / কারী মুহাম্মদ তৈয়ব (রহ.) [১-১০ খণ্ড]
- ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ / মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
- উসওয়ায়ে আসহাবে রাসূল / মাওলানা আবদুস সালাম নদভী (রহ.)
- ফতোয়ায়ে উসমানী / জাস্টিস মাওলানা তকী উসমানী [১-৪ খণ্ড]
- ইসলাম ও বিজ্ঞান / হাকীমুল ইসলাম কারী মুহাম্মদ তৈয়ব (রহ.)
- নামাযের কিতাব / হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (রহ.)
- ইলমী বয়ান / মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী
- ক্ষণস্থায়ী রঙিন দুনিয়া / জাস্টিস মাওলানা তকী উসমানী
- কুরআন আপনাকে কী বলে / প্রফেসর আহমদ উদ্দিন মাহবারবী
- দীনী দাওয়াত ও আল্লাহর মদদ / মাওলানা তারিক জামীল
- কালের আয়নায় মুসলিমবিশ্ব / শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)
- বাংলার শত আলেমের জীবনকথা / মাওলানা এস এম আমিনুল ইসলাম
- আকাবির ওলামায়ে দেওবন্দ / হাফেয আকবর শাহ বুখারী রহ.
- আল কুরআনের ১৬০ মুজিজা ও রহস্য / ড. মাজহার ইউ কাজী
- ইসলামে পারিবারিক-সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য / ড. মাজহার ইউ কাজী
- পাশ্চাত্য নারী সমাজ ও ইসলাম / জাস্টিস মাওলানা তকী উসমানী
- মহাসত্যের সন্ধানে ২৫০ বছর হযরত সালমান ফারসি রা. / মাওলানা আনওয়ারুল করীম
- ইসলাম বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে পর্দার বিধান / মাওলানা এস এম আমিনুল ইসলাম
- আল্লাহর ভয়ে যে চোখ কাঁদে / ড. মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আরেফি
- লাভ ম্যারেজ / শায়খ ড. আলী তানতাভী রহ.
- হে আমার ছেলে / শায়খ ড. আলী তানতাভী রহ.
- হে আমার মেয়ে / শায়খ ড. আলী তানতাভী
- লেট ম্যারেজ / শায়খ ড. আলী তানতাভী রহ.
- অপারেশন থিয়েটার / শায়খ ড. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আরিফি
- হৃদয়ের অশ্রু / মাওলানা মুহাম্মদ তাহের নাক্কাশ
- কালের কথা ধর্মের কথা / মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
- অসৎ নারীর পরিণতি / মুফতি আব্দুর রউফ করাচি
- বিজয়ের গল্প-১ স্পেন বিজয়ী তারেক বিন জিয়াদ / সমর ইসলাম
- বিজয়ের গল্প-২ খালিদ বিন অলিদ: মহাবীরের মহাবিজয় / সমর ইসলাম
- বিজয়ের গল্প-৩ মিশর-বিজেতা আমর বিন আস / সমর ইসলাম
- ইতিহাসের গল্প-১ ভারত শাসন করলো যারা / মো. জেহাদ উদ্দিন
- ইতিহাসের গল্প-২ ভারতবর্ষের মুসলিম শাসকদের অজানা কথা / মো. জেহাদ উদ্দিন
- ইতিহাসের গল্প-৩ / গল্প নয় সত্যি / মো. জেহাদ উদ্দিন
- ইতিহাসের গল্প-৪ / সোনালী দিনের কাহিনী / মো. জেহাদ উদ্দিন
- ছোটদের ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. / সমর ইসলাম
- ছোটদের ইমাম বুখারী রহ. / সমর ইসলাম

সূ চি প ত্র

বয়ান : ১

মুহাম্মদ সা.-এর পবিত্র জন্ম প্রসঙ্গে অতুলনীয় আলোচনা / ২০
রাসূল (সা.)-এর শারীরিক ও আত্মিক জন্ম / ২২
রূহানী জন্মের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের আমলের ধরন / ২৩
রূহানী জন্মই প্রকৃত উদ্দেশ্য / ২৪
রাসূল (সা.)-এর শারীরিক সৌন্দর্য / ২৫
কুরআনের আলোকে মহানবী (সা.)-এর সৌন্দর্য / ২৬
ইউসুফ (আ.)-এর রূপের উপর মুহাম্মদ (সা.)-এর
সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠত্ব / ৩০
সীরাতুন্নবী (সা.) কাকে বলে / ৩২
পবিত্র সীরাতের প্রথম অংশ / ৩৩
নবীগণ নিষ্পাপ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ / ৩৫
নবীগণ নিষ্পাপ হওয়ার তৃতীয় কারণ / ৩৬
নবুওয়তের পূর্বেও নবীগণ নিষ্পাপ থাকেন / ৩৭
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধ্বংসাত্মক প্রভাব / ৪১
নবীগণের নিষ্পাপতা জবরদস্তিমূলক নয় ঐচ্ছিক / ৪৩
গুনাহর কাজের মাধ্যমে দীনের দাওয়াত দেয়া
তাবলীগের নীতির পরিপন্থী / ৪৪
রাসূল (সা.)-এর পবিত্র চরিত্রের ব্যাপারে অমুসলিমদের সাক্ষ্য / ৪৬
ইসলামী আইন চিরস্থায়ী ও বিশ্বজনীন / ৪৯
রাসূল (সা.)-এর চরিত্রের এক টুকরো ঝলক / ৫১
রাসূল (সা.)-এর সীরাতকে ধারণ করার ক্ষমতা
সকলের থাকে না / ৫২
তিনি শুধু নবী নন বরং সর্বশেষ নবীও / ৫৬
খাতামুন্ নাবিয়্যিন দ্বারা উদ্দেশ্য / ৫৮
নবুওয়াতের সূর্যোদয় / ৬১
পরবর্তী সময়ে নবী-নূরের প্রকাশ পদ্ধতি / ৬২
নবুওয়াতের পূর্ণতার প্রমাণ / ৬৩
সীরাত আলোচনার পরিসমাপ্তি / ৬৪

বয়ান : ২

নবুওয়াতের মর্যাদা এবং তার প্রভাব ও উদ্দেশ্য / ৬৬
বৈপরীত্যশীলতার জগতে বস্তুর বৈপরীত্যের হেকমত / ৬৮
অন্ধকারে আলোর দিশা / ৬৯
আরব জাতির মাঝে রাসূল (সা.)-এর দাওয়াতের প্রভাব / ৭১
নবুওয়াতের ভিত্তি / ৭৩
পার্থিব সৌভাগ্যের ভিত্তি হল ইলম ও আমলের পূর্ণতা / ৭৪
আমলের ভিত্তি হল আখলাক / ৭৫
শরীয়ত ও তরিকতের অপরূপ সমন্বয় / ৭৬
আলেমগণ ও সুফীগণের মধ্যে সংঘর্ষ কেন / ৭৭
খাজা নিজামুদ্দিনের ধর্ম-সঙ্গীতের আসর ও
হাকিম জিয়াউদ্দিনের প্রতিবাদ / ৭৮
হাকিম জিয়াউদ্দিন (রহ.)-এর মর্যাদাগত অবস্থান / ৮০
খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রহ.)-এর মর্যাদাগত অবস্থান / ৮১
ধর্ম-সঙ্গীতের ব্যাপারে হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর ঘটনা / ৮২
বিশেষ ব্যক্তিবর্গের দায়িত্বশীলতা / ৮৩
রাসূল (সা.)-এর ইলম / ৮৫
সম্মিলিত ইলমে নববীর স্বরূপ দৃষ্টান্ত / ৮৫
হযরত মুহাম্মদ (সা.) অন্যান্য নবীরও নবী / ৮৮
রাসূল (সা.)-এর ইলমের দীপ্তি / ৯০
স্বপ্ন তাবিরের কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনা / ৯০
রাসূল (সা.)-এর আখলাকের দীপ্তি / ৯৮
পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহের সাথে শরীয়তে
মুহাম্মদীর আখলাকের তুলনা / ১০০
রাসূল (সা.)-এর ইলমী মুজেযা / ১০৪
ইলমী মুজেযা দান করার হেকমত / ১০৬
মুহাম্মদী সত্তার বিস্ময় / ১০৭
কুরআন অন্যকেও মুজেযার অধিকারী করে / ১০৯
সাহাবীগণের মর্যাদা / ১১১
উম্মতে মুহাম্মদীর মর্যাদাগত অবস্থান / ১১৩
শেষ কথা / ১১৬

বয়ান- ৩

আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলগণ : হেদায়েতের জন্য উভয়ই আবশ্যক / ১১৮
দীনি ইতিহাসের অভিন্ন মূলনীতি / ১২০
আল্লাহর ছাত্র এবং মানব শিক্ষক / ১২১
কুরআনের শব্দ ও অর্থ উভয়ই সংরক্ষিত / ১২২৪
আল্লাহ তাআলার উদ্দিষ্ট অর্থ সাহাবারাও বুঝতে পারেননি / ১২৭
কুরআনের নিজস্ব পরিভাষা / ১২৮
শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা / ১২৯
কুরআনের অর্থ সংরক্ষণ / ১২৯
কুরআনের অর্থের ব্যাপারে নিজস্ব মতামত প্রদান / ১৩১
হেকমতের তালিম / ১৩২
আত্মশুদ্ধি এবং রাসূল (সা.)-এর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি / ১৩৪
সকল আমলে সমতা বিধান / ১৩৭
অন্তরের ব্যাধির চিকিৎসা / ১৩৮
নবীগণের দায়িত্বের বিষয়বস্তু / ১৪০
উম্মতের দায়িত্ব / ১৪২
কিতাব এবং ব্যক্তিসত্তা উভয়ই আবশ্যক / ১৪৪
সাহাবায়ে কেরাম এবং আল্লাহর ওলীগণ কি সত্যের মাপকাঠি / ১৪৬
সাহাবায়ে কেরামের তাকওয়ার পূর্ণতা / ১৪৯
তালিম ও তারবিয়াতের স্তর / ১৫১
সন্তানের তারবিয়াত / ১৫২

বয়ান ৪

ইলমী মুজেযা / ১৫৪
কথার গুরুত্বের মাপকাঠি / ১৫৬
নারীদের কথার গুরুত্বহীনতার কারণ / ১৫৮
কথার মাধ্যমেই ব্যক্তিপ্রকৃতির প্রকাশ ঘটে / ১৫৯
চরিত্র মাধুর্যের আবশ্যকতা / ১৬০
রূপ কেন গুরুত্বহীন / ১৬১
কালামুল্লাহর মহামাহাত্ম্য / ১৬৩
মুজেযার স্বরূপ / ১৬৪
পবিত্র কুরআন প্রকৃত অর্থেই আল্লাহর কালাম ও আল্লাহর কিতাব / ১৬৮
কুরআনের এক আশ্চর্য নমুনা / ১৬৯
আয়াতের উদ্দিষ্ট অর্থ আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট / ১৬৯

কুরআনের কুরআন হওয়া হাদীসের উপর নির্ভরশীল / ১৭০
ফিকাহ্-এর দলিল / ১৭২
আল্লাহর কালাম কেন বিলীন হবার নয় / ১৭৪
পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ বিলীন হলেও
কুরআন বিলীন হবার নয় / ১৭৫
কুরআনের সনদের শুদ্ধতা / ১৭৭
কুরআনের সনদের উপর আপত্তির উত্তর / ১৭৮
কাফেররাও বার্তাবাহকের মিথ্যা বলাকে দোষ মনে করে / ১৮১
তিন বিশ্বস্ততা কালামুল্লাহকে ঘিরে রেখেছে / ১৮২
কুরআনের প্রমাণে রাসূল (সা.)-এর সত্তার মর্যাদা / ১৮২
কুরআনের সনদের উপর নীতিগতভাবেই
কোন আপত্তি করা যায় না / ১৮৫
দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি সম্ভব নয় / ১৮৬
হযরত নানুতবী (রহ.)-এর কুরআন হিফয করার ঘটনা / ১৮৮
হযরত মাদানী (রহ.)-এর কুরআন হিফয করার ঘটনা / ১৮৮
অমনোযোগীদের কাছ থেকে কুরআন দূরে চলে যায় / ১৮৯
কুরআন সংরক্ষণের পদ্ধতি / ১৮৯
কুরআন দ্বারা অমুসলিমরাও প্রভাবিত হয় / ১৯০
কুরআনের সংরক্ষকগণ আল্লাহর খলিফা / ১৯১
কুরআন সংরক্ষকগণের উপাধি ও মর্যাদা / ১৯২
কুরআনুল কারীম দীন ও দুনিয়ার উন্নতির সোপান / ১৯৪

বয়ান : ৫

মূর্খ আরব থেকে সাহাবার মর্যাদা / ১৯৬
নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য / ১৯৮
জাহেলী যুগের সংক্ষিপ্ত চিত্র / ২০০
নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য / ২০২
পশ্চাৎপদ আরব জাতির উত্থান কিভাবে হল / ২০৩
স্বভাবগত জ্ঞান দ্বারা মানুষের উৎকর্ষতা সাধিত হয় না / ২০৪
প্রাণীদেরও চিকিৎসা-জ্ঞান রয়েছে / ২০৫
একটি সন্দেহের জবাব / ২০৭
রাসূলগণ আনীত ইলম কোনটি / ২০৮
আরব জাতির মধ্যে ইলমে রব্বানীর প্রভাব / ২০৯
আখলাকের পবিত্রতার ভিত্তিতে পবিত্র কাজ সম্পাদিত হয় / ২১৩
সাধ্যমত প্রচেষ্টা করা আবশ্যক / ২১৪

অমুসলিমদের আপত্তি / ২১৬
মুসলমানরাই ইসলামের সর্বনাশের জন্য দায়ী / ২১৭
উন্নতির সোপান / ২১৮
তালিম ও তারবিয়াত লাভের সহজ পদ্ধতি / ২১৯
জাতীয় সমস্যাবলীর সংক্ষিপ্ত সমাধান / ২২০

বয়ান : ৬

পবিত্র মানব জীবন / ২২২
জীবন একটি পবিত্র আমানত / ২২৪
জীবনের মূল উপাদান / ২২৪
মানব জীবনের প্রথম ধাপ : জৈবিকতা / ২২৫
মানব জীবনের দ্বিতীয় ধাপ : বুদ্ধি ও বিবেক / ২২৭
মানব জীবনে বিবেকের শাসন / ২৩০
মানব জীবনের তৃতীয় ধাপ : ঈমানের শাসন / ২৩১
মানব জীবনের চতুর্থ ধাপ : আধ্যাত্মিক জীবন / ২৪০
মানব জীবনের পঞ্চম ধাপ : ফানাফিল্লাহ / ২৪৫
শেষ কথা / ২৪৮

বয়ান : ৭

ইলমের দর্শন / ২৫০
ইলমের অন্বেষণ স্বভাবজাত / ২৫২
ইলম অর্জনের মাধ্যম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ / ২৫৩
আমলের অঙ্গ অপেক্ষা ইলমের অঙ্গ ফযিলতপূর্ণ / ২৫৪
ইলমের মর্যাদা রক্ষা করা / ২৫৫
দুনিয়া অন্বেষণকারীর দুনিয়াও মেলে না : দীন
অন্বেষণকারীর উভয় মিলে / ২৫৬
দুনিয়াবিমুখতা ও তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে দুনিয়া অর্জিত হয় / ২৫৮
রিযিকের জিম্মাদারী বান্দার নয় আল্লাহর / ২৬১
ইলমের অমর্যাদা করার দ্বারা ইসলামের সৌভাগ্য
ছিনিয়ে নেয়া হতে পারে / ২৬৩
আমলের অঙ্গ দৌলতের অঙ্গ অপেক্ষা উত্তম / ২৬৪
দৌলতের অঙ্গের হাকীকত / ২৬৪
ইলম আল্লাহর গুণ এবং মাল উদরের গুণ / ২৬৫
আলেমগণ সংশোধন হওয়া ব্যতীত সাধারণ মানুষের
সংশোধন সম্ভব নয় / ২৬৫

তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে সবকিছু পাওয়া যায় / ২৬৭
ইলম ও আবদিয়াতের বৈশিষ্ট্য / ২৬৮
আবদিয়াতহীন ইলম ও ইলমহীন আবদিয়াতের ফলাফল / ২৭০
উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে পূর্ববর্তী উম্মতের অনুসরণের
আগ্রহ ও তার ফল / ২৭১
হকপন্থীদের পরিচয় / ২৭২
অল্প ইলমও আনুগত্যের দ্বারা দ্বিগুণ গ্রহণযোগ্যতা পায় / ২৭২
নৈকট্যশীলগণের সামান্য ত্রুটিও হাজারো
বরকত বয়ে আনে / ২৭৩
ইলমের দ্যুতি হল আদব / ২৭৪
আহলে ইলমের দায়িত্বশীলতা / ২৭৫

বয়ান : ৮

ওয়াজে ইউসুফী / ২৭৮
হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য / ২৮০
ইউসুফ (আ.)-এর চারিত্রিক ও শারীরিক সৌন্দর্য / ২৮১
যুলাইখার শেষ প্রচেষ্টা / ২৮১
ইউসুফ (আ.)কে আল্লাহর পক্ষ হতে হেফাযত / ২৮২
ইউসুফ (আ.)কে কেন কারাগারে পাঠান হল / ২৮৪
স্বপ্নের তাবির একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র / ২৮৫
ইউসুফ (আ.)-এর কাছে তাবির জানতে চাওয়ার কারণ / ২৮৫
নবুওয়াতের হেকমত ও তাবলীগের পদ্ধতি / ২৮৬
নিজের পরিচিতি ও পরকাল ভাবনা / ২৮৭
উপদেশ দেয়ার জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করা / ২৯০
হযরত ইউসুফ (আ.) কর্তৃক তাওহীদের পাঠদান / ২৯১
খৃষ্টানদের বিশ্বাস প্রতিহত করার একটি মজার ঘটনা / ২৯২
শিরকের সূচনা / ২৯৫
ছবির ব্যাপারে একটি সন্দেহের জবাব / ২৯৭
আল্লাহ কর্তৃক তাওফিক দেয়া প্রসঙ্গে একটি ঘটনা / ২৯৮
অহংকার আমলকে ধ্বংস করে দেয় / ২৯৯
স্বপ্নের তাবির / ৩০০
নসিহত কেমন হওয়া উচিত / ৩০০
নসিহতের সৌন্দর্য / ৩০২
লোক সমাবেশে নসিহতের পদ্ধতি / ৩০৩
নসিহত করা শুধু আলেমগণেরই দায়িত্ব নয় / ৩০৩

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ থেকে
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

বয়ান : ১

মুহাম্মদ সা.-এর পবিত্র জন্ম প্রসঙ্গে অতুলনীয় আলোচনা

১২ রবিউল আউয়াল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'সৌন্দর্য' পৃথিবীতে প্রকাশ পেয়েছে এবং চল্লিশ বছর বয়সের পরে তাঁর 'উৎকর্ষতা' প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং একটি সৌন্দর্য বা শোভা হিসেবে জন্ম এবং অপরটি উৎকর্ষতা বা পূর্ণতা হিসেবে জন্ম। আর উভয় জন্মেই আমাদের জন্য তাঁর স্মরণ ও আলোচনা আমাদের ইবাদত ও আনুগত্য। তাঁর সৌন্দর্য পৃথিবীতে প্রকাশিত হওয়া যেমন আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নেয়ামত, তাঁর উৎকর্ষতা প্রকাশ পাওয়া তার চেয়েও বড় একটি নেয়ামত। যা আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন।





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ، وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا... اِلٰى قَوْلِهٖ : وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا.

সম্মানিত সুধীবৃন্দ!

আজকের এ সমাবেশ সম্পর্কে আপনারা অবগত আছেন। এ সমাবেশকে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামে অভিহিত করা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্মরণ প্রকৃতপক্ষেই একটি মৌলিক ইবাদত এবং আল্লাহর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং নৈকট্যশীলতার মাধ্যম। সার্বিক পূর্ণতা ও বরকতও নিহিত রয়েছে তাঁর স্মরণের মধ্যে। এজন্যই মিলাদুন্নবীর আলোচনা একটি মহান নেয়ামত– যা মুসলমানদেরকে দান করা হয়েছে। সুতরাং আমি এখন মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রসঙ্গেই কিছু আলোচনা রাখব এবং প্রাসঙ্গিক কিছু আয়াতও ইতোমধ্যে আমি তেলাওয়াত করেছি।

মিলাদুন্নবীর ধারাবাহিকতায় আপনারা যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণের মানসে আগমন করেছেন, আমিও চাচ্ছি সে প্রসঙ্গে আলোচনা করব, তবে আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি জন্মের পরিবর্তে দুটি জন্ম প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

রাসূল (সা.)-এর শারীরিক ও আত্মিক জন্ম

আপনারা হয়তো আশ্চর্য হবেন যে, জন্ম তো একবারই হয়ে থাকে, দু'বার কি করে জন্ম হতে পারে? কিন্তু আমার আলোচনায় আপনারা অবগত হবেন যে, প্রকৃতপক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম দু'বার হয়েছিল। প্রথম জন্ম যা ১২ রবিউল আউয়াল মতান্তরে ৮ রবিউল আউয়াল হয়েছিল। দ্বিতীয় পবিত্র জন্ম যা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চল্লিশ বছর বয়সের পরে হয়েছিল। অর্থাৎ আত্মিক বা রূহানী জন্ম, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী ও পয়গাম্বররূপে পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করেন। ১২ রবিউল আউয়ালের জন্ম ছিল শারীরিক এবং চল্লিশ বছরের পরের জন্ম ছিল রূহানী বা আত্মিক। যাকে আমরা নবুওয়তরূপে অভিহিত করব।

১২ রবিউল আউয়াল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'সৌন্দর্য' পৃথিবীতে প্রকাশ পেয়েছে এবং চল্লিশ বছর বয়সের পরে তাঁর 'উৎকর্ষতা' প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং একটি সৌন্দর্য বা শোভা হিসেবে জন্ম এবং

অপরটি উৎকর্ষতা বা পূর্ণতা হিসেবে জন্ম। আর উভয় জন্মেই আমাদের জন্য তাঁর স্মরণ ও আলোচনা আমাদের ইবাদত ও আনুগত্য। তাঁর সৌন্দর্য পৃথিবীতে প্রকাশিত হওয়া যেমন আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নেয়ামত, তাঁর উৎকর্ষতা প্রকাশ পাওয়া তার চেয়েও বড় একটি নেয়ামত। যা আল্লাহ্ আমাদেরকে দান করেছেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সৌন্দর্যও এমন এক স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যময় যে, তাঁর মত সৌন্দর্যমণ্ডিত কেউ পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়নি। এত বিশাল উৎকর্ষতা নিয়েও পৃথিবীতে কেউ সৃষ্টি হয়নি, যতটা উৎকর্ষিত তিনি ছিলেন। তাঁর উভয় জন্মই স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যময়। পৃথিবীর কোথাও না আছে তাঁর শারীরিক জন্মের কোন দৃষ্টান্ত, না আছে রূহানী জন্মের কোন নজির। পার্থক্য এতটুকু যে, ১২ রবিউল আউয়াল আত্মপ্রকাশ করেছেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ এবং চল্লিশ বছরের পরে প্রকাশিত হয়েছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ঐ সময় তিনি আবদুল্লাহর সন্তান হিসেবে পৃথিবীতে আগমন করেছেন এবং চল্লিশ বছর বয়স শেষে আল্লাহর রাসূল হিসেবে দুনিয়াতে পদার্পণ করেছেন।

রূহানী জন্মের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের আমলের ধরন

ব্যাপক ভিত্তিতে মানুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শারীরিক জন্মকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং এ বিষয়ক আলোচনাকে 'ঈদে মিলাদুন্নবী' বলে থাকে। অথচ এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্মরণের প্রাথমিক স্তর। প্রকৃত স্তর হল ঐটি যা চল্লিশ বছরের পরে হয়েছে। আর তা এজন্যই যে, প্রথম জন্মে আমাদের জন্য আমলের কোন নমুনা নেই, পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পর্যায়ের ভেতর আমলের নমুনা রয়েছে এবং তার মাধ্যমে আমরা সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রথম জন্ম হয়েছিল সৌন্দর্য বা শোভাময়। যেমন- তাঁর চেহারা এমন ছিল, তাঁর আঙ্গুল এমন ছিল, তাঁর চুল এমন ছিল, তাঁর শরীর, উচ্চতা, গঠন ইত্যাদি এমন ছিল প্রভৃতি। এসবের মধ্যে আমাদের জন্য আমলের কোন দৃষ্টান্ত নেই। এটা তো অসীম খুশির বিষয় যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা ঐ

সৌন্দর্য ও শারীরিক গঠন সজ্জা দিয়েছেন যা পৃথিবীতে আর কাউকেই দেননি। এটা খুশি ও গর্বের ক্ষেত্র ঠিকই কিন্তু আমলের নমুনা মোটেই নেই। এমন নয় যে, যেমন হুযুরের হাত ছিল আমরা তদ্রূপ হাত তৈরি করে নেব; যেমন হুযুরের শরীরের রঙ ছিল আমরা নিজেদের রঙ তদ্রূপ করে নেব; তাঁর শারীরিক উচ্চতা ও গঠনের মত নিজেদের উচ্চতা ও গঠন নির্ধারণ করে নেব। এতে আমাদের জন্য আমলের কোন দৃষ্টান্ত নেই, তবে অবশ্যই এটা অসীম খুশির ক্ষেত্র।

পক্ষান্তরে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূপে যখন তিনি আত্মপ্রকাশ করেন তখন আমাদের সামনে এ বিষয়টি চলে আসে যে, তাঁর ঈমান কেমন ছিল, তাঁর আকিদা কেমন ছিল, তাঁর আমল কেমন ছিল, নামায, রোযা, হজ, জিহাদ প্রভৃতি কেমন ছিল ইত্যাদি। এসবের ভেতর আমাদের জন্য আমলের দৃষ্টান্ত রয়েছে। তিনি যেভাবে নামায আদায় করেছেন আমরাও তদ্রূপ নামায আদায় করব, তিনি যেভাবে রোযা রেখেছেন আমরাও সেভাবে রোযা রাখব, তাঁর হজের নমুনা অনুসরণে আমরা হজ করব, তাঁর পারিবারিক জীবনের অনুসরণে আমরা আমাদের পারিবারিক জীবন গঠন করব। মোট কথা, তাঁর নবুওয়ত পরবর্তী পুরো জীবনেই আমাদের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাঁর প্রথম জন্ম অর্থাৎ শারীরিক জন্মকে যে ব্যাপকভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে তা আমার দৃষ্টিতে এ কারণে যে, তাতে করণীয় বা বর্জনীয়ের কিছু নেই। কোন জিম্মাদারী অর্পিত হয় না। শুধুই আনন্দিত হওয়া। অথবা অতি আনন্দে মিষ্টান্ন বিতরণ করা এবং নিজেই খেয়ে নেয়া। এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

রূহানী জন্মই প্রকৃত উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় প্রকারের জন্ম প্রসঙ্গের আলোচনায় দায়িত্বশীলতা বেড়ে যায় যে, আমাদেরকে মুসলমান হতে হবে, কোন কাজ কিভাবে করতে হবে তা বিবেচনা করতে হবে। সর্বোপরি নির্দিষ্ট নমুনায় জীবনকে গঠন করতে হবে। লোকজন আমল করতে চায় না বলে দ্বিতীয় প্রকারের জন্ম প্রসঙ্গে আলোচনা করে না এবং একে তেমন গুরুত্বও দেয় না। আর প্রথম জন্ম প্রসঙ্গে আমলের কোন নমুনা নেই, কেবল আনন্দ উল্লাসের ক্ষেত্র বলেই তাকে অধিক পছন্দ করে। অন্যথায় আমি মনে করি যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে আগমন করেছেন এটা যেমন ইবাদত তদ্রূপ এ কথাও স্মরণ করা ইবাদত যে তিনি কিভাবে নামায পড়েছেন, কিভাবে হজ করেছেন, কিভাবে জিহাদ করেছেন প্রভৃতি; বরং এগুলো প্রথমটির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। প্রথমটি শুধুই খুশি হওয়ার ক্ষেত্র কিন্তু দ্বিতীয়টি আমাদের জন্য সৌভাগ্য অর্জন করার ক্ষেত্র। সর্বোপরি উভয় প্রকারের স্মরণই আমাদের জন্য ইবাদত। প্রথমটি অগ্রগামী হলেও দ্বিতীয়টিই মুখ্য উদ্দেশ্য। রূহানী আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করণার্থেই শারীরিক জন্মের আবশ্যকীয়তা ছিল। উভয় প্রকারের আবির্ভাবের আলোচনাই যেহেতু ইবাদত তাই আমি সংক্ষেপে উভয় প্রকারের আবির্ভাব নিয়েই আলোচনা করব।

রাসূল (সা.)-এর শারীরিক সৌন্দর্য

আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রথম জন্ম তথা শারীরিক জন্মের মাধ্যমে তাঁর সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে। আর সে সৌন্দর্য এমনই এক স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যময় ছিল যে, সমগ্র পৃথিবীতে তার কোন তুলনা নেই। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে–

একদিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে আগমন করলেন। তাঁর পরিধেয় সকল বস্ত্র ছিল শুভ্রবর্ণের (যাতে লাল রঙের আভা ছিল)। রাতের সময় ছিল এবং আকাশে চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমা চাঁদ। জোছনাধারায় প্লাবিত ছিল চারদিক। তাঁর মধ্য দিয়ে সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগিয়ে আসছিলেন। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, আমি কখনো চাঁদের দিকে দেখছিলাম এবং কখনো চেহারা মোবারকের দিকে দেখছিলাম আর বলছিলাম যে, কোনটি বেশি সুন্দর? আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, চাঁদের মধ্যে ঐ সৌন্দর্য ও রূপ নেই যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র মুখাবয়বে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ জন্যই আমার দৃষ্টি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র চেহারার উপর স্থির হয়ে যাচ্ছিল। এর দ্বারা অনুমিত হয় যে, হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তাঁর কেমন অপরূপ রূপ দেখেছেন। উল্লেখ্য, সাহাবায়ে কেরামের

স্বভাবের মধ্যে অতিরঞ্জিনতা ছিল না।

সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে অধিক সত্যবাদী এই জগতে দ্বিতীয় কেউ সৃষ্টি হয়নি। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সকলে এ বিষয়ে একমত যে, এই উম্মতের যত বড় কুতুব, গাউস বা আবদাল হন না কেন তারা কখনোই মর্যাদার দিক থেকে সাহাবীদের আপশাশে পৌঁছতে পারবেন না। সকল সাহাবী মুত্তাকী, ন্যায়পরায়ণ, নির্মল ও পবিত্র। এই উম্মতের মধ্যে তাঁদের চেয়ে সম্মানিত কেউ নেই। কুরআন ও হাদীসে যেই স্তরের ব্যক্তিদেরকে আল্লাহর মনোনীত বলে সাক্ষ দেয়া হয়েছে তা কেবল সাহাবীদের স্তর। এজন্যই তাদের মাঝে কাব্যিকতা ছিল না। মতামতের মধ্যে অতিরঞ্জন ছিল না। যা কিছু বলতেন, আল্লাহকে সামনে রেখে প্রকৃত বাস্তবতাটুকুই বলতেন। আবু হুরাইরা (রা.) কোন কাব্যিকতা বা অতিরঞ্জনতার আশ্রয় নেননি; বরং প্রকৃত বাস্তবতাই বর্ণনা করেছেন।

হযরত আলী (রা.) বলেন, এমন পবিত্র রূপ আমি না পূর্বে কখনো দেখেছি– না পরে কখনো দেখবো। এটা কোন বাড়াবাড়িও নয় আর আবেগী কাব্যিকতাও নয়; বরং প্রকৃত সত্যের প্রকাশ। এ প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে এ কথাও বলা যায় যে, তাঁরা তো রাসূলপ্রেমে বিভোর ছিলেন, আত্মহারা ছিলেন। ভালবাসায় বিভোর ব্যক্তি তো ভাল অংশটুকুই বলবেন, ভালবাসার কথাই বলবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো তাঁদের কোন আবেগী কথা নয়; বরং বাস্তবতা। কেননা তাঁদের দাবীর সপক্ষে কুরআনেরও সাক্ষ বিদ্যমান রয়েছে।

কুরআনের আলোকে মহানবী (সা.)-এর সৌন্দর্য

যখন আল্লাহর কালাম থেকে কোন জিনিস গ্রহণ করা হয় তখন কুরআন তার জিম্মাদার হয়ে যায়। তখন তাতে কাব্যিকতার (বর্ণনাকে আকর্ষণীয় করণার্থে অতিরঞ্জনতার আশ্রয় নেয়া অর্থে) লেশ বা সংমিশ্রণ অবশিষ্ট থাকে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সৌন্দর্য অনুধাবনের উৎস কুরআনে রয়েছে এবং সাহাবায়ে কেরাম তার অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। আমি প্রথমে কুরআনে উল্লিখিত ঘটনা আলোচনা করব অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক কৃত তার ব্যাখ্যা উপস্থাপন করব।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরতম ব্যক্তি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যখন আল্লাহ তাআলা রূপ ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করলেন তখন তার অর্ধেক সমগ্র বিশ্বকে দিলেন এবং বাকী অর্ধেক শুধু ইউসুফ (আ.)কে দিলেন। সুতরাং তাঁর রূপ ও সৌন্দর্যের ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। যখন হাদীসে নববীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বর্ণনা করে দিয়েছেন তখন তার চেয়ে বড় কোন সাক্ষ হতে পারে না যে, ইউসুফ (আ.)-এর চেয়ে অধিক সুন্দর কেউ নেই। তিনি ছিলেন অতি উন্নত সৌন্দর্যের অধিকারী। মিসরের বাদশাহর স্ত্রী যুলাইখা তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। শুধু যুলাইখাই নয়; বরং মিসরের সমগ্র নারী হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রেমে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু কেনানের একটি কাফেলার কাছ থেকে তিনি তাঁকে ক্রয় করেছিলেন সেহেতু তিনি যেন তার কৃতদাস ছিলেন বিধায় অন্যত্র যেতে পারছিলেন না। সুতরাং মিসরের নারীগণ শত প্রেমাসক্ত হলেও কিছুই করতে পারছিলেন না বলে নিরূপায় হয়ে যুলাইখার প্রতি ঠাট্টা বিদ্রূপ করার পথ গ্রহণ করল। বলতে শুরু করল– 'দেখ যুলাইখা কেমন হীন মনের নারী! নিজের গোলামের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। বাদশাহর স্ত্রী হয়েও গোলামের প্রেমে হাবুডুবু খেতে তার লজ্জা করল না?' এই বিদ্রূপের উদ্দেশ্য কী ছিল? উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এর দ্বারা যুলাইখা ইউসুফ (আ.) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং কোন একভাবে তিনি যুলাইখার থেকে নিস্কৃতি পেলেই আমরা তাকে আয়ত্বে আনতে পারব।

যুলাইখাও তাদের অভিপ্রায় বুঝে ফেললেন এবং প্রতিদিন নানা প্রকার বিদ্রূপ শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে একদিন ইচ্ছা করলেন যে, আমিও তাদের সকল বিদ্রূপের জবাব দেব। অতঃপর একদিন তিনি মিসরের উল্লেখযোগ্য নারীদেরকে চা পানের নিমন্ত্রণ জানালেন। চায়ের কথা আমি এজন্য বললাম যে, খানা খাওয়া ব্যতীত যে পার্টি হয়ে থাকে তাকে চা-পার্টি বলে। চাই সে সময়ে চায়ের প্রচলন থাক বা না থাক। যাই হোক, সেটি খানা খাওয়া ব্যতীত একটি ভিন্ন মাত্রিক পার্টি ছিল, যাতে নির্বাচিত অতি উত্তম ধরনের ফল-ফ্রুট প্রভৃতি ছিল। যেহেতু তিনি রাজরানী ছিলেন তাই কোন কিছুরই কমতি তার ছিল না। বড় দস্তরখানা বিছানো হল; ফল-ফ্রুট, মিষ্টান্নসহ সে সময়ে প্রচলিত সকল আচারানুষ্ঠানের উপকরণের সমাবেশ

ঘটানো হল। ফল কাটার জন্য ছুরি রাখা হল। মিসরের নারীগণকে নিমন্ত্রণ জানানো হল। আমির-ওমারা ও মন্ত্রীবর্গের স্ত্রী-কন্যাগণ এলেন। প্রত্যেকেই পরিপাটি আয়োজনে পোশাক ও অলঙ্কার পরিধান করে আগমন করলেন। প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য এই ছিল– হয়তো ইউসুফ (আ.)-এর দৃষ্টি আমার প্রতি আকর্ষিত হবে এবং আমাকে পছন্দ করবেন। সুতরাং সর্বোত্তম পোশাক ও অলঙ্কারে সর্বোচ্চ সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে তারা একত্রিত হলেন। খাবার টেবিল সাজানো হল। সকলকে তাতে বসানো হল। ইউসুফ (আ.)কে অন্য একটি কক্ষে বসিয়ে রেখে না ডাকা পর্যন্ত আসতে নিষেধ করা হল। ইউসুফ (আ.) সেখানেই অবস্থান করলেন। মিসরের সম্ভ্রান্ত নারীগণও আসন গ্রহণ করলেন। পবিত্র কুরআন মাজীদে এ প্রসঙ্গে এভাবে আলোচনা করা হয়েছে–

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِى الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰهَا عَنْ نَّفْسِهٖ

মিসরের নারীগণ যুলাইখাকে এই বলে বিদ্রূপ করতে শুরু করল যে, নিজের গোলামের প্রতি আসক্ত হলে! তোমার লজ্জা করা উচিত।

قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ـ اِنَّا لَنَرٰهَا فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

প্রেম তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আমরা স্পষ্টতই তাকে বিপথগামী দেখতে পাচ্ছি। (গোলামের প্রতি আসক্ত হওয়ার কোন মানে আছে?)

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً

যখন যুলাইখা অনুধাবন করল যে, বিদ্রূপ করা শুধু এ কারণে যে, যাতে আমার অন্তর ইউসুফ (আ.) থেকে ফিরে আসে তখন তাদেরকে নিমন্ত্রণ জানাল এবং তাদের জন্য দস্তারখানা সজ্জিত করল।

وَاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا

এবং তাদের প্রত্যেকের সামনে একটি করে ছুরি রাখল (যেন ফল কেটে খেতে পারে)।

তারা ছুরি হাতে নিয়ে ফল কাটতে শুরু করল। ইউসুফ (আ.)কে বেরিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানানো হলে তিনি বেরিয়ে এলেন। তাঁর রূপ ও সৌন্দর্য দেখে নারীগণ এতই হতভম্ব হয়ে পড়লেন যে, নিজের উপরই নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন। ফল কাটার পরিবর্তে কেউ নিজের আঙুল কাটলেন, কেউ কবজি কাটলেন, কেউ বাহু কাটলেন– সকলেই রক্তাক্ত হলেন। ইউসুফ (আ.)-এর রূপ-সৌন্দর্য তাদেরকে আত্মনিয়ন্ত্রণহীন করে তুলল।

وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا اِنْ هٰذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ

এবং তারা বলল, আল্লাহর কসম! ইনি মানুষ নন, আসমান হতে অবতীর্ণ কোন ফেরেশতা। এমন রূপ ও সৌন্দর্য মানুষের মাঝে থাকা অসম্ভব।

এই দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্য, এই কমনীয় মাধুর্য, এই অপরূপ বলিষ্ঠ দেহশৌষ্ঠব কি করে মানুষের হতে পারে? মনে হচ্ছে ইনি কোন ফেরেশতা হবেন।

প্রশংসায় যখন তারা পঞ্চমুখ হলেন তখন যুলাইখা বলে উঠলেন, এই হলেন তিনি, যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে বিদ্রূপ করতে। আমি তো কখনও আঙুলও কাটিনি, হাতও কাটিনি। তোমাদের এমন কি মসিবত অর্পিত হল যে, আঙুল কেটে ফেললে? ইউসুফ (আ.) প্রতিদিন আমার সাথে রয়েছেন তবুও আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছি আর তোমরা এক নজর দেখে আত্মনিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছ! তো যখন তোমাদের অবস্থা এই আর আমার অবস্থা এই– তাহলে বিদ্রূপের কী আছে? বিদ্রূপ করার জন্য তোমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত নাকি গোলামের প্রতি আসক্ত হওয়ার দরুন আমি লজ্জিত হব? তোমরা কেন আসক্ত হলে? এ বিপদ তোমাদের কেন হল?

বেচারা নারীগণ লাজবাব হয়ে রইলেন আর যুলাইখা বিদ্রূপের হাত থেকে চির নিষ্কৃতি পেলেন। এই হল পবিত্র কুরআন উল্লিখিত হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্যের বর্ণনা।

ইউসুফ (আ.)-এর রূপের উপর মুহাম্মদ (সা.)-এর সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠত্ব

এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বক্তব্য বিবেচ্য বিষয়। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে তাঁর বক্তব্য ভূমিকাস্বরূপ। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, 'মিসরের নারীগণ তো ইউসুফ (আ.)কে দেখে তাদের হাত কেটে ফেলেছিলেন, কিন্তু তারা যদি আমার প্রেমাস্পদকে দেখত তবে তারা তাদের হৃদয়কে টুকরো টুকরো করে ফেলত।' এ হল 'সিদ্দিকা' তথা সত্যায়নকারিণী উপাধিতে ভূষিত হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক নিরূপিত পার্থক্য। এতে প্রমাণিত হল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সৌন্দর্য হযরত ইউসুফ (আ.)-এর রূপ ও সৌন্দর্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে অর্ধেক সৌন্দর্য ইউসুফ (আ.)কে ও অর্ধেক রূপ সমগ্র জগতকে দেয়ার যে বর্ণনা এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্তা তার ব্যতিক্রম। এর অর্থ এই যে, সম্মিলিতভাবে সমগ্র পৃথিবীকে যে সৌন্দর্য দেয়া হয়েছে, একা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই সৌন্দর্য দেয়া হয়েছে। তা ইউসুফ (আ.)-এর চেয়েও অধিক ছিল। মিসরের নারীদের ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রা.) যথার্থ মন্তব্যই করেছেন। এর দ্বারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সৌন্দর্যের ধারণা পাওয়া গেল।

এছাড়া উভয়ের সৌন্দর্য বর্ণনায় কুরআন-হাদীসের শব্দ চয়নের বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্য বর্ণনার 'হুস্ন' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। বলা হয়েছে– فاذا قد اعطى شطر الحسن (অর্ধেক রূপ ইউসুফ আ.কে এবং অর্ধেক রূপ সমগ্র দুনিয়াকে দেয়া হয়েছে)। পক্ষান্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষেত্রে 'জামাল' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। 'হুস্ন' অপেক্ষা 'জামাল' শ্রেষ্ঠতম। বর্ণের শুভ্রতা এবং বাহ্যিক দেহ শৌষ্ঠবের চমৎকারিত্ব প্রকাশ করতে 'হুস্ন' শব্দ প্রয়োগ হয় আর 'জামাল' বলা হয় দেহের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যথার্থ অঙ্গ সন্ধিস্থান এবং স্বস্থানে উপযুক্ত অঙ্গ বিস্তারকে। আঙুল দেখলে মনে

হবে যেন এর চেয়ে উত্তরণ আর হওয়া সম্ভব নয়, নাক দেখলে মনে হবে যেন এর চেয়ে উৎকৃষ্ট আর হওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেক অঙ্গ এমন উপযুক্ত ও পূর্ণাঙ্গ যে, তার চেয়ে অধিক পূর্ণাঙ্গতার কল্পনাই করা যায় না। একেই বলা হয় জামাল। সুতরাং হুস্ন-এর চেয়ে জামাল শ্রেষ্ঠত্বে অগ্রণী। এ কারণেই মহান আল্লাহর শানে জামিল শব্দের প্রয়োগ হয়েছে, হুস্ন প্রয়োগ হয়নি। বলা হয় : ان الله جميل ويحب الجمال অর্থাৎ আল্লাহ নিজে 'জামিল' এবং এ গুণের অধিকারীকেই পছন্দ করেন। এ ক্ষেত্রে হুস্ন শব্দের প্রয়োগ হয়নি। যাই হোক, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জামাল দান করা হয়েছিল। এজন্য হাদীস শরীফের যেখানেই তাঁর জামাল তথা সৌন্দর্যের আলোচনা এসেছে সেখানেই তাঁর একেকটি অঙ্গের প্রশংসা করা হয়েছে। সেসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুবিস্তৃত সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

হাদীসে এসেছে, একবার সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বসা ছিলেন। কিছু নেয়ার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাত প্রসারিত করলেন। ইত্যবসরে তাঁর চাদর সরে গিয়ে বগল প্রকাশ হয়ে পড়ল। তাঁর সেই উন্মুক্ত স্থানের সৌন্দর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম বলেন, মনে হচ্ছিল যেন রৌপ্য নির্মিত পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে কোন জিনিস যাতে চোখের দৃষ্টি স্থির হতে পারছিল না।

গরদান প্রসঙ্গে উদাহরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, যেন গজদন্ত দ্বারা নির্মিত। অর্থাৎ তেমনই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল তার রঙ। তাঁর অঙ্গের যেখানেই দৃষ্টি পড়ত সেখান থেকেই দৃষ্টি অন্যত্র ফিরতে চাইত না। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আঙ্গিক সৌন্দর্যের আপাদমস্তক বর্ণনা হাদীস শরীফে রয়েছে। পরিভাষায় একে শামায়িল নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কিতাবও রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রহ.) 'শামায়িলুত তিরমিযী' নামে কিতাব লিখেছেন, যাতে কেবল ঐ সমস্ত হাদীস সংকলিত হয়েছে যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রূপ, সৌন্দর্য ও শারীরিক পূর্ণাঙ্গতা বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে।

সীরাতুন্নবী (সা.) কাকে বলে

১২ রবিউল আউয়াল মহান আল্লাহ তাআলা এমন এক অপরূপ পবিত্র সত্তাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন যাঁর চেয়ে অধিক সৌন্দর্যমণ্ডিত কাউকে অতীতেও বিশ্ব জগতে সৃষ্টি করেননি এবং ভবিষ্যতেও করবেন না। পূর্ণাঙ্গ মানবের এমন এক মডেল উপস্থাপন করা হয়েছে যে, তদাপেক্ষা সৌন্দর্যমণ্ডিত মডেল দ্বিতীয় আর নেই। আর এটাই তো বিধি যে, ছাঁচের অনুরূপ বস্তুই তাতে রাখা হয়। ছাঁচ যদি পূর্ণাঙ্গ হয় তবে তাতে যা রাখা হবে তাও পূর্ণাঙ্গ হবে। আর ছাঁচ যদি অসম্পূর্ণ হয় তবে তাতে রক্ষিত বস্তুও অসম্পূর্ণ থাকবে। আপাদমস্তক দেহসৌষ্ঠব ও কাঠামো যখন সর্বোচ্চ পূর্ণাঙ্গ ছিল তখন তার প্রকৃতিও যথার্থ পূর্ণাঙ্গ হওয়াই কাম্য ছিল। এজন্যই তাঁর সৌন্দর্য যেমন ছিল দৃষ্টান্তহীন তদ্রূপ তাঁর মধ্যে প্রদত্ত উৎকর্ষতাও ছিল তুলনাহীন। এই অতুলনীয় পরম উৎকর্ষতাই হল 'সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'। এই উৎকর্ষতার ভিত্তিতেই তাঁর অভ্যাস, কর্মপদ্ধতি ও স্বভাব তৈরি হয়েছে। সুতরাং একটি হল বাহ্যিক আকৃতি এবং আরেকটি হল অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি তথা চরিত্র স্বভাব ও মানবিকতার পূর্ণাঙ্গতা। তাই সর্বোন্নত বাহ্যিক আকৃতির দাবীই হল সর্বোন্নত অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি। অতুলনীয় ছাঁচে তাই প্রদত্ত হয়েছে তুলনাহীন জিনিস। সুতরাং তাঁর সুরত যেমন ছিল সর্বোন্নত তাঁর সীরাতও ছিল তদ্রূপ সর্বোন্নত। এজন্যই আমি বলি, বাহ্যিক সুরত কখনো স্বতন্ত্রভাবে উদ্দেশ্য হয় না; বরং তা অভ্যন্তরীণ উৎকর্ষতা প্রকাশের আয়নাস্বরূপ। সুরত বা বাহ্যিক আকৃতি কোন কিছুর পরিচয়ের মাধ্যম হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তিকে দেখে যখন আপনি চেনেন তখন তার আকৃতি দেখেই আপনি চিনে থাকেন যে ইনি কে? অর্থাৎ তার ব্যক্তিসত্তা কেমন, তার স্বভাব কেমন, তার কথাবার্তা কেমন ইত্যাদি। সুতরাং সুরত বা আকৃতি হল পরিচয়ের মাধ্যম। প্রকৃতপক্ষে যা চেনার জিনিস তা হল ঐ জিনিস যা সুরতের মধ্যে প্রদত্ত হয়ে থাকে। তারই নাম সীরাত। সুতরাং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুরত তাঁর সীরাতের পরিচয় লাভের মাধ্যম হয়েছিল। অন্যভাবে বললে এভাবে বলা যায় যে, শারীরিক জন্ম আত্মিক জন্ম পরিচয়ের মাধ্যম বিবেচিত হয়েছে। অর্থাৎ এই সত্তা হতে ঐ সত্তাকে প্রকাশ করা হবে। পৃথিবীবাসীর জন্য পূর্ণাঙ্গতার পথ প্রদর্শিত হবে, যাতে করে তারা সৌভাগ্যশীল হতে পারে। সুতরাং সীরাতই মূল বিষয় বলে বিবেচিত হয়ে যায়।

পবিত্র সীরাতের প্রথম অংশ

সীরাত তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবনের সর্বাগ্রে যে অংশ বিবেচ্য তা হল ইসমাত বা পবিত্রতা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এবং মুসলমানদের বিশ্বাস এই যে, নবীগণ নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেও নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। অর্থাৎ প্রথম জীবনেও তারা গুনাহ করতে পারেন না। আর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর নিষ্পাপতা তো প্রকাশ্য, গুনাহ করার প্রশ্নই ওঠে না। কেননা নবীগণের জীবনে অতি সামান্য গুনাহের কল্পনাও যদি করা যায় তাহলে তো তাদের জীবন লোকজনের আমল করার জন্য আদর্শ হতে পারে না। সংশয়ের সম্ভাবনা থাকবে যে, হয়তো এই জিনিস ভুলে করেছেন কিংবা এ জিনিস সম্ভবত গুনাহর কাজ। নবীগণের কথা ও কাজ উম্মতের জন্য নমুনা বা আদর্শ হয়ে থাকে, যাতে করে প্রত্যেক ব্যক্তি নবীর কথা ও কাজের উপর আমল করতে পারে। আর এটা তখনই করা সম্ভব যখন তাঁর প্রত্যেকটি কথা ও কাজ এত পবিত্র ও উচ্চ মর্যাদাশীল হবে যে, তাতে লেশমাত্র গুনাহ, নাফরমানী ও অবাধ্যতা থাকবে না কিংবা এসবের সম্ভাবনাও থাকবে না। যদি নবীর জীবনে গুনাহ ও অপরাধের সম্ভাবনাও থাকে তাহলে তো জীবন অনির্ভরযোগ্য হয়ে পড়বে। তখন তা আর আদর্শ ও অনুকরণযোগ্য থাকবে না। এ জন্যই নবীগণকে আল্লাহ তাআলা মাসুম বা নিষ্পাপরূপে সৃষ্টি করেন, তাতে করে তাঁদের দ্বারা গুনাহ হতে পারে না।

গুনাহ কেন হতে পারে না? তার কারণ এই যে, প্রথমত নবীগণের মৌলপ্রকৃতি এত পবিত্র রাখা হয় যে, তাতে গুনাহর স্থান-সংকুলান হয় না। অর্থাৎ মৌলিকভাবেই সৃষ্টিগত কারণে তাতে গুনাহ প্রবেশ করতে পারে না। হাদীস শরীফে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নবীগণ তো মাটি দ্বারাই সৃষ্ট কিন্তু তাঁদের তৈরির মাটি অধিকাংশই জান্নাতের মাটি। জান্নাতী মাটি দ্বারা তাঁদের দেহ তৈরি করা হয়ে থাকে। স্পষ্ট হল যে, তাঁদের তৈরির মূল উপাদান জান্নাতী মাটি এবং দুনিয়ার মাটির পরিমাণ সামান্য। জান্নাতী মাটির চেয়ে পবিত্র কোন মাটি হতে পারে না। দুনিয়ার মাটি নোংরা এবং জান্নাতের মাটি পূতপবিত্র, সূক্ষ্ম ও নূরান্বিত। সুতরাং নবীগণের মূল যেন জান্নাত এবং আমাদের মূল এই পৃথিবী। আমরা

আমাদের মূলের দিকে ধাবিত হই, গুনাহর প্রতি অগ্রসর হই। আর নবীগণ তাদের মূলের দিকে ধাবিত হন। পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা, নেকী ও তাকওয়ার দিকে অগ্রসর হন। প্রসিদ্ধ আরবী প্রবাদ রয়েছে–

كل شيئ يرجع الى اصله

অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু তার মূলের দিকে ধাবিত হয়।

বস্তুতে তার মৌলের প্রকাশ দৃশ্যমান থাকে। নবীগণের মৌলিক উপাদান যেহেতু জান্নাত তাই দুনিয়াতে থেকেও তাঁদের আত্মা জান্নাতমুখী থাকে, দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয় না, নিজের মূলের দিকে ফিরে থাকে। জান্নাতের মাটি যেহেতু পবিত্র তাই সৎপ্রকৃতির ভিত্তিতে নবীগণের ভেতর গুনাহের কল্পনার পর্যন্ত অবকাশ নেই। তাদের ভেতর কল্পনার উদ্রেক হলে তা পবিত্রতার কল্পনাই হয়। এজন্যই নবীগণের স্বভাব এত পবিত্র হয়ে থাকে যে, যদি তাদের স্বভাবকে কখনো সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয় তবে তা কল্যাণের দিকেই অগ্রসর হবে, সঠিক পথেই অগ্রসর হবে। সওয়াব বা কল্যাণের পথ ব্যতীত গুনাহ বা অন্যায় পথে কখনোই অগ্রসর হবে না।

নবীগণের স্বভাবের উপরই শরীয়ত রচিত হয়ে থাকে। তাদের মাধ্যমে যেসব কাজ প্রকাশ পায় তাই শরীয়ত সাব্যস্ত হয়ে থাকে। নবীগণের কর্ম ও কথাই তো শরীয়ত। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাই বলেছেন তাই আমাদের জন্য নমুনা ও শরীয়ত হয়ে গেছে। যেমন- বলা হয়ে থাকে যে, যেভাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলেছেন তোমরাও সেভাবে কথা বল, যেভাবে তিনি পানাহার করেছেন তোমরাও সেভাবে কর, যেভাবে তিনি হাসতেন তোমাদেরও সেভাবে হাসা উচিত। এই যে কথা বলা, পানাহার করা, হাসা– এসব কিছুই স্বভাবগত কর্ম। আর এগুলোই যখন নমুনা তখন বোঝা যায় যে, শরীয়ত নবীগণের স্বভাবের উপর ভিত্তি করেই অবতীর্ণ হয়ে থাকে। নবীগণ যা বলেন বা করে দেখান তাই যেহেতু শরীয়ত সুতরাং তাঁদের স্বভাবের পবিত্রতা খারাবীর সম্পূর্ণ সংশয় মুক্ত না হলে তা শরীয়ত কিভাবে হবে? এজন্যই নবীগণের স্বভাবের উপর শরীয়ত অবতীর্ণ হয় এবং তাদের বিবেকবোধের উপর ইলম অবতীর্ণ হয়। এই স্বভাবসিদ্ধ কর্মই শরীয়ত হয়ে যায় এবং জ্ঞানবিষয়ক তাদের বর্ণনা ওহী হয়ে থাকে। কেননা পরিপূর্ণ পূর্ণতা প্রাপ্ত বিবেকের উপর ওহী

অবতীর্ণ হয়ে থাকে। তাই নবীগণের ইলম ও আমল উভয়ই পূর্ণাঙ্গ হয়ে থাকে।

সুতরাং সর্বাবস্থায় হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসুম বা নিষ্পাপ ছিলেন।

নবীগণ নিষ্পাপ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ

দ্বিতীয়ত নবী (আ.)গণ আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যের মাঝে সার্বক্ষণিক নিমজ্জিত থাকেন। তাঁদের অন্তর সর্বদা আল্লাহতে বিভোর এবং ভালবাসায় আপ্লুত থাকে। তাঁদের ভালাবাসা এতই পূর্ণাঙ্গ যে, সার্বক্ষণিক তাঁরা আল্লাহর মহত্ত্বকে প্রত্যক্ষ করেন। আর এ কথা তো স্পষ্ট যে, যদি আপনি বাদশাহর দরবারে যান এবং বাদশাহ সম্মুখে উপস্থিত থাকেন তাহলে কি তখন আপনি তার অবাধ্যতার কথা কল্পনাও করতে পারবেন? যখন বাদশাহর বড়ত্ব সামনে, তার কর্তৃত্ব সামনে, রাজ সিংহাসনে বাদশাহ উপবিষ্ট– তখন অবাধ্যতা প্রকাশ করা তো দূরের কথা দৃষ্টি এদিক সেদিক ফেরাবার সাহসও তো আপনার হবে না, আদবের সাথে দৃষ্টি নিম্নমুখী থাকবে। দুনিয়ার সামান্য এক বাদশাহর সাক্ষাতের প্রভাব যদি এই হয় যে, তার সামনে বেয়াদবী করা যায় না, অভদ্রতা প্রদর্শন করা যায় না কিংবা অবাধ্যতা প্রকাশ করা যায় না, তাহলে যেই সত্তা সার্বক্ষণিক আল্লাহর প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণে থাকেন কি করে তিনি আল্লাহর নাফরমানীতে সম্মত হবেন? আল্লাহ তাআলার হুকুমের বিপরীত বা তাঁর ইচ্ছা পরিপন্থী কোন কিছু করা তাঁর পক্ষে কিভাবে সম্ভব? এজন্যই নবী (আ.)গণ আল্লাহর প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণে থাকার কারণে নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। সুতরাং তাদের এক নিষ্পাপতা অর্জিত হয় সৃষ্টি মৌলের পবিত্রতার ভিত্তিতে এবং দ্বিতীয় নিষ্পাপতা অর্জিত হয় আল্লাহর প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে।

আপনার বিশ্বাস রয়েছে যে, বিষপানে মৃত্যু ঘটে। তাই মানুষ কখনো বিষ পান করার সাহস দেখায় না। অজ্ঞতা বশত বা না জেনে যদি পান করে সেটা ভিন্ন বিষয়; কিন্তু যদি জানে যে বিষ পানে মৃত্যু ঘটে এবং এও যদি জানে যে এটা বিষ তাহলে মানুষ তা থেকে দূরে থাকবে। এমনকি মৃত্যু সন্নিকটবর্তী হওয়ার আশঙ্কায় তার ধোঁয়া থেকেও দূরে সরে থাকবে। এসব

এ কারণেই যে, আপনি জানেন বিষ মৃত্যু ঘটায়। অথচ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আপনার এ জ্ঞান অর্জিত হয়নি। কেননা বিষ পান করে মৃত্যুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং বিষ পানে মৃত্যুর যে অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে তা প্রত্যক্ষ নয়; বরং বিশ্বাসগত এবং অন্যের থেকে শ্রুত। অন্যের থেকে শোনা বিষয়ে মানুষ দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে বিষ পানের দিকে অগ্রসর হয় না– এই হল সাধারণ মানুষের অবস্থা আর নবীগণের বিষয়টি তো সম্পূর্ণ ভিন্ন। নবীগণের বিশ্বাস তো শ্রুতি নির্ভর নয়: বরং তাঁরা আল্লাহর মাহাত্ম্য ও বড়ত্বের সচক্ষে দেখা প্রত্যক্ষ বিশ্বাসে দৃঢ় বিশ্বাসী। তাঁদের পক্ষে স্বীয় বিশ্বাসের বিপরীতে কিভাবে অবাধ্যতা করা সম্ভব?

সুতরাং দুটি বিষয় হল, প্রথমত সৃষ্টি উপাদানের পবিত্রতা, যার জন্য তাদের স্বভাব কখনো অন্যায়ের প্রতি ধাবিত হয় না। দ্বিতীয়ত আল্লাহর প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ। প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর বড়ত্ব, ক্রোধ, মহাপরাক্রমশীলতা, মাহাত্ম্য, রহমত ও মর্যাদা তাঁদের দৃষ্টির সম্মুখে থাকে। নবীগণ যেন সর্বদা আল্লাহর দরবারে উপস্থিত থাকেন। সুতরাং শাহী দরবারে থেকে বাদশাহর বিরুদ্ধাচরণ ও অবাধ্যতার কল্পনাও আসতে পারে না। কিভাবে নবীগণের পক্ষে গুনাহর প্রতি ধাবিত হওয়া সম্ভব?

নবীগণ নিষ্পাপ হওয়ার তৃতীয় কারণ

নবীগণ নিষ্পাপ হওয়ার প্রথম কারণ সৃষ্টি উপাদানের পবিত্রতা। দ্বিতীয় কারণ আল্লাহর প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং তৃতীয় কারণ হল আল্লাহ কর্তৃক হেফাযত। নবীগণ যেহেতু মানুষ, তাই কখনো মানবীয় স্বভাবের কারণে যদি তাঁরা গুনাহর প্রতি ঝুঁকেও পড়েন তাহলে আল্লাহ তাঁদেরকে হেফাযত করেন। তাঁরা গুনাহ করতে পারেন না, তাঁদের জীবন পবিত্র থাকে। যেমন- হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যুলাইখা যখন সপ্ত কুঠুরী তৈরি করে ইউসুফ (আ.)কে ভেতরে ডেকে নিলেন এবং সকল দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন, অতঃপর নিজের কথা ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন তখন ইউসুফ (আ.)ও ঝুঁকে পড়েছিলেন। পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا

যুলাইখাও ইচ্ছা করলেন এবং ইউসুফ (আ.)ও ইচ্ছা করলেন।

অর্থাৎ মানবীয় স্বভাবের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াসওয়াসার উদয় হয়েছিল। আল্লাহ বলেন–

لَوْلَا اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ

তিনি যদি স্বীয় পালনকর্তার মহিমা অবলোকন না করতেন (তবে এ কল্পনাতেই লিপ্ত থাকতেন)।

যুলাইখার মত ইউসুফ (আ.)ও চিন্তায় লিপ্ত থাকার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু আল্লাহ তাঁকে হেফাযত করেছেন, ওয়াসওয়াসা মুক্ত করেছেন। কর্মের মাধ্যমে গুনাহে লিপ্ত হওয়া তো সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল কিন্তু চিন্তাগতভাবে সম্ভাবনা ছিল। থাকলেও আল্লাহ তা থেকেও হেফাযত করেছেন।

আল্লাহ কর্তৃক কিভাবে হেফাযত করা হয়েছিল সে বিষয়ে হাদীসে এসেছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর অন্তরে মানবিক স্বভাববশত কুচিন্তা উদয় হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ছাদের দিকে উঠতেই পিতা ইয়াকুব (আ.)-এর চেহারা মোবারক সেখানে এভাবে দেখতে পান যে, তিনি হাতের আঙুল দাঁতে চেপে তাঁকে হুঁশিয়ার করছেন। তাঁকে দেখেই ইউসুফ (আ.) ওখান থেকে ছুটতে শুরু করলেন। ওখানে সাতটি দরোজাতেই তালা ছিল কিন্তু আল্লাহর কুদরতে মুজিযাস্বরূপ প্রতিটি দরোজার তালাই ভেঙ্গে গেল এবং দরোজা খুলে গেল। এর দ্বারা জানা গেল যে, যেমনিভাবে সার্বক্ষণিক আল্লাহর মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করার জন্য নাফরমানী করতে পারেন না, তেমনিভাবে আল্লাহর হেফাযতও সর্বাবস্থায় তাঁদের সঙ্গী থাকে। যদি মানবিক স্বভাববশে কুমন্ত্রণারূপে কোন বিষয় তাঁদের সামনে আসেও তবুও তাঁরা তা বাস্তবায়ন করতে পারেন না, আল্লাহ তাদেরকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখেন।

নবুওয়তের পূর্বেও নবীগণ নিষ্পাপ থাকেন

নবুওয়াতের পূর্বেও নবীগণের নিষ্পাপতা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের দুটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ইতোপূর্বে আমি আল্লাহ কর্তৃক হেফাযত সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। এবার রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস শুনুন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

আমার তখন বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। মক্কার কুরাইশ বংশের কোন এক বিত্তশালীর ঘরে বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল, যাতে নাচ ও গান-বাজনারও আয়োজন ছিল। সম্পদ বৃদ্ধি পেলে মানুষের মাঝে এ ধরনের অশ্লীলতার বিস্তার ঘটে। গরীব হলে, কম সম্পদশালী হলে বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান সাদাসিধে ধরনের হয়ে থাকে। কিন্তু সম্পদ বেড়ে গেলে সীমালঙ্ঘন ও অহংকারও বেড়ে যায়। যদি আল্লাহ তাআলা হেফাযত না করেন তা হলে সম্পদ মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। তো সেখানেও ছিল ধনাঢ্য পরিবার, স্বাভাবিক কারণেই নাচ, গান, আনন্দ-বিনোদন ও রঙ্গ-রসিকতার আয়োজন ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– কুরাইশের সমবয়সী কিছু নওজোয়ান ছেলে ছিল। তারা আমাকে বললো– আমাদের সাথে চল, ওখানে সমমনা কুরাইশ পরিবারে বিয়ের অনুষ্ঠান আছে, আমরা তাতে অংশগ্রহণ করি।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বিস্তারিত অবগত ছিলেন না যে ওখানে নাচ-গানের আসর বসবে। কিন্তু কিছু রঙ-তামাশা হবে তা অনুমান করে থাকবেন। ছেলে বয়সে সেদিকে মন ধাবিত হওয়া আশ্চর্য কিছু নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমিও তাদের সাথে চলে গেলাম। আনন্দ-বিনোদন পর্ব শুরু হওয়ার সময় নির্ধারিত ছিল রাত। আমিও গিয়ে বসলাম। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পূর্বেই আমার এত বেশি ঘুম এল যে নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলাম না। আমি শুয়ে পড়লাম। সারা রাত ঘুমিয়ে রইলাম। নাচ হল, না গান হল, রঙ-তামাশা হল, না গল্পের আসর হল আমার কিছুরই খবর রইল না। সমস্ত রাত আল্লাহ আমাকে হেফাযত করলেন। ঘুম থেকে উঠে শুনলাম, বহু বাদ্য-বাজনা বাজানো হয়েছে, বহু নাচ-গান হয়েছে, বহু রঙঢঙ হয়েছে কিন্তু আমার সেসবের কোন খবরই নেই।

এ ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, সৃষ্টি উপাদান পবিত্র হওয়ার কারণে যেমনিভাবে নবীগণ গুনাহ করেন না, আল্লাহর প্রত্যক্ষ নজরে থাকার কারণে যেমনিভাবে তাঁরা গুনাহ করতে পারেন না, তেমনিভাবে আল্লাহর হেফাযতও তাঁদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী হয়ে থাকে। যদি কখনও মানবিক স্বভাবের কারণে কলবে ওয়াসওয়াসাও আসে তবে আল্লাহর

হেফাযত তাঁদেরকে গুনাহ করা থেকে বিরত রাখে। নবুওয়াত পূর্বের এ ঘটনাই তার প্রমাণ বহন করে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পঁচিশ বছর বয়সের সময়। মক্কা শরীফে সাধারণত বেশি বৃষ্টিপাত হয় না। হারাম শরীফ তথা কাবাঘর এলাকা যেহেতু চারদিক পাহাড় বেষ্টিত নিম্নভূমি, তাই একটু বেশি বৃষ্টিপাত হলেই সমস্ত পানি হারাম শরীফে চলে আসে। একবার প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে কাবাঘর নিমজ্জিত হল। পানির কারণে দেয়ালের প্লাস্টার খসে পড়ল। দেয়ালগুলোকে স্তূপীকৃত পাথর বলে মনে হচ্ছিল। ধসে পড়ার আশঙ্কায় কুরাইশগণ নতুন করে কাবাঘর নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিলেন। কাবাঘর নির্মাণের কাজ সম্মিলিতভাবে চাঁদা তুলে করার সিদ্ধান্ত হল। কুরাইশগণ যদিও শিরকে লিপ্ত ছিল এবং অত্যন্ত ঘৃণ্যতম পাপ কাজে নিমজ্জিত ছিল কিন্তু আল্লাহর ঘর বিনির্মাণে হারাম ও সন্দেহযুক্ত সম্পদ ব্যবহার করা পছন্দ করত না। তারা ডাকাতি, রাহাজানি, সুদ, ঘুষ, প্রতারণাসহ জায়েয নাজায়েয– সর্বপ্রকার উপার্জনই করত। তথাপি তাদের মধ্যে এ অনুভূতি ছিল যে আল্লাহর ঘর হালাল উপার্জনেরই হকদার, তাতে কোন সন্দেহযুক্ত অর্থ ব্যবহার না করাই আবশ্যক। সুতরাং চাঁদার মধ্যে এ অঙ্গীকার করা হল যে, ডাকাতি ও সুদ-ঘুষসহ কোন প্রকারের হারাম টাকা এতে আমরা দেব না, শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ দেব। সুতরাং হালাল উপার্জনে অর্জিত অর্থের চাঁদা উত্তোলিত হল। তাতে যে টাকা জমা হল তা দিয়ে ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক নির্মিত ভিত্তির উপর ঘর নির্মাণ করা সম্ভব হবে না বিধায় হাতিমের অংশ বাদ দিয়ে কাবাঘর নির্মাণের সিদ্ধান্ত হল। 'হাতিমে কাবা' নামক সে স্থানটুকু অদ্যাবধি কাবা ঘরের বাইরে রয়েছে। কাবাঘর থেকে যার দূরত্ব আনুমানিক পৌনে দুই গজ। হালাল উপার্জনের দ্বারা কাবাঘর নির্মাণের উদ্যোগ তো ভালই ছিল কিন্তু যেহেতু তারা ছিল ইসলামের আলোহীন জাহেল আরব সম্প্রদায় তাই তারা একটি জাহেলী সিদ্ধান্তও নিল। তারা চিন্তা করল যে, যে কাপড় পরিধান করে আমরা গুনাহর কাজে লিপ্ত হই সে কাপড় পরে আল্লাহর ঘর নির্মাণ করা যাবে না। সুতরাং উলঙ্গ হয়ে নির্মাণ করতে হবে। তা হলেই সম্পূর্ণ পবিত্রতার সাথে ঘর নির্মাণ করা হবে। তাদের এ সিদ্ধান্ত ছিল জাহেলী বা অজ্ঞতাপ্রসূত পদক্ষেপ। কেননা উলঙ্গ হওয়া তো নির্লজ্জতা ও গুনাহ। একটি গুনাহ

(তাদের মত অনুযায়ী) থেকে বাঁচতে আরেকটি গুনাহে জড়িয়ে যাওয়া তো কূপ থেকে উঠে খাদে পড়ার নামান্তর। তারা এ কথা ভাবল না যে, আমরা কাপড় দিয়ে তো গুনাহ করি না– শরীর দিয়ে করি। সুতরাং শরীরের চামড়া তুলে ফেলা উচিত। কারণ চামড়ার সংস্পর্শেই তো গুনাহ সংঘটিত হয়. সে চামড়া নিয়ে কিভাবে বাইতুল্লাহর নির্মাণ করব? গুনাহ করার পরও শরীর পাক থাকল আর বেচারা কাপড় হল নাপাক। গুনাহের দোষে কাপড়কে দোষী করে উলঙ্গতাকে পবিত্রতা আখ্যায়িত করাই ছিল চরম মূর্খতা।

উলঙ্গ হয়েই তারা কাবাঘরের নির্মাণ কাজ শুরু করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– যখন আমি এলাম তখন তারা আমাকে এই পবিত্র কাজে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানালে আমি রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু তারা আমাকে কাপড় খুলতে বলল। যদিও তখনও শরীয়ত অবতীর্ণ হয়নি, শরীরের কতটুকু অংশ ঢেকে রাখতে হবে এবং কতটুকু খোলা যাবে তা অজানা কিন্তু নবীগণের স্বভাব জন্মগতভাবেই পবিত্র হয়ে থাকে বিধায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তর তাতে সায় দিচ্ছিল না। কুরাইশগণ তাঁকে জোর তাকিদ দিয়ে বলতে লাগল, যখন তোমার সমস্ত সম্মানিত মুরব্বীগণ উলঙ্গ হয়ে নির্মাণ কাজে অংশ নিচ্ছে তখন তোমার তো আপত্তি করা উচিত হচ্ছে না। তোমার বয়স তো কম, ছেলে মানুষ। নিজের মুরব্বীদের অনুসরণ কর।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– আমিও কিছুটা খেয়াল করলাম যে, পরিস্থিতি যখন এমনই তখন আমিও না হয় তাদের অনুকরণ করে নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করি। আমি ইচ্ছা পোষণ করছিলাম এবং লুঙ্গিতেও যেন হাত দিয়েছিলাম। হঠাৎ আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। নির্মাণ শেষ করে যখন লোকজন নিজ নিজ কাজে চলে গেল তখন আমার হুঁশ ফিরে এল। আল্লাহ তাআলা আমাকে বিবস্ত্র হওয়া থেকে হেফাযত রাখলেন।

প্রকৃতপক্ষে উলঙ্গতা গুনাহের কাজ। সতর উন্মুক্ত করা গুনাহ। ইসলামে পুরুষের সতর নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। শরীরের এ অংশটুকু ঢেকে রাখা ওয়াজিব। নামাযের মধ্যে এর কোন অংশ খুলে গেলে নামায হবে না। চাই কেউ দেখুক বা না দেখুক– নামায হবে না। নবীর সতর ঘাড় থেকে

পায়ের গিরা পর্যন্ত। এ থেকে যদি কোন অংশ খুলে যায় তবে নামায হবে না।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধ্বংসাত্মক প্রভাব

আজকাল আমাদের বোনগণ বাহু, গলা বা সিনা খোলা যেসব পোশাক পরিধান করেন তা পরে তো নামাযই হয় না। (এই শর্তে যে, যদি তারা নামায পড়েন, যারা নামাযমুখীই হন না তাদের কথা ভিন্ন)। শরীরের এসব অংশ উন্মুক্ত রেখে পোশাক পরিধান করার দ্বারা তাদের সাজসজ্জা প্রকাশের উদ্দেশ্য সফল হলেও আল্লাহর নৈকট্যশীলতা, আনুগত্য ও ইবাদত তাতে নেই। পবিত্র হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

এক সময় এমন বহু নারীর উদ্ভব হবে যারা পোশাক পরিধান করা সত্ত্বেও উলঙ্গ থাকবে। তারা নিজেরা ভিন্ন পুরুষের প্রতি আসক্ত থাকবে এবং তাদেরকেও নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে। এ সকল নারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কেননা তারা ফেতনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে, দুনিয়াকে তারা জাহান্নামে পরিণত করার ইচ্ছা করেছে।

ঐ সকল নবীকে উক্ত হাদীসে প্রধানত দুটি শব্দের দ্বারা পরিচয় দেয়া হয়েছে। শব্দ দুটি হল كاسيات তথা পোশাক পরিহিত এবং عاريات তথা উলঙ্গ। অর্থাৎ পোশাক পরিধান করা সত্ত্বেও তারা থাকবে উলঙ্গ। হাদীসে যদিও পোশাক পরিধান সত্ত্বেও উলঙ্গতার কথা বলা হয়েছে কিন্তু সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকাও বর্তমান সময়ের এক ফ্যাশন। আমাদের প্রাচ্যে তো আসেনি কিন্তু ইউরোপের জার্মানীতে এ ফ্যাশনের প্রচলন হয়েছিল। এখনও তা আছে কি না জানি না। ত্রিশ বছর আগের কথা বলছি। নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র এলাকা নির্মাণ করে তাকে 'প্রাকৃতিক রঙ্গালয়' নামকরণ করা হয়েছে। তাতে কেবল সম্পূর্ণ উলঙ্গ ব্যক্তিরাই প্রবেশ করতে পারে। তারা বলে, প্রকৃতির দাবীই হল এই যে, উলঙ্গ থাক। প্রকৃতিগতভাবে উলঙ্গ হয়ে জন্ম নিয়ে কেন পোশাক পরিধান করব? সেখানকার সরকার তাদের জন্য স্বতন্ত্র এলাকা নির্মাণ করে সেখানে বসবাস করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তাদেরকে শহরে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়নি। সেখানে প্রবেশ করতে হলে পোশাক না পরার অঙ্গীকার করে প্রবেশ করতে হয়। (বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ফ্যাশন হাউজে এবং স্যাটেলাইট টিভিতে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র

নারী-পুরুষ দিয়ে ফ্যাশন শো-এর আয়োজন করা হয়। –অনুবাদক) এসব ক্ষেত্রে كاسيات তথা বস্ত্র পরিহিতার তো প্রশ্নই ওঠে না। শুধুই عاريات তথা উলঙ্গতা।

কিন্তু হাদীসে বর্ণিত 'পোশাক পরিধান করা সত্ত্বেও উলঙ্গ' থাকা তিনভাবে হতে পারে। এক. অসম্পূর্ণ পোশাক। অর্থাৎ পোশাক পরিধান করেছে কিন্তু বাহু উন্মুক্ত অথবা সিনা উন্মুক্ত কিংবা কোমড় বা পায়ের গোছা উন্মুক্ত। পোশাক পরিধান করার কারণে একে كاسيات বলা গেলেও সতর উন্মুক্ত থাকার কারণে এরা عاريات তথা উলঙ্গতার পর্যায়ভুক্ত।

দুই. পাতলা পোশাক। অর্থাৎ সম্পূর্ণ সতর ঢেকে পোশাক পরেছে কিন্তু পোশাক এতই পাতলা ও ফিনফিনে যে, সমস্ত শরীর দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং তারা যেন পোশাক পরেও উলঙ্গই রয়ে গেছে।

তিন. আঁটসাঁট পোশাক। অর্থাৎ পোশাকও সম্পূর্ণ সতর ঢেকে পরেছে এবং কাপড়ও পাতলা না কিন্তু এতই আঁটসাঁট বা টাইটফিট যে, শরীরের আকৃতি তাতে দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন- আজকাল প্রায়শই নারীদেরকে এ জাতীয় পোশাক পরতে দেখা যায়। আল্লাহ জানেন এসবে কী সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে। পোশাকে যখন উলঙ্গ এসে গেছে তখন তা সমগ্র শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। নিজের প্রকৃত ভালমন্দ বিবেচনা করার চিন্তাও তারা করছে না। তাদের চিন্তা এটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ যে, এটাই ফ্যাশন। সুতরাং এ অনুযায়ীই চলতে হবে।

দীনের ব্যাপারে কারও অনুসরণ অনুকরণ করতে গেলে সেখানে নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, যুক্তি ও তথ্যানুসন্ধান করা হয়, তিরস্কার করা হয়। কিন্তু দুনিয়ার ব্যাপারে সর্বদা অন্যের অনুকরণ চলছে সম্পূর্ণ বিনা বিবেচনায়। আমেরিকা কিংবা বৃটেন থেকে কোন একটি আওয়াজ উচ্চারিত হলে চোখ বন্ধ করে লোকজন তা মেনে নেয়। তাতে কল্যাণ রয়েছে না অকল্যাণ রয়েছে তা কে বিবেচনা করে! এটাই ফ্যাশন, গ্রহণ কর– ব্যস!

উপর্যুক্ত তিন প্রকারের কাপড়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষায়– كاسيات ও عاريات -এর আওতাভুক্ত। এগুলো পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

উপরিউক্ত তিন ধরনের পোশাকই নারীদের জন্য পরিত্যাজ্য। তাদের পোশাক যেন শরীরকে পরিপূর্ণ আবৃত করতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখা

আবশ্যক। পোশাক যদি পাতলাও হয়ে থাকে তবে নিচে যেন এমন কোন কাপড় থাকে যার দ্বারা শরীর ঢেকে যায়। অপর দিকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রদর্শিত হয় এমন আঁটসাঁট পোশাকও নিষিদ্ধ। কিছুটা ঢিলেঢালা পোশাকই পরিধান করা আবশ্যক। কারণ শরীয়ত উলঙ্গতাকে নিষিদ্ধ করেছে। শরীরের এক অংশকে উন্মুক্ত রাখার অনুমতি দিয়েছে এবং এক অংশকে কোন অবস্থাতেই উন্মুক্ত রাখার অনুমতি শরীয়ত দেয়নি। যে অংশকে উন্মুক্ত রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং তা খোলা অবস্থায় নামাযও হয় তা হল চেহারা ও হাত-পা। এর বাইরের অংশ অর্থাৎ ঘাড় থেকে শুরু করে পায়ের গিরা পর্যন্ত অংশ সতর-এর আওতাভুক্ত। পুরুষদের যেমন নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ সতর। সতর সব সময় আবৃত রাখতে হবে, খোলা যাবে না। এ ছাড়া নারীদের পর্দার ব্যাপারে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাকে শরীয়তের পরিভাষায় হিজাব বলা হয়, তা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। সতরের আওতাভুক্ত অংশ তো সব সময়ই ঢেকে রাখতে হবে। সতরের আওতা বহির্ভূত অংশ ভিন পুরুষের সামনে ঢেকে রাখার নাম হিজাব। সামনে যদি কোন ভিন পুরুষ না থাকে কিংবা ভিন পুরুষের অবস্থান যদি চিনতে না পারার মত দূরত্বে হয় তবে ঢেকে রাখার প্রয়োজন নেই। সুতরাং হিজাব হল অন্যের সাথে সম্পৃক্ত আর সতর হল নিজের ব্যক্তিসত্তার সাথে সম্পৃক্ত। ভিন পুরুষ (শরীয়ত যাদের সাথে বিয়ে শাদী বৈধ রেখেছে) না থাকলে হিজাবের প্রয়োজন নেই কিন্তু দেখার মত কেউ থাক বা না থাক সতর ঢেকে রাখতে হবে। মোট কথা, উলঙ্গপনাকে শরীয়ত হারাম করেছে। সুতরাং যে শরীয়ত উলঙ্গতাকে নিষিদ্ধ করেছে সেই শরীয়তের প্রতীক কি করে উলঙ্গ হবেন? সুতরাং আল্লাহ কর্তৃক হেফাযতের কারণেই সেদিন তিনি বিবস্ত্র হওয়া থেকে মুক্ত থেকেছেন।

নবীগণের নিষ্পাপতা জবরদস্তিমূলক নয় ঐচ্ছিক

আমি আলোচনা করেছি যে, সৃষ্টিগতভাবেই নবীগণ নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ হয়ে থাকেন। নবুওয়তের পূর্বে কিংবা পরে তারা গুনাহ করেন না। গুনাহ করতে না পারার অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা গুনাহ না করার জন্য তাদেরকে বাধ্য করেন, তাদের কোন ইচ্ছাশক্তিই থাকে না। বরং তাঁরা স্বেচ্ছায় গুনাহ থেকে মুক্ত থাকেন। এটাই প্রকৃত পূর্ণাঙ্গতা। অপরাগ বা বাধ্য হয়ে গুনাহমুক্ত থাকা পূর্ণাঙ্গতা নয়। তার পদ্ধতি আমি বর্ণনা করেছি

যে, তাঁর নিজের ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমেই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকেন কিন্তু গুনাহর ইচ্ছা করতে পারেন না। কেননা তাঁদের সৃষ্টি উপাদানে গুনাহর আকাঙ্ক্ষা নেই। মাটির পবিত্রতার কারণে গুনাহর আকাঙ্ক্ষা তাঁদের মধ্যে তৈরি হতে পারে না। এর সাথে সাথে সার্বক্ষণিক আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী প্রত্যক্ষ করার কারণে গুনাহ করার সাহস ও ইচ্ছা তাদের মধ্যে তৈরি হওয়া অসম্ভব।

তৃতীয়ত কখনও যদি মানবিক স্বভাববশত ওয়াসওয়াসা রূপে মনে কোন গুনাহের উদয়ও হয় তবে আল্লাহর হেফাযত তাদেরকে গুনাহ করা থেকে নিবৃত রাখে। এজন্যই তাঁদের জীবন নিষ্পাপ ও পবিত্র থাকে।

গুনাহর কাজের মাধ্যমে দীনের দাওয়াত দেয়া তাবলীগের নীতির পরিপন্থী

হাদীস শরীফে এসেছে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর কিছু দিনের জন্য ওহী অবতরণ বন্ধ হয়ে গেল যাকে 'ফিতরতের সময়' বলা হয় তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তরে এক দুর্বিবহ চাপ ও যাতনার সৃষ্টি হয়। তিনি এতটাই অস্থির হয়ে পড়লেন যে, তাঁর কাছে জীবন অর্থহীন মনে হতে লাগল। যে মাহাত্ম্য ও অপার সৌন্দর্য সামনে এসে চলে গেল তাকে ছাড়া বেঁচে থাকার কোন অবলম্বন যেন তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। সুতরাং তিনি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করার মানসে যাচ্ছিলাম। চলার পথে হঠাৎ 'হে মুহাম্মদ!' বলে কে যেন আমাকে ডাক দিল। আমি চারদিক তাকিয়ে আওয়াজের উৎস বা কথককে খুঁজে পেলাম না। আমি ঐ কাজ (আত্মহত্যা) থেকে বিরত রইলাম। পরবর্তীতে আবারো আমি একই সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার কাছে মনে হল এ কেমন জীবন! সেই অপার সৌন্দর্যের বিভা, সেই অপরূপ মাহাত্ম্যময় দ্যুতি, সেই মহাত্মনের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য– কিছুই তো নেই। তা হলে এ জীবন দিয়ে কি লাভ! আমি নিজেকে পাহাড় থেকে নিক্ষিপ্ত করতে উদ্যত হলাম। পুনরায় আওয়াজ এল এবং কেউ একজন আমার বাহু ধরে বলল– 'একি করছ!' তখনও আমি নিবৃত হলাম এবং কাউকে দেখতে পেলাম না। তারপর আরো একদিন আমি নিজেকে নিঃশেষ করার ইচ্ছা করলাম। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রকাশ

পেলেন। সেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাঈল (আ.)কে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছিলেন। এই হল আল্লাহ কর্তৃক হেফাযতের নিদর্শন। কেননা আত্মহত্যা তখনও নাজায়েয ছিল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই বলেছেন যে, আত্মহত্যা তো হারাম। সুতরাং তিনি নিজে কিভাবে তা করবেন?

এটা হল ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ যারা দীনের দাওয়াত দিতে চায়, ওয়াজ-নসিহত করে কিংবা মানুষের দ্বারা সওয়াবের কাজ করতে চায়। কিন্তু মনে করে যে যেহেতু লোকজন গান ও বাদ্য বাজনার মত গুনাহের কাজ ছাড়া জড় হবে না তাই আমরাও গান বাজনার আয়োজন করি। অতঃপর লোকজন জমা হওয়ার পর ওয়াজ করব।

সুতরাং গুনাহের কাজকে তাবলীগের মাধ্যম সাব্যস্ত করা সীমাহীন ক্ষতিকর জিনিস। কেননা গান বাজনার মাধ্যমে লোক জড় করে ওয়াজ করার পর আরেক দিন যখন গান-বাজনা হারাম বলে তাদেরকে তা করতে নিষেধ করা হবে তখন তাদের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং কোন গুনাহের কাজকে তাবলীগের মাধ্যম সাব্যস্ত করা তাবলীগের হেকমত পরিপন্থী।

কোন একটি অজুহাত মাসআলাগত শিথিলতা প্রদর্শন করা নিজের হাত পা বেঁধে রাখার শামিল। ভবিষ্যতে যদি তারা মাসআলা জানতে চায় তখন সঠিক মাসআলা দেয়ার মুখ থাকবে না। আপনি হয়তো এর যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তার কথা বলবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, সঠিক মাসআলার বিপরীতে কোন যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। সরল সহজ মাসআলা, তাতে আমল করতে হবে। কিসের যৌক্তিক কল্যাণ? আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। তাতে আমল করতে হবে। ব্যাস, এতেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু ভবিষ্যতে নির্দেশদাতা হবেন যে, নাচ-গান নিষিদ্ধ, আত্মহত্যা হারাম। সুতরাং নিজে সে কাজে উদ্যোগী হতে পারেন না। ওয়াসওয়াসাস্বরূপ একটি বিষয় এসেছিল বটে (বরং খেয়ালি পর্যায়ে ছিল মাত্র)। কিন্তু আল্লাহর হেফাযত পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, নিজের নবীর যাতে ভবিষ্যতে উপদেশ দিতে বেগ পেতে না হয় তার ব্যবস্থা করেছেন।

[মনে মনে কোন কাজের ইচ্ছা করা আর বাস্তবে কোন কাজ শুরু করা– এই দুইয়ের মধ্যে যোজন পার্থক্য রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মহত্যার জন্য যদি ঝাঁপ দিয়ে ব্যর্থ হতেন তবুও কাজটি তিনি করতে চেষ্টা করেছেন বলে সাব্যস্ত হত। –অনুবাদক]

এজন্যই নবীগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। সগীরা বা কবীরা কোন প্রকার গুনাহই করতে পারেন না। যদি সামান্য পর্যায়ের গুনাহও প্রকাশ পেত তবে অন্যকে উপদেশ দেয়ার অবস্থা থাকত না। লোকজন বলত যে, আপনি তো প্রথম জীবনে বেশ উপভোগ করেছেন, এখন কেন আমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন? আমাদেরকেও কম বেশি গুনাহ করার সুযোগ দিন– আপনার মত আমরাও ভবিষ্যতে ভাল হয়ে যাব। এইসব অপবাদ থেকে নবীগণকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে এমনই পবিত্র করে সৃষ্টি করেছেন যে, নবুওয়াতের পূর্বেও তাঁদের দ্বারা গুনাহ সংঘটিত হতে পারে না এবং নবুওয়াতের পরে তো নয়ই।

সুতরাং নবীগণের জীবনের প্রথম ভিত্তি তাঁদের নিষ্কলুষতা ও নিষ্পাপতা, যার দ্বারা তাদের জীবন অত্যন্ত পবিত্র হয়ে যায়। এর পর তাঁরা যে কাজ করেন তা 'উসওয়াতুল হাসানা' বা উত্তম আদর্শরূপে বিবেচিত হয়, অনুকরণীয় হয়। উম্মতকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, তোমরাও তাই কর। এজন্যই নবীগণের জীবনে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম গুনাহের লেশ মাত্র নেই।

এজন্যই বলা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে 'মিলাদ'-এর মৌলিক বিষয় হল 'ইসমত' তথা নিষ্কলুষতা। যার সূচনা হয়েছে জন্মলাভ থেকে। নবুওয়ত পূর্ববর্তী চল্লিশ বছর এবং নবুওয়ত পরবর্তী তেইশ বছরের পুরোটাই ছিল সম্পূর্ণ নিষ্পাপ জীবন। তেষট্টি বছরের এই দীর্ঘ জীবনে বিন্দু পরিমাণ বিষয়েরও অনুপ্রবেশ ঘটেনি যার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা যায়।

রাসূল (সা.)-এর পবিত্র চরিত্রের ব্যাপারে অমুসলিমদের সাক্ষ্য

ইতিহাস ও নবুওয়াতী জিন্দেগী সম্পর্কে যাদের ধারণা রয়েছে তারা যদি ন্যায়সঙ্গতভাবে চিন্তা করে তবে তারাও ঐ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য যে, এমন পূর্ণাঙ্গ জীবনের অধিকারী মানুষ– যার জীবনের ব্যাপারে বিন্দু পরিমাণ আপত্তি করার অবকাশও নেই তা পৃথিবীতে মাত্র একজনই রয়েছেন। আর তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আজ থেকে কয়েক বছর পূর্বে ভারতের লক্ষ্ণৌতে একটি সীরাত মাহফিল হয়েছিল। 'ফেরদৌসে অদব' নামক একটি বড় সংগঠন প্রতি বছরই

লক্ষ্ণৌতে মাহফিল করে থাকে। উক্ত সীরাত মাহফিল শোনার জন্য পঁচিশ-ত্রিশ হাজারের মত লোকের বিরাট সমাবেশ ঘটে। উক্ত মাহফিলে অংশ নেয়ার জন্য অধিকাংশ সময় আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় কিন্তু যাওয়ার অবকাশ হয়ে ওঠে না। একবার সে মাহফিলে অংশগ্রহণ করার সুযোগ হল। মাহফিল দেখে মনে হচ্ছিল যেন জনসমুদ্র; তো তারা উক্ত মাহফিলে উত্তর প্রদেশের গভর্নর কে এম মুনশী– যিনি ছিলেন হিন্দু, তাকেও দাওয়াত দিলেন এবং প্রধান অতিথিও করা হল তাকে। আমার কাছে বিষয়টি পছন্দ হল না। মাহফিলে অংশগ্রহণের দাওয়াত দেয়া ঠিক আছে, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনী শুনবে কিন্তু একটি পবিত্র মাহফিলের প্রধান অতিথির মর্যাদা একজন অমুসলিমের জন্য উপযুক্ত নয়। এ মর্যাদা কোন নেককার মুসলমানকেই দেয়া উচিত। সম্মান প্রদর্শন যদি করা হয় তবে তা কোন মুসলমানকেই করা কাম্য। কেননা যেহেতু ইসলাম পেশ করা হচ্ছে সেহেতু ইসলামেরই সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। উপস্থাপন করা হচ্ছে ইসলাম এবং সম্মান করা হচ্ছে অমুসলিমকে– এটা নীতিরও পরিপন্থী এবং বিবেকেরও পরিপন্থী। তবে হ্যাঁ, অংশগ্রহণের দাওয়াত দেয়া যেতে পারে, যাতে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শের কথা জেনে দীনের প্রতি ধাবিত হতে পারে।

যাই হোক, কে এম মুনশী শত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও প্রচণ্ড কাজের চাপে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং তার লিখিত বক্তব্য পাঠিয়ে দেন। পঁচিশ-ত্রিশ হাজার লোকের এই বিশাল সমাবেশে তার বক্তব্য পাঠ করে শোনানো হয়। উত্তর প্রদেশের সেই হিন্দু গভর্নরের বক্তব্যের দুটি অংশ ছিল। প্রথম অংশে তিনি বলেন– 'ঐতিহাসিকভাবে আমরা এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে বাধ্য যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মত পূর্ণাঙ্গ ও সার্বিক পরিপূর্ণ মানুষ পৃথিবীতে আর কেউ সৃষ্টি হয়নি। তার পূর্ণ জীবনের কোথাও দুর্বলতার ইঙ্গিতও দেয়ার অবকাশ নেই। যে অংশেই দৃষ্টি দেয়া হয়, পবিত্রতা ও পূর্ণাঙ্গতা ভাস্বর হয়ে ওঠে। পারিবারিক জীবনের দিকে যদি দৃষ্টি দেয়া হয় তবে আমরা তাকে সর্বোচ্চ পবিত্ররূপে দেখতে পাই। তাঁর একতাবদ্ধ জীবনের দিকে যদি দৃষ্টি ফেরাই তবে তাকে কল্যাণময় ও সর্বপ্রকার কলুষতা থেকে পূর্ণ পবিত্র দেখতে পাই। তাঁর সামাজিক জীবনের মাঝে আমরা খুঁজে পাব এক বরকতময় জীবনকে। তাঁর ব্যক্তি জীবনকে

যদি দেখি তাতেও ভাস্বর হয়ে উঠবে এক এক কল্যাণ ও বরকতপূর্ণ জীবন। মোট কথা, তাঁর ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, তাঁর নিদ্রা, জাগরণ, কথা, হাসি, আচরণ– জীবনের কোন অংশই এমন নয় যাতে অতি সামান্য পর্যায়ের বিদ্রূপ করা চলে কিংবা সামান্যতম আপত্তি উত্থাপন করা যায়।

কিছু কিছু লোক যদি আপত্তি করেও তো তেমন আপত্তি আল্লাহর ব্যাপারেও তো রয়েছে। বহু জড়বাদী নাস্তিক রয়েছে যারা আল্লাহর অস্তিত্বই স্বীকার করে না। এমন দুর্ভাগাদের তো কোন চিকিৎসা নেই। কিন্তু মানুষ যখন তাদের মানবিকতা দিয়ে চিন্তা করে, বিবেক দিয়ে চিন্তা করে, ইতিহাসকে সামনে রাখে তাহলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, তিনি এমনই এক পূর্ণাঙ্গ সত্তা ছিলেন যার ব্যাপারে অনু পরিমাণ আপত্তি তোলারও কোন অবকাশ নেই।

বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশে গভর্নর বলেন– আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি যে, আমরা ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে ভারতের আইন প্রণয়ন করেছি। ইসলামের মূলনীতিকে সামনে রেখে আইন তৈরি করেছি। যে নীতি উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ চূর্ণ করে দিয়েছে, স্পর্শ অস্পর্শতাকে নির্মূল করেছে, বংশ-বিভাজন গুঁড়িয়ে দিয়েছে, বর্ণবৈষম্য মিটিয়ে দিয়েছে। ইসলামী নীতি আমাদেরকে শিখিয়েছে– পৃথিবীর সকলের অধিকার সমান। যে কোন প্রকারের উন্নতির পথ সকলের জন্য উন্মুক্ত। যার ইচ্ছা উন্নতি করবে, অগ্রসর হবে। কেউ যদি স্বেচ্ছায় বক্রতার পথ গ্রহণ করে অথবা গোড়ামীর কারণে কারো পথে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করে তবে তা ব্যক্তিগত বিষয় এবং ব্যক্তির বদস্বভাব বলে বিবেচ্য– নীতি বা আইনের ত্রুটি নয়।

তার বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশে আরও ছিল– আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি যে, আমরা ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে ভারতের আইন প্রণয়ন করেছি– এটা মুসলমানদের জন্য উপলব্ধির বিষয় যে, অমুসলিমদের আইন প্রণয়নে কারও বুনিয়াদী অবদান থাকলে সেটা মুসলমানদেরই রয়েছে। এই যমানায় ন্যায় বিচারের কোন বিধান থাকলে তা ইসলামেরই আছে, অন্যান্য বিধানাবলী এ যুগে অচল। কেবল এ বিধানের মাঝেই মুক্তি নিহিত রয়েছে।

ইসলামী আইন চিরস্থায়ী ও বিশ্বজনীন

আজকাল যদি আমরা ছুঁৎ-অচ্ছ্যুততার প্রশ্ন তুলি তবে আমাদের জগত সংকীর্ণ হয়ে যাবে। অথচ বর্তমানের এই অগ্রসর সময়ে মানুষের বিচরণ বিশ্বব্যাপী। কখনো আকাশ পথে কখনো স্থল পথে পৃথিবীর অথবা স্বদেশের বিভিন্ন স্থানে আমাদেরকে ছুটে বেড়াতে হচ্ছে। সেখানে যদি আপনি ছুঁৎ-অচ্ছ্যুততার প্রশ্ন তোলেন, অন্যের ছায়া মাড়ানো থেকে বেঁচে থাকেন তবে প্রশ্ন উঠবে যে, আপনি যানবাহনে কীভাবে আরোহণ করবেন? অন্য দেশে কীভাবে ভ্রমণ করবেন? ওখানে তো লোকজনের ছায়া থাকবে। সুতরাং যদি কিছু সম্প্রদায়ের ছায়াও নাপাক হয় তবে নিজ ঘরের বাইরের পৃথিবীতে আপনার বের হওয়ার কী প্রয়োজন? পৃথিবীতে এখন বহু জাতির সমন্বিত ব্যবস্থাপনা দাঁড়িয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক হয়ে গেছে। এই পৃথিবীতে আজ অচ্ছ্যুততা বা বংশগত বিভাজন সম্পূর্ণ অচল। যারা এখনও এগুলো বলবৎ রাখতে চায় তারা লজ্জিত হয়ে ইসলামের দিকেই ধাবিত হবে। বর্তমান পৃথিবীতে তা চলতে পারে না, পৃথিবীর সাথেই এগিয়ে যেতে হবে।

হিন্দু ধর্মে ছুঁৎ-অচ্ছ্যুততা একটি মৌলিক বিষয় ছিল। ব্রাহ্মণের উপর অব্রাহ্মণের ছায়াও পড়তে পারবে না, তাহলে অপবিত্র হয়ে যাবে। তাদের হাতের খানা খাওয়া যাবে না। অব্রাহ্মণের হাত যদি খাবারে লাগে তবে তা ব্রাহ্মণের জন্য অপবিত্র হয়ে যায়। দূর থেকে খাবার দিতে হবে, যাতে তাদের ছায়াও গায়ে না লাগে। হিন্দু অহিন্দুর মধ্যেও পার্থক্য আছে। কোন জিনিসে অহিন্দুর ছায়া পড়লেও তা নাপাক হয়ে যায়। এগুলোই হল ছুঁৎ-অচ্ছ্যুততা যা পরিত্যাগ করতে বর্তমান পৃথিবী বাধ্য। ধর্মের এই মৌলিক বিষয়ের ধারকগণই আজ চরম ব্যর্থ।

মৌলিকভাবেই সম্পূর্ণ নাপাক বলে বিবেচ্য মেথর সম্প্রদায়ের বস্তিতে স্বয়ং গান্ধী অবস্থান করেছেন। যাতে করে পৃথিবীতে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, এখন আর মেথর-অমেথরের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে না। এখন তো দেশে দেশে জনমত জরিপ ও আদমশুমারী হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের কাছে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির একটি গ্রহণযোগ্যতা আছে। সেখানে উঁচু-নিচু পার্থক্য করার কোন হক নেই।

একবার ভারতের উত্তর প্রদেশের এক মুখ্যমন্ত্রী সাহারানপুর জেলা পরিদর্শনে এলেন। আমাদের দেওবন্দের নিকটবর্তী একটি গ্রাম 'রণখাণ্ডী'ও পরিদর্শনের আওতায় ছিল। তার প্রোগ্রামসূচিতে ছাপা হল যে, রণখণ্ডির মন্দিরের এক মুচির ঘরে অবস্থান নেবেন এবং তাদের গ্লাসে দুধ পান করবেন। এর দ্বারা তিনি একথা প্রমাণ করতে চাইছেন যে, বংশগত বিভাজন এখন শেষ হয়ে গেছে। বর্তমান সময়ে তা অচল।

কংগ্রেস যখন প্রথম সরকার গঠন করে তখন মহাত্মা গান্ধী একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন যা ভারতের পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। তাতে তিনি লেখেন– 'যদি আমাদের মন্ত্রীবর্গ বিশ্বনন্দিত হতে চান এবং আমাদের মন্ত্রণালয়গুলো যদি ভুবনজয়ী হতে চায় তবে তাদেরকে আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ও উমর ফারুক (রা.)-এর নমুনা নিজেদের সামনে রাখতে হবে। রূম ও পারস্য সাম্রাজ্য লুটিয়ে পড়েছিল তাঁদের পদতলে অথচ জোড়াতালি দেয়া পোশাক তেমনই ছিল, জবের রুটির আহার তেমনই ছিল, তাঁদের দারিদ্র ও অনাহার তেমনই ছিল এবং তাঁদের ব্যক্তিস্বার্থ, সংসারের প্রতি উদাসীনতা ও অল্পেতুষ্টি সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয় ছিল। সুতরাং আমাদের কংগ্রেস সরকার যদি পৃথিবীতে মহিমান্বিত হতে চায় তবে আবু বকর ও উমর (রা.)-এর পথ ও পদ্ধতিই তাদেরকে অনুসরণ করতে হবে।'

খুবই অনুধাবনের বিষয় যে, আজ অমুসলিমদের কাছেও মুসলমানদের দৃষ্টান্ত ছাড়া অন্য কোন দৃষ্টান্ত নেই। জাতিকে উপদেশ দেয়ার জন্য স্বজাতির মাঝে অনুসরণযোগ্য কেউ নেই বলে হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)-এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে হয়েছে। সুদৃঢ় ঐতিহাসিক প্রমাণের ভিত্তিতে পৃথিবীর যে কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিত্ব খুঁজতে গেলে মুসলমানদেরকে নির্বাচন করতে বাধ্য হতে হয়। হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত উমর ফারুক, হযরত আলী মুরতাজা, হযরত উসমান গনি প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের জীবন পৃথিবীবাসীর জন্য নির্দ্বিধায় অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য। প্রমাণ হল অমুসলিমরাও অবগত ছিল যে, এঁরা ছিলেন এমনই ব্যক্তিসত্তা যাঁদের জীবনের প্রতি ক্ষুদ্রতম আপত্তি তোলারও কারও অবকাশ নেই।

রাসূল (সা.)-এর চরিত্রের এক টুকরো ঝলক

হাদীসে এসেছে–

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود ريحا مرسلا

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন প্রবাহিত বাতাসের চেয়েও সতেজ।

স্বাভাবিক সময়ে তো বদান্যতা ছিলই কিন্তু পবিত্র রমযানের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তাঁর দানশীলতা ছিল যেন প্রভাতের কোমল বাতাসের মত। যেমনিভাবে সকালের ঠাণ্ডা কোমল বাতাস প্রত্যেক ঘরে, প্রত্যেক অন্তরে, প্রত্যেক মগজে প্রবেশ করে এবং তার দ্বারা প্রফুল্লতা ও সতেজতার সৃষ্টি হয় তেমনিভাবে গৃহস্থ বেদুইন নির্বিশেষে প্রত্যেক ঘরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দানশীলতার প্রভাব পড়ত। প্রত্যেক জায়গায় তিনি অর্থ বণ্টন করতেন, বিভিন্ন বস্তু বণ্টন করতেন। مرسلا اجود ريحا প্রবাহিত বাতাসের চেয়ে অধিক ছিল তাঁর বদান্যতা। বাতাস এত বেশি বিস্তৃত হত না যতটা বিস্তৃত হত তাঁর দানশীলতা। আর দানশীলতা তখনই পূর্ণাঙ্গতা পায় যখন দুনিয়াবিমুখতা হয় পূর্ণাঙ্গ। অন্তর যদি দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন থাকে তবে অন্যকে দান করার স্বভাব তৈরি হয় না। এ জন্যই এ ধরনের ব্যক্তিদের কাছে দুনিয়ার সব কিছুর ঊর্ধ্বে শরীয়ত। যদি সমস্ত সম্পদও চলে যায় তবু তারা পরোয়া করে না।

সুতরাং নবীগণের চেয়ে অধিক দুনিয়াবিমুখতা ও অল্পেতুষ্টি আর কার হতে পারে? আর নবীগণের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংসারবিমুখতা ও অল্পেতুষ্টির তো কোন সীমা পরিসীমাই নেই।

হাদীসে এসেছে– 'একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামায পড়ানোর জন্য তাশরিফ রাখলেন। আযান হয়ে গিয়েছিল, নামাযের কাতারও ঠিক হয়ে গিয়েছিল। নামায পড়ানোর জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জায়নামাযেও দাঁড়ালেন। ইকামতও হয়ে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ত বাঁধারও উপক্রম হলে হঠাৎ তিনি একেবারে ঘাবড়ে গিয়ে ঘরে চলে গেলেন। কয়েক মিনিট পর ফিরে এসে নামায পড়ালেন। নামায শেষে সাহাবায়ে কেরাম আরয

করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যা পূর্বে কখনো করেননি– ইকামতের পর ঘরে ফিরে গেলেন। কী হয়েছিল?

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার ঘরে একটি তাকের উপরে একটি দিনার রক্ষিত ছিল। যখন আমি নিয়ত বাঁধতে যাচ্ছিলাম তখন স্মরণ হল। আর নবীর জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, রাত অতিবাহিত হয়ে যাবে আর তাঁর ঘরে স্বর্ণ-রৌপ্য থাকবে। এজন্যই আমি ঘাবড়ে গিয়ে ঘরে ফিরে গেলাম, উক্ত দিনারটি দান করে ঘর পবিত্র করে এসে নামায পড়ালাম।'

স্পষ্ট যে, এ ধরনের সংসারবিমুখতা ও অল্পেতুষ্টি কেবল নবীগণের পক্ষেই অর্জন করা সম্ভব।

রাসূল (সা.)-এর সীরাতকে ধারণ করার ক্ষমতা সকলের থাকে না

আজকাল লোকজন সীরাত মাহফিল করার জন্য বলে থাকে। সীরাত বলা হয় অভ্যাস ও চরিত্রকে। অর্থাৎ নবীগণের সত্তাগত জীবনের নাম সীরাত। তো কার এমন সাহস আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাসসমূহের অনুকরণ করে? সকল সাহাবীরও সামর্থ হয়নি তাঁর সত্তাগত জীবনের অনুকরণ করার। দু'একজনের পক্ষে সম্ভব হলেও ব্যাপক সাহাবী ছিলেন সাধারণ শরীয়তের অনুসারী। আর আমাদের সৌভাগ্যও তাতেই নিহিত রয়েছে। প্রতি পদে হুবহু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুকরণের আকাঙ্ক্ষা আমাদের সামর্থযোগ্য নয়। আল্লাহর খাস অলিগণের পক্ষে সম্ভব। শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে থাকাই আমাদের জন্য বড় সৌভাগ্য।

আমি তো বলে থাকি যে, মানুষ যদি হারাম থেকে বেঁচে থাকে এবং ফরযসমূহ আদায় করে তবে তারাই এ যুগের শিবলী বা জুনায়েদ বাগদাদী। বর্তমানে শিবলী বা জুনায়েদ প্রথম যুগের অনুরূপ নয় যে তারা একটি মোস্তাহাবও তরক করবে না এবং সকল প্রকার মাকরূহ হতে বেঁচে থাকবে। যারা ফরযসমূহ আদায় করেন এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকেন তারাই এ যুগের অত্যন্ত পবিত্র ব্যক্তিত্ব। তার চেয়ে কামেল আর কেউ নেই। ফেতনা এতই বেড়ে গেছে যে, এ যুগে কেউ যদি চায় যে আমি আবু

বকর বা উমর (রা.)-এর মত জীবন যাপন করব তবে তা সম্ভব নয়। না আছে যুগের অবস্থা, না আছে আমাদের সামর্থ্য। আমাদের আকাঙ্ক্ষা শুধু এতটুকুই যে, আমরা শরীয়তের সীমার বাইরে যাব না, নাজায়েয কাজ করব না, জায়েযের গণ্ডির মধ্যে থাকব, সন্দেহযুক্ত কাজ ও হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকব। এতটুকুই যথেষ্ট। কেননা নবী জীবনের অনুকরণে জীবন যাপন করতে তো আকাবির অলিগণই পারেননি।

হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর ব্যাপারে একটি ঐতিহাসিক বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁর দরবারে দশ হাজার করে মুরীদ থাকতেন এবং লঙ্গরখানা থেকে খাবার বিতরণ করা হত। একদিন তিনি বাবুর্চিখানার দিকে গেলেন এবং কি খাবার দেয়া হয় সে সম্পর্কে জানতে চাইলেন। লোকজন বলল, গোশত-রুটি, কখনো ডালও থাকে কখনো ভাতও থাকে। তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার! আমরা এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের প্রচলনের জন্য বসেছি। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যবের রুটি ছাড়া কিছু খাননি, আর আমরা এখানে গোশত, রুটি আর ডাল খাচ্ছি। তিনি এগুলো বন্ধ করে যবের রুটি খাওয়ার নির্দেশ দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে যবের রুটি খেতেন তা যাঁতায় ভাঙ্গা মিহিন আটাও ছিল না, পাথরের পাত্রে যব রেখে অন্য একটি পাথর দিয়ে কুটে ভাঙ্গা হত, যাতে ফু দিলে ভুসি উড়ে যেত। এগুলোই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহার করতেন। তাও মাসে দুই তিনবার জুটতো। তা না হলে উপোস থাকতেন। এমনও মাস গেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরের চুলা থেকে ধোয়া ওড়েনি। যাই হোক, আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) বলেন, আমরা এখানে রাসূলের নায়েব হিসেবে রয়েছি, যেন নায়েবে রাসূলের আস্তানা। আর আমরা এমন মজা উপভোগ করছি? সকলকে যবের রুটি দেয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর রুটি, গোশত, ডাল, ভাত ইত্যাদি বন্ধ করে দিয়ে যবের রুটি ও জয়তুন তেল দেয়া শুরু হল।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রুহানিয়াত ভিন্ন বিষয় হলেও পেট তো যবের রুটি সহ্য করতে পারছিল না। ফলাফল এই হল যে, সকলের হজমের সমস্যা হল। কারো দাস্ত হতে লাগল, কারো জ্বর এল। মোট কথা, অর্ধেকের বেশি লোক অসুস্থ হয়ে পড়ল। আল্লাহর যিকিরের যে মজলিশ

ছিল তা চুপচাপ হতে শুরু করল। কেউ হায় হায় করতে লাগল, কেউ জ্বরে পড়ে রইল। খানকা সম্পূর্ণ নিশ্চুপ হয়ে পড়ল।

তিন দিন পর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) বললেন, আল্লাহর যিকিরের আওয়াজ কেন আসছে না? তাঁকে বলা হল যে, আপনার নির্দেশ মত গমের আটা, গোশত, ডাল, ভাত প্রভৃতি বন্ধ করে দিয়ে যবের রুটি ও জয়তুন তেলের সুন্নাহর প্রচলন শুরু করা হয়েছে। লোকজন সে রুটি হজম করতে পারছে না। সকলে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এজন্যই আল্লাহর যিকির ধ্বনি শোনা যাচ্ছে না। এ কথা শুনে হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) স্বীয় কানে হাত রেখে বললেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্তাগত জীবনের অনুসরণ করার আকাঙ্ক্ষা করে ভুল করেছি। এগুলো আমাদের কাজ নয়, নবীগণের প্রতিভা। তাঁরা এসব সহ্য করতে পারতেন। আমাদের কাজ এতটুকুই যে, জায়েযের গণ্ডির মধ্যে থাকব এবং নাজায়েয থেকে বেঁচে থাকব। অতঃপর তিনি পূর্বের ন্যায় খাদ্য প্রদানের নির্দেশ দিলেন।

তো মৌলিক কথা এই যে, নবীগণের সত্তাগত জীবন– যার নাম সীরাত তার উপর আমল করা আপনার আমার সামর্থযোগ্য নয়। আমি তো মাঝে মধ্যে বলে থাকি যে, সীরাতের নামে জলসা করাতে কখনো কখনো তো ভয় লাগে। না জানি বেয়াদবী হয়ে যায় কি না। কেননা সীরাত মাহফিল করা বা সীরাতের আলোচনা করা দ্বারা উদ্দেশ্য তো এই যে, যাতে আমরা তার উপর আমল করতে পারি। সীরাতে রাসূলের উপর চলার যোগ্যতা আমাদের কোথায়। আপনার আমার মধ্যে বিশেষ করে আমি নিজেকেও বলি যে, আমার মধ্যে কি এ সাহসিকতা আছে যে, ঘরে যত সোনা-রূপা আছে সব সদকা করে দেব, যাতে ঘর পবিত্র হয়ে যায়। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জায়নামাযে দাঁড়িয়েও ঘরকে স্বর্ণমুক্ত না করে নামায পড়াননি। আছে কারো সে সাহস? কেউ করতে পারবে না। কেউ কি পারবেন আজ থেকে যবের রুটিকে আহাররূপে গ্রহণ করতে? শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) পারেননি, আপনার আমার কী সাধ্য আছে? এজন্যই সীরাতের নামে মাহফিল করতে গিয়ে কখনো কখনো এই মনে হয় যে, বেয়াদবী করে বসছি না তো!

মানুষকে সংশোধন ও ওয়াজ-নসিহতের জলসা হতে পারে। সীরাত জলসার মানে হল– আমরা সীরাতের উপর আমল করব। পূর্ণ শরীয়তকেই তো আমরা ধারণ করতে পারছি না। নাজায়েয বিষয়ের মধ্যে আমরা রত রয়েছি– আমরা আমল করব সীরাতের উপর? আশা করব ঠিক আছে কিন্তু নিজের সামর্থকে দেখে তো আশা করব। হুবহু সীরাতের উপর আমল করা কারোরই সামর্থযোগ্য নয়। আমি বলতে চাচ্ছি যে, নবীগণের সংসারবিমুখতা ও অল্পেতুষ্টি বিশেষ করে নবীগণের সরদার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ গুণাবলী পৃথিবী সহ্য করতে পারে না। এমনকি সাহাবাগণও পারেননি। হাতেগোনা কয়েকজন মাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্তাগত জীবনের উপর আমল করেছেন। যেমন- হযরত আবু জর গিফারী (রহ.)-এর অভ্যাস ছিল এই যে, যদি এক বেলার খাবার থাকত তবে পরের বেলার খাবার জমা করাকে নাজায়েয মনে করতেন। কেননা এগুলো সঞ্চিত ধনভাণ্ডারের আওতাভুক্ত, যাকে কুরআন নিন্দা করেছে এবং বলেছে যে, সঞ্চিত ধনভাণ্ডারের স্বর্ণ-রৌপ্য জ্বালিয়ে জাহান্নামে তাদের দাগ দিয়ে দেয়া হবে। এক বেলার খাবার থাকতে অন্য বেলার খাবারের চিন্তা করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী– বিধায় জায়েয নেই। এটা ছিল হযরত আবু জর গিফারী (রা.)-এর ব্যক্তিগত মাযহাব। প্রতিপদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণের নমুনা সাহাবীদের মধ্যে এই একজনই রয়েছেন। অন্যরা সহ্য করতে পারেননি।

হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতের সময় সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন হযরত মুআবিয়া (রা.)। সেখানে হযরত সাহাবায়ে কেরামের দস্তরখানে কয়েক প্রকারের খাবার থাকত। তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদও ছিল উত্তম, বাড়িঘরও কিছুটা ভাল ছিল। আর এগুলো কোন নাজায়েয বিষয়ও ছিল না। হাদীস শরীফে এসেছে–

ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده

অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর যে বান্দাকে নেয়ামত দান করেন, সম্পদ দান করেন, আল্লাহ পছন্দ করেন যে, সে নেয়ামতের নিদর্শনও যেন তার উপর থাকে।

সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম যদি উত্তম কাপড় পরিধান করেন, ভাল আহার করেন তা তো (নাউযুবিল্লাহ) কোন নাজায়েয কাজ ছিল না। তাদের চেয়ে পবিত্র আর কে আছেন? কিন্তু হযরত আবু জর গিফারী (রা.)-এর অবস্থা এমন ছিল যে, যদি কারও ঘরে গিয়ে একাধিক খাবারের আয়োজন দেখতেন তবে লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং বলতে থাকতেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে কবে দুই ধরনের খাবার ছিল? তুমি কিভাবে এটা করলে? একাধিক খাবার সরাও। শুধু নসিহত করেই ক্ষান্ত হতেন না, খাবার সরাবার জন্য লাঠি নিয়ে মারপিট শুরু করে দিতেন। তেমনিভাবে কারো কাছে একাধিক পোশাক থাকলে লাঠি উচিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সদকা করে দিতে বলতেন। তাঁর এ অবস্থায় লোকজনের বিরক্তি এসে গেল। অবশেষে তারা হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে এই বলে চিঠি লিখলেন যে, তিনি তো আমাদের জীবন তিক্ত করে তুলেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মত তাকওয়ার সর্বোচ্চ পর্যায়ে আজ কিভাবে সকলেই পৌঁছবেন? কেমন করে লোকজন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্তাগত জীবনের অনুসরণ করতে সক্ষম হবে? তিনি যেন এ শহরে না থাকে আপনি তার নির্দেশ দিন। শরীয়ত তো সম্পদশালীকে তার সম্পদের যাকাত দিয়ে তাকে পবিত্র করার অবকাশ দিয়েছে। এমন তো নয় যে সমগ্র সম্পদ সমুদ্রে নিক্ষেপ করার পর তা পবিত্র হবে। শরীয়ত অবকাশ দিলেও তিনি অবকাশ দিচ্ছেন না। অবশেষে হযরত উসমান (রা.) তাঁকে হুকুম দিলেন যে, আপনি শহর ছেড়ে জঙ্গলে অবস্থান করুন?*

তিনি শুধু নবী নন বরং সর্বশেষ নবীও

মহান চরিত্রের কারণে ইসলামের প্রসার হয়েছে, তলোয়ারের জোরে নয়। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ধৈর্য, বিনয়, দয়া, সাহসিকতা, ন্যায়পরায়ণতা ছিল যেন আল্লাহরই চরিত্র। যা এ কথাই প্রকাশ করে তুলতো যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। আর তারই সাথে সাথে মুজিযা, অতঃপর ওহী– এসব কিছুই এমন যে এর দ্বারা কলবের ভিতর

* এর পরে আলোচনার কিছু অংশ রেকর্ড হয়নি।

ঈমানের সৃষ্টি হয়, লোকজন দীনের প্রতি এগিয়ে আসে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন নবীকেই নিজের কওমের কাছ থেকে এতটা কষ্ট সহ্য করতে হয়নি, যতটা কষ্ট আমাকে সহ্য করতে হয়েছে। অথচ বাহ্যিকভাবে এটাই মনে হতে পারে যে, হযরত নূহ (আ.)কে বেশি কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। সাড়ে নয়শত বছর তিনি দাওয়াত দিয়েছেন আর তার কওম শুধুই ঠাট্টা করেছে। হযরত মুসা (আ.)কে ফেরাউন কষ্ট দিয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তো এতকিছু হয়নি। তবু তিনি কেন বললেন যে, আমার মত কাউকে কষ্ট সহ্য করতে হয়নি?

এর ভিত্তি হল এই যে, কষ্ট তখনই বেশি অনুভূত হয় যখন ভালবাসা অত্যধিক হয়। আপনি যাকে ভালবাসেন তার থেকে যদি সামান্যও কষ্ট পান তবু তা অত্যধিক অনুভূত হবে। কারণ আপনি ভাববেন, তার তো আমাকে কষ্ট দেয়ার অধিকার নেই; আমি তাকে এত ভালবাসি আর সে আমাকে কষ্ট দেয়। শত্রুরা যদি আপনাকে গালিও দেয় তবু আপনি তা খেয়ালও করেন না কিন্তু আপনার ছেলে যদি বাঁকা চোখেও তাকায় তবু আপনি তাকে ঘর থেকে বের করে দেবেন, যার পর নাই কষ্ট পাবেন। কেননা তার থেকে আপনার এ আশা ছিল না যে, যার প্রতি আপনার এত অনুরাগ, এত দয়া সে কষ্ট দেবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যেহেতু উম্মতের প্রতি অসীম অনুরাগ ও দয়া ছিল সেজন্যই তাদের দেয়া কষ্ট দ্বিগুণ, তিনগুণ অনুভূত হত। এই ভেবে যে, আমি তাদের প্রতি এত অনুরক্ত আর তারা আমার সাথে এই আচরণ করছে! সুতরাং অধিক ভালবাসার কারণেই উম্মতের দেয়া কষ্ট তাঁকে অত্যন্ত ব্যথিত করত। এ কারণেই আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁকে বাধা দিয়ে বলা হয়েছে, তাদের প্রতি আপনার অনুরাগ কিছুটা কমিয়ে আনুন। এত অধিক ভালবাসবেন না যার পরিণতিতে আপনাকেই কষ্ট ভোগ করতে হয়। ইরশাদ হয়েছে–

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَنْ لَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

তারা কেন মুসলমান হচ্ছে না– এই পেরেশানীতে হয়তো আপনি নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবেন। আপনি তাদের চিন্তায় বিভোর না থেকে

দাওয়াত দিতে থাকুন। না মানলে তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রয়েছে। আপনি কেন তাদের জন্য দুঃখ পাবেন? কিন্তু অসীম দয়ার অধিকারী হওয়া এবং তাদের প্রতি পরম ভালবাসা ও মহান চরিত্রের কারণে তিনি কষ্ট পেতেন। এতই দয়াদ্র চরিত্র ছিল যে, যাতে নিজের কষ্ট হয় এমন ভালবাসা থেকে বিরত থাকলে আল্লাহর পক্ষ হতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হয়েছে।

মোট কথা, সবর হোক, ন্যায়পরায়ণতা হোক কিংবা সাহসিকতা হোক– নবীগণের মধ্যে তিনি যেহেতু খাতামুন্ নাবিয়্যিন, সেহেতু আখলাক তথা চারিত্রিক গুণাবলীতেও তিনি ছিলেন খাতামুল আখলাক। চারিত্রিক যে স্তরে তাঁকে উন্নীত করা হয়েছিল অন্য কোন নবীকে সে স্তর দেয়া হয়নি। ইলম-এর যে স্তর নবীগণকে দেয়া হয়েছে তার চেয়ে বহুগুণে বর্ধিত স্তর দেয়া হয়েছে তাঁকে। তাঁর মত সমুন্নত অবস্থা অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি। এজন্যই অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম নবী ছিলেন আর তিনি শুধু নবী নন; বরং খাতামুন্ নাবিয়্যিন ছিলেন।

খাতামুন্ নাবিয়্যিন দ্বারা উদ্দেশ্য

খাতামুন্ নাবিয়্যিনের উদ্দেশ্য হল নবুওয়াত, ইলম এবং আখলাক-এর যতগুলো স্তর রয়েছে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় সত্তার উপর খতম হয়ে গিয়েছে। তিনি সার্বিক পূর্ণতার পরিসমাপ্তি। তাঁর সত্তাতেই হয়েছিল সকল পূর্ণতার সমাপ্তি। যেন নবুওয়াতের আর কোন দরজাই অবশিষ্ট নেই যে, তা নিয়ে অন্য কোন নবীর আবির্ভাব হবে এবং তিনি তার প্রচার ও তাবলীগ করবেন। তাঁর পবিত্র সত্তার উপরে নবুওয়াতের সমগ্র স্তরের পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে। এজন্যই তার পরে না ছিল আর কোন নবুওয়াতের প্রয়োজনীয়তা, না ছিল শরীয়তের প্রয়োজনীয়তা। তাঁর আনীত দীন ছিল সমগ্র দীনের পরিসমাপ্তিকারী। সব কিছুর সর্বোচ্চ স্তর খতমে নবুওয়াতের কারণে তাঁকে দান করা হয়েছে।

এখানে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে যে, খতমে নবুওয়াত-এর মাধ্যমে নবুওয়াতের ধারার সমাপ্তি করা হয়েছে। অথচ নবুওয়াত হল রহমতের

সর্বোচ্চ স্তর। তাঁকে রহমতস্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে। সুতরাং তার দ্বারা রহমতের দরজা বন্ধ না হয়ে বরং হাজারো নবী আগমনের সুযোগ থাকাই রহমতের দাবী ছিল। সুতরাং তিনি রহমত নন (নাউযুবিল্লাহ); বরং জুহমত তথা গযবরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। কেননা খতমে নবুওয়তের মাধ্যমে নবুওয়াতের মত মহান রহমতের দরজাকে তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন।

এ সন্দেহ কারো মনে এমনিতেও উদয় হতে পারে কিংবা অন্যের পক্ষ হতে আরোপিতও হতে পারে। এবার এ আপত্তির উত্তর শুনুন। উত্তরের সার সংক্ষেপ হল– খতমে নবুওয়াতের অর্থ নবুওয়াতের ধারার কর্তন নয় যে দুনিয়া থেকে নবুওয়াত বন্ধ হয়ে গেছে; বরং খতমে নবুওয়াতের অর্থ হল নবুওয়াতের পূর্ণতা। অর্থাৎ নবুওয়াত পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়েছে। আর কোন বস্তু পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্তির পর তার প্রত্যাবর্তনের কোন স্তর বাকী থাকে না।

এর দৃষ্টান্ত এমন– যেমন রাতের বেলা, তারকা জ্বলতে শুরু করেছে। সূর্যাস্তের পর একটি জ্বলেছে, এরপর দুটি, তিনটি, হাজার, লাখ, কোটি, দশ কোটি– সমগ্র আকাশ জ্বলজ্বলে হয়ে উঠেছে। তারায় তারায় আকাশ ছেয়ে গেছে এবং চাঁদও উদিত হয়েছে। তারকারাজি ও চাঁদ মিলে আলো ছড়াচ্ছে কিন্তু রাত দূরীভূত হচ্ছে না, দিন হচ্ছে না। সারা রাত সকলে মিলে কত আলো ছড়াল কিন্তু রাত রাতই রয়ে গেল, রাতের অবসান হল না।

সূর্যোদয়ের যখন সময় হল তখন তার আগমনের পূর্বেই সুবহে সাদেক এসে ঘোষণা করল যে সূর্য আসছে। ব্যাস, অন্ধকার দূর হতে শুরু করে দিয়েছে। সূর্য উদয় হল। একটিমাত্র নক্ষত্র এসে সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করে দিল। অর্থাৎ তারা তো লক্ষ কোটি মিলে আলো ছড়িয়েও রাতকে দূর করতে পারেনি, রাত রাতই থেকে গেছে। আর একটি মাত্র নক্ষত্র এসে রাতকে হটিয়ে সমগ্র পৃথিবীকে দিবস আলোয় উজ্জ্বল করে তুলেছে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন বলেছেন–

انا خاتم النبيين

আমি নবীগণের পরিসমাপ্তকারী।

তদ্রূপ যদি সূর্য বলে–

انا خاتم الأنوار

আমি সকল আলোকের পরিসমাপ্তকারী। সব আলো আমার সত্তায় খতম হয়ে গেছে। আমার আগমনের পরে আর কোন নক্ষত্রের প্রয়োজন নেই এবং নতুন আর কোন নক্ষত্রও আসছে না। কেননা আমি এতই পরিপূর্ণ আলো নিয়ে এসেছি যে, এখন আর কোন নক্ষত্রের প্রয়োজন নেই। যারা ছিল তাদের আলোও ঢাকা পড়ে গেছে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তারা এখন দৃশ্যমান হওয়ারও যোগ্য নয়। তো এর অর্থ এই নয় যে, সূর্য এসে তারকারাজির আলো ছিনিয়ে নিয়েছে। সেগুলো ঠিকই আলোকিত কিন্তু সূর্যের তেজদীপ্ততা ও ঔজ্জ্বল্যের সামনে তাদের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে গেছে, চোখেও পড়ে না। এ অবস্থায় যদি সূর্য বলে–

انا خاتم الأنوار

আমি আলোকের সমাপ্তিকারী, সব আলো আমার ওপর খতম হয়ে গেছে।

তবে তার অর্থ হবে এই, এখন আলোর এমন কোন স্তর বাকী নেই যে, অন্য কোন নক্ষত্র এসে আলো ছড়াবে। এখন সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি একাই যথেষ্ট। অন্য কোন নক্ষত্রের আগমনের প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, এই দিনই যদি শেষ হয়ে যায় কিংবা এই পৃথিবীই যদি শেষ হয়ে যায় তবে সে কথা ভিন্ন। কিন্তু যতক্ষণ এই দিবসের অস্তিত্ব থাকবে ততক্ষণ কোন নক্ষত্রের প্রয়োজন নেই। কেননা আমার অস্তিত্ব বা সত্তার উপর আলোর সমাপ্তি হয়ে গেছে।

সূর্য কর্তৃক এই خاتم الأنوار (আলোর সমাপ্তিকারী) দাবীর মানে কি এই যে, আলো শেষ হয়ে গেছে? দুনিয়া থেকে আলো নিভে গেছে? সব কিছু অন্ধকারে ছেয়ে গেছে? নাকি এর অর্থ এই হবে যে, আলোক আগমনের ধাপের সমাপ্তি হয়েছে, পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়েছে, এখন অন্য কোন নক্ষত্রের আবশ্যকতা নেই, অন্য কোন ঔজ্জ্বল্যের প্রয়োজন নেই। সুতরাং আলোর খতম হওয়া মানে বন্ধ করে দেয়া বা নিভিয়ে দেয়া নয়; বরং আলোর পূর্ণাঙ্গতা। অর্থাৎ আলোর পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটেছে, এখন অন্য কোন আলোর আবশ্যকতা নেই।

নবুওয়াতের সূর্যোদয়

পূর্বের উদাহরণের মতই বোঝার সুবিধার্থে নবুওয়াতকে আমরা একটি আকাশ বলে কল্পনা করে নিতে পারি। যে আকাশে সর্বাগ্রে হযরত আদম (আ.)-এর নূরের নক্ষত্র আলো ছড়িয়েছে। অতঃপর হযরত নূহ (আ.)-এর নূরের নক্ষত্র আলো ছড়িয়েছে। অতঃপর হযরত হুদ (আ.)-এর, অতঃপর হযরত সালেহ (আ.)-এর। তারপর একের পর এক নবীগণ আগমন করতে শুরু করেন। ইবরাহীম (আ.) আগমন করেছেন। মুসা (আ.) আগমন করেছেন। অতঃপর মুসা (আ.)-এর পরে বনি ইসরাইল থেকে হাজারো নবীর আগমন ঘটেছে। যেন নবুওয়াতের আকাশ নক্ষত্ররাজিতে ভরে গিয়েছে কিন্তু পৃথিবীতে দিবসের আলো ফোটেনি, রাত রাতই রয়ে গেছে। তার অবসান হয়নি। অতঃপর ফারান পর্বত শিখরে (হেরা গুহায়) সুবহে সাদেক-এর উদয় হল। তিনি সংবাদ দিলেন, নবুওয়াতের সূর্য উদিত হয়েছে। উদয়ের পূর্বেই খবর এসেছিল যে, পৃথিবীতে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হতে শুরু করেছে। তারকারাজি স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে এবং দীপ্ত সূর্য উদিত হয়েই ঘোষণা করলেন, আমি এসেছি, এখন অন্য কোন নক্ষত্রের প্রয়োজন নেই। আমার আগমনই যথেষ্ট। সমগ্র বিশ্বের জন্য আমিই যথেষ্ট। নবুওয়াতের সমাপ্তি ঘটেছে। অর্থাৎ নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা আমার সত্তায় এসে সমাপ্ত হয়েছে, পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। তাকে অব্যাহত রাখার আর কোন কারণ অবশিষ্ট নেই। নবীরূপে এখন আর কাউকে প্রেরণ করা হবে না। আমার নবুওয়াত সূর্যাস্ত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। অর্থাৎ পার্থিব দিবসের সমাপ্তি ও কেয়ামতের সূর্যোদয় পর্যন্ত।

এরপর পুনরায় পৃথিবী সৃষ্টি করা বা না করা কিংবা সকলকে জান্নাতে রেখে দেয়া– সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছাধীন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এ পৃথিবী থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমিই সূর্যরূপে থাকব, আমার জ্যোতিই যথেষ্ট। আমার পরে বড় বড় লোকের আগমন ঘটবে। কিন্তু আমার আলোতেই তাদেরকে পথ চলতে হবে।

পরবর্তী সময়ে নবী-নূরের প্রকাশ পদ্ধতি

পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণের পথ চলার পাথেয় হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতের নূর, ফুকাহায়ে কেরাম তথা আবু হানীফা (রহ.), মালিক (রহ.) কিংবা শাফেঈ (রহ.)-এর ভেতরও ঐ একই নূরের প্রকাশ। তাঁদের নিজস্ব কোন নূর নেই। সুফী সাধকগণ যেমন জুনায়েদ, শিবলী কিংবা বায়েজীদ বোস্তামী এরূপ আরো বহু আগত অনাগত আল্লাহর ওলীদের মাঝে তাঁরই নূরের বিচ্ছুরণ, তাঁদের নিজস্ব সত্তার কোন নূর নেই। কোন কোন সম্প্রদায় হতে তাঁর ইলম-এর নূর, কোন কোন সম্প্রদায় হতে তাঁর আখলাক-এর নূর আবার কোন কোন সম্প্রদায় হতে তাঁর মুজাহাদা ও দুনিয়াবিমুখতার নূর প্রকাশ পেয়েছে এবং পাবে। আর কেয়ামত পর্যন্ত এককভাবে তাঁর নবুওয়াতই যথেষ্ট হবে। তাঁর নূর প্রকাশের আয়না একের পর এক আসতে থাকবে এবং পৃথিবীবাসীকে আলোকিত করে রাখবে। নবুওয়াতের সকল স্তরের সমাপ্তি তাঁর উপর হয়েছে বলে নবুওয়াতের আবশ্যকতা নেই। সুতরাং এখানে 'খতমে নবুওয়াত' দ্বারা নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য নেয়া দুনিয়াকে ধোকা দেয়া। 'খতমে নবুওয়াত'-এর উদ্দেশ্য হল নবুওয়াতের পূর্ণতা প্রাপ্তি এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা যথেষ্ট হওয়া। নবুওয়াত বন্ধ হয়ে গেছে, দুনিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। ইলম-আখলাকের কিছুই অবশিষ্ট নেই– খতমে নবুওয়াতের এ অর্থ করে ধোকায় পড়া যাবে না। খতমে নবুওয়াতের মাধ্যমে নবুওয়াতের ধারাবাহিকতার সমাপ্ত টেনে তাকে পূর্ণতা প্রদান করা হয়েছে। এখন যতই মুজাদ্দিদ, মুহাদ্দিস, ইমাম, সালেহীন, শুহাদা ও মুজাহিদীনের আগমন ঘটবে সকলের মধ্যেই ঐ একই নূরের আভা বিচ্ছুরিত হবে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন এমনই এক বরকতময় সত্তা যাঁর নূর ও বরকতের মাধ্যমে পূর্ববর্তীগণের জন্য মিলেছে নবুওয়াত এবং পরবর্তীগণের জন্য মিলেছে বেলায়াত। অর্থাৎ তাঁর নূরের ছোঁয়ায় পূর্ববর্তীগণ নবী হয়েছেন আর পরবর্তীগণ ওলী হয়েছেন। সুতরাং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত এমনই এক কল্যাণময় সত্তা যাঁর নূর থেকে পূর্ববর্তী নবীগণ উপকৃত ও আলোকিত হয়েছেন এবং পরবর্তী ওলী, মুজাদ্দিদ ও মুহাদ্দিসগণ যাঁর পূর্ণতা থেকে সৃষ্ট হয়েছেন।

চাঁদ এবং অন্যান্য গ্রহসমূহ যেমনিভাবে সূর্যের আলোয় আলোকিত, তাদের নিজস্ব আলো নেই। সূর্য হতে বিচ্ছুরিত আলো এসে তাদের গায়ে পড়ে বিধায় তারা আলোকিত হয়ে ওঠে– তেমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম ও আল্লাহর ওলীগণ আয়নার মত। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নূরই তাঁদের থেকে বিচ্ছুরিত হয়।

নবুওয়াতের পূর্ণতার প্রমাণ

নবুওয়াতের ভিত্তি হল দুইটি। প্রথমত ইলম-এর পূর্ণতা, দ্বিতীয়ত আখলাক-এর পূর্ণতা। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইলম বা জ্ঞানও ছিল সর্বোন্নত এবং আখলাক বা চরিত্রও ছিল সর্বোন্নত। ইলম-এর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اوتيت علم الأولين والأخرين

অর্থাৎ পূর্বাপরের সকল ইলম আমাকে দান করা হয়েছে, আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যাকে পবিত্র কুরআনে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে–

وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا

> হে নবী! আমি আপনাকে ঐ সমস্ত বিষয়ের তালিম দিয়েছি যা আপনি প্রথমে অবগত ছিলেন না এবং আপনার উপর রয়েছে আল্লাহর মহান অনুগ্রহ। [নিসা : ১১৩]

আখলাক-এর ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ করেন–

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

> আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী। খুলুকে আজিম হল আখলাক-এর সর্বোচ্চ মর্যাদার স্তর যা তাঁকে দান করা হয়েছে। [কলম : ৪]

সুতরাং যেহেতু ইলম ও আখলাক-এর সর্বোচ্চ স্তর তাঁকে দান করা হয়েছে এবং এ দুটোই নবুওয়াতের ভিত্তি সেহেতু নবুওয়াতের সর্বোচ্চ স্তরটিও তাঁরই অধীন। তিনি খাতামুন নাবিয়্যিন। সুতরাং খতমে নবুওয়াতের ভেতরেই তাঁর সীরাত নিহিত।

সীরাতের প্রথম স্তর ইসমত ও মাসুমিয়্যাত, অতঃপর আখলাক, অতঃপর আমাল, অতঃপর আহওয়ালি। এ পর্যন্ত আমি ইসমত ও আখলাকের উপর কিছু আলোকপাত করেছি। আমাল ও আহওয়াল-এর অধ্যায়সমূহ অতি দীর্ঘ। তার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। এ জন্যই সীরাত আলোচনার সমাপ্তি এখানেই টানছি। পূর্ণ সীরাতের আলোচনা তো কারও পক্ষেই সম্ভব না। কেননা হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আখলাক সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেছিলেন– কুরআনই হল তাঁর আখলাক, তাঁর চরিত্র যার জানতে ইচ্ছে করে সে যেন কুরআন দেখে। আর কুরআনের রহস্য উদঘাটন কেয়ামত পর্যন্ত শেষ হবে না। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সীরাতের রহস্য কিভাবে শেষ হবে? কেয়ামত পর্যন্ত লাখো বর্ণনাকারী বর্ণনা করে যাবে, তবু সীরাতের বর্ণনা পূর্ণাঙ্গ হবে না।

সীরাত আলোচনার পরিসমাপ্তি

সীরাত বিষয়ক আলোচনার এখানেই আমি সমাপ্তি টানতে চাচ্ছি। প্রথমে আমি কুরআনের যে আয়াত তেলাওয়াত করেছিলাম আয়াতের অর্থ ব্যাখ্যা করে আলোচনা শেষ করব। আমি পড়েছিলাম–

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের মধ্যকার কোন পুরুষের পিতা নন। [আহযাব : ৪০]

অর্থাৎ ঔরসজাত সম্পর্কের পিতা নন কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল। অর্থাৎ তিনি হলেন আত্মিক সম্পর্কের পিতা। যেমন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে ইরশাদ করেন–

انا لكم منزلة والد

আমি তোমাদের পিতাস্বরূপ।

অর্থাৎ রূহানী পিতা। সন্তান যেমন মা-বাবার কাছ থেকে তারবিয়াত (শিষ্টাচারের শিক্ষা) লাভ করে রূহানী সন্তান তদ্রূপ রূহানী বাবা-মার কাছ থেকে তারবিয়াত লাভ করে। তাই তিনি ঘোষণা করেছেন, আমি তোমাদের রূহানী পিতা এবং সমগ্র জগত আমার তারবিয়াতের অধীন। সাথে সাথে এও বলেছেন, রূহানী পিতা হোক বা ঔরসজাত হোক, একজনই হয়ে থাকে। দু'জন করে পিতা কারও থাকে না। সুতরাং যেহেতু আমি রূহানী পিতা তাই আমিও একজনই। আমার পরে আর কোন পিতার আগমন ঘটবে না। আমার পিতৃত্ব এতই পূর্ণাঙ্গ যে, তারবিয়াতের জন্য এটাই যথেষ্ট।

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

আপনি আল্লাহর রাসূল এবং খাতামুন নাবিয়্যিন।

এখন আর নবুওয়াতের মাধ্যমে রূহানী পিতৃত্বের কোন দরজা আর বাকী নেই। নবুওয়াতের সমাপ্তি ঘটেছে। যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে ব্যক্ত করেছেন– নবুওয়াতকে একটি ভবন মনে কর, যার নির্মাণ চলছিল, আমিই সে ভবনের শেষ ইট। নবুওয়াত ভবনের পূর্ণতা আমার দ্বারা সাধিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি ও স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতের উপর চলার তাওফিক দান করুন এবং আমাদেরকে খাঁটি ও সরল মুসলমানরূপে কবুল করুন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

বয়ান : ২

নবুওয়াতের মর্যাদা এবং তার প্রভাব ও উদ্দেশ্য

সমগ্র আম্বিয়া (আ.)-এর ইলম প্রকৃতপক্ষে ইলমে মুহাম্মদীর খাজানা থেকেই আহরিত হয়েছে। মহান আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কল্যাণের মূল প্রতীক সাব্যস্ত করেছেন এবং তাঁরই ফয়েয হতে আম্বিয়া (আ.)-এর মধ্যে নবুওয়াতের ইলম এসেছে। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– 'অন্য নবীগণ তাঁদের উম্মতগণের নবী আর আমি হলাম নবীগণেরও নবী। আমি নবীগণের প্রতিও প্রেরিত হয়েছি।'





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ.

সম্মানিত সুধীবৃন্দ!

পৃথিবীর সকল জিনিস তার বিপরীত জিনিস দ্বারা চেনা যায়। বিপরীত জিনিসটি সামনে এলেই যেন মূল জিনিসটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বিপরীতমুখী জিনিসের সমন্বয়ে পৃথিবীকে নির্মাণ করেছেন। জগতের সব কিছুই বৈপরিত্বে ঠাসা। পৃথিবীর যে কোন মহান বিষয়ের একটি বিপরীত দিক অবশ্যই রয়েছে, যাতে ঐ মহান বিষয়টি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেতে পারে। চাই সে মহান বিষয়টি বস্তুগত বা অর্থগত হোক কিংবা আত্মিক হোক, বৈপরীত্যমুক্ত নয়। আলো আছে তো তার মোকাবেলায় অন্ধকারকে রাখা হয়েছে যাতে অন্ধকারের বিপরীতে লোকজন আলোকে ভাল করে উপলব্ধি করতে পারে। পৃথিবীতে আলো ঝলমলে দিন আছে তো তার বিপরীতে অন্ধকার রাত রয়েছে, যাতে রাতের বিপরীতে দিনের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য স্পষ্ট হয়ে যায়; ইসলাম আছে তো তার বিপরীতে কুফরীকে রাখা হয়েছে, যাতে তার সংঘর্ষে ইসলামের সৌন্দর্য ও শক্তি প্রকাশ হয়ে পড়ে। এক দিকে ইখলাস আছে তো তার বিপরীতে মুনাফেকীকে রাখা হয়েছে, যাতে মুনাফেকীর মোকাবেলায় ইখলাসের মাহাত্ম্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। তদ্রূপ সত্য আছে তো তার বিপরীতে রয়েছে মিথ্যা, যাতে করে মিথ্যার বিপরীতে সত্যের সৌন্দর্য প্রকাশ হতে থাকে। এভাবেই সবকিছু রয়েছে। ইলমের বিপরীতে মূর্খতা, আখলাকের বিপরীতে বদআখলাক। মোটকথা, সব কল্যাণ ও সৌন্দর্যের বিপরীতে অকল্যাণ ও কদর্যতার উপস্থিতি অবশ্যই রাখা হয়েছে।

বৈপরীত্যশীলতার জগতে বস্তুর বৈপরীত্যের হেকমত

এই বৈপরীত্য এ কারণেই যে, যখন ভালমন্দের মোকাবেলা হবে তখন ভালর শক্তি প্রকাশ হয়ে পড়বে। বিপরীত বিষয়ের মুখোমুখি অবস্থান ব্যতীত কোন ভাল বিষয়ের সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় না। অজ্ঞতার সাথে সংঘর্ষ ব্যতীত জ্ঞানের গভীর সৌন্দর্য প্রকাশিত হতে পারে না। জ্ঞানের বিপরীতে যদি আপত্তি ও প্রশ্ন উত্থাপিত না হয় তবে অজ্ঞতাই স্থির হয়ে যায়, জ্ঞানের মাহাত্ম্য অপ্রকাশিতই থেকে যায়। এজন্যই কখনো আপত্তির আকৃতিতে, কখনো সন্দেহের আকৃতিতে আবার কখনো অপবাদের

আকৃতিতে জ্ঞানের সাথে অজ্ঞতার সংঘর্ষ ঘটানো হয়। এর দ্বারা উত্তরদাতার উত্তরের মাধ্যমে জ্ঞানের অপ্রকাশ্য ভেদ প্রকাশ পেয়ে যায়। এজন্যই পবিত্র কুরআন শরীফে বলা হয়েছে–

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ط وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ

আমি হককে বাতিলের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেই যাতে বাতিলের সংঘর্ষে সত্যের অপ্রকাশ্য শক্তি প্রকাশ পায়।
[আম্বিয়া : ১৮]

সুতরাং পৃথিবীতে বিপরীতমুখী জিনিসও রয়েছে এবং তাদের মধ্যে সংঘাতও রয়েছে। সংঘাত ব্যতিরেকে ভালর সৌন্দর্য প্রকাশ পায় না। যেমন- দু'জন দক্ষ পাহলোয়ানের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত কুস্তি না লাগবে ততক্ষণ পর্যন্ত একজনের বিশেষ মারপ্যাঁচ ও কৌশল প্রকাশ পাবে না, গোপন থাকবে। এজন্যই পাহলোয়ানকে পাহলোয়ানের সাথে কুস্তি লাগিয়ে দিলেই এ বিষয়ে গোপন শক্তি প্রকাশ হয়ে যাবে।

অন্ধকারে আলোর দিশা

এ পৃথিবীর সর্বকালের সবচেয়ে অন্ধকার যুগে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন ঘটেছে। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বযুগ ছিল পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। এমন কোন অন্যায় ও খারাবী পৃথিবীতে নেই যা সেই জাহেলী যুগে ছিল না। মূর্খতা, দুশ্চরিত্রতা, দুষ্কর্ম, বদআকিদা প্রত্যেক অন্যায় স্বতন্ত্রভাবে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ছিল। মোট কথা, অন্যায় যত প্রকারের হওয়া সম্ভব তার সবকিছুই একই সময়ের মধ্যে একত্র হয়ে গিয়েছিল। সে সময়টাই ছিল কুরআনের বাণী ظُلُمٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ এর পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ অন্ধকারের উপর অন্ধকার, ধারাবাহিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছিল। এজন্য হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

ان الله نظر الى قلوب بنى ادم فمقت عربهم وعجمهم

আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তরের দিকে দৃষ্টি দিলেন। তিনি রাগান্বিত দৃষ্টিতে আরব ও অনারবদেরকে দেখলেন।

অর্থাৎ কোথাও ভাল কিছু অবশিষ্ট ছিল না। সর্বত্র অন্ধকার আর অন্ধকার ছিল। সর্বত্র অন্যায় আর খারাবীর সয়লাব ছিল।

الا غبر اهل الكتب

পাহাড়ের মাটি ও গুহায় অবস্থানরত কিছু হকপন্থী ব্যতীত।

জনপদে তাদের অবস্থানের অবকাশ ছিল না।

হকপন্থীদের একেবারে বিলীন হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা পৃথিবীতে কখনোই আসেনি। হকের উপরেই এ পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং হক একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। এজন্যই এমন কোন যুগ পৃথিবীতে আসেনি যে, হক সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। হতে পারে হক অপ্রকাশ্য হয়ে পড়েছে। পরাজিত হয়ে গেছে। সংখ্যায় কম হয়ে গিয়েছে কিন্তু অস্তিত্বমান ছিল। সেই অন্ধকার যুগেও হকপন্থী কিছু আহলে কিতাব জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় পাহাড়ের গুহায় বা মাটিতে ছিল যারা দীনকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তারা ছিল বলেই পৃথিবীও ছিল। এতটুকু হকও যদি না থাকত তবে এ পৃথিবী ধ্বংস করে দেয়া হত।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে বলেছেন–

لا تقوم الساعة حتى يقال فى الأرض الله الله

যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ বলার মত একজন লোকও পৃথিবীতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া ধ্বংস হবে না।

যখন একজনও থাকবে না তখন কেয়ামত কায়েম করা হবে। সুতরাং কেয়ামত হল পৃথিবীর মৃত্যুর নাম। জীবনের সামান্য স্পন্দন যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মৃত্যু হবে না। আর এ বিশ্বজগতের জীবন হল আল্লাহর যিকির ও তাঁর নাম। সুতরাং আল্লাহ বলার মত একজন লোক থাকলেও এ পৃথিবী ধ্বংস হবে না। যখন একজনও থাকবে না তখন পৃথিবীর মৃত্যু হবে। এজন্যই আদম (আ.) থেকে শুরু করে কেয়ামত

সংঘটিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এমন কোন সময় আসেনি বা আসবে না যখন আল্লাহর নাম নেয়ার মত কেউ ছিল না বা থাকবে না। যখন দুনিয়াকে শেষ করা হবে তখন পৃথিবী থেকে আল্লাহর নাম নিশানা মুছে যাবে এবং শুধুই বাতিল আর বাতিল থাকবে।

সেই জাহেলী যুগে যখন বাতিল চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল তখনও আহলে কিতাবের মধ্য থেকে নির্ধারিত কিছু আহলে হক জনবসতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাহাড়ে গিয়ে অবস্থান করছিলেন। তাঁরা আল্লাহর নাম নিত বলে পৃথিবী টিকে ছিল। তবে ব্যাপক মানুষ অন্ধকারাচ্ছন্নতায় তলিয়ে ছিল। আল্লাহ যখন রাগান্বিত অবস্থায় তাদের অবস্থা অবলোকন করলেন তখন তাঁর প্রভুত্বে আলোড়ন জাগল– এই অন্ধকারকে আলোয় ভরে দেয়া হবে। সুতরাং ফারাত পর্বতের হেরা গুহা হতে জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে তাশরিফ আনলেন যে, তাঁর এক হাতে সূর্য ও অন্য হাতে চাঁদ। দুটি উজ্জ্বল জিনিস তাঁর কাছে ছিল। একটি জ্যোতির্ময় সূর্য, একটি দ্যুতিময় চাঁদ। কেননা সে অন্ধকার দূর করার জন্য দুই ধরনের আলোর প্রয়োজন ছিল। দ্বিগুণ আলোর আবশ্যকতা ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত সে আলোকবর্তিকা আকাশের চন্দ্র-সূর্যের চেয়ে বহুগুণে জ্যোতির্ময়, যার কোন তুলনাই চলে না।

আরব জাতির মাঝে রাসূল (সা.)-এর দাওয়াতের প্রভাব

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সত্যপথের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন তখন সমগ্র আরব জাতি তাঁর শত্রুতে পরিণত হল। তারা সকলে একত্রিত হয়ে আবু তালেবকে মাধ্যম সাব্যস্ত করে বলল, 'আল্লাহর দিকে তাকিয়ে আপনি আপনার ভাতিজাকে বলে দিন, তাঁর যা ইচ্ছা আমাদের থেকে নিয়ে নিক কিন্তু সে যেন আমাদের প্রতিমাদের নিন্দা না করে, আমাদের ধর্মকে উপহাস না করে। এছাড়া তাঁর সকল চাহিদা পূরণ করতে আমরা প্রস্তুত। আপনি আপনার ভাতিজাকে বুঝান। যদি তা না হয় তবে এরপর তার ব্যাপারে আমাদের কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না।'

আবু তালেব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'আরব জাতি আমাকে তাদের প্রতিনিধি করে তোমার কাছে

পাঠিয়েছে। তারা বলেছে, তোমার নবুওয়াতের দাবী ও নতুন ধর্মের দাওয়াতের উদ্দেশ্য যদি অর্থ উপার্জন হয়, তাহলে তোমার জাতি তার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। এলাকার সকল স্বর্ণ এনে তোমাকে দেয়া হবে। যদি সৌন্দর্য-পিয়াসী হয়ে থাক তবে কুরাইশ দুলালীগণ উপস্থিত রয়েছে, যাকে ইচ্ছে গ্রহণ কর। যদি নেতৃত্বের উদ্দেশ্য থেকে থাকে তবে তার জন্যও আমরা প্রস্তুত। তোমাকে আমরা সমগ্র আরবের বাদশাহ বলে মেনে নেব এবং প্রজারূপে তোমার কাছে আসব। তোমার যা ইচ্ছা কর কিন্তু আমাদের নির্মিত উপাস্যদের কিছু বলো না; আমাদের পৈতৃক ধর্মের ব্যাপারে খারাপ কিছু উচ্চারণ করো না।'

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– চাচাজান! আপনার বক্তব্য কি শেষ হয়েছে? জাতির বার্তা কি শোনানো হয়েছে?

আবু তালেব বললেন– হ্যাঁ, শোনানো হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– আমার পক্ষ হতে বলে দিন, আমার জাতি যদি আমার এক হাতে সূর্য ও অন্য হাতে চাঁদ এনে দেয় তবু আমি আমার মুখ থেকে নির্গত কালিমার দাওয়াত থেকে বিরত হব না। হয়তো পৃথিবীতে এ কালিমা ছড়িয়ে দিতে থাকব নয়তো নিজের জীবন দিয়ে দেব।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত কালিমার তুলনায় আকাশের চাঁদ সূর্য তথা দুনিয়ার যাবতীয় কিছু তাঁর কাছে সম্পূর্ণ মূল্যহীন ছিল। তাঁর হাতে ছিল অন্য এক চাঁদ-সূর্য। তা হল 'তাওহিদ ও রেসালাতের বর্ণনা।' পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাব এভাবে হয়েছে যে, তাঁর ডান হাতে ছিল আল্লাহর জ্যোতির্ময় কিতাব, যা সূর্য হতে অধিকতর আলোকময় আর তাঁর বাম দিকে ছিল 'মুহাম্মদী আত্মা', যা পূর্ণ ছিল চারিত্রিক নূরে। সুতরাং তার এক দিকে আল্লাহর ইলমে পূর্ণ জ্যোতির্ময় কুরআন ছিল আর অন্য দিকে নবীর কলবে রক্ষিত মুহাম্মদী আখলাকের দ্যুতি ছিল। তাই আমরা বলতে পারি, সূর্য ও চাঁদের মত দুটি আলোময় জিনিস নিয়েই তাঁর আবির্ভাব। একটি হল উজ্জ্বল ইলম, যার আধার ছিল পবিত্র কুরআন অন্যটি হল উজ্জ্বল চরিত্র, যার আধার ছিল রাসূলের কলব।

নবুওয়াতের ভিত্তি

আল্লাহর ইলম-এর জ্যোতির্ময় সূর্য থেকে আহরিত আলোতে উজ্জ্বল ছিল হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাঁদতুল্য আত্মা। জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করেন যে চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই। বরং সূর্যের আলোয় সে আলোকিত হয়। সূর্যের আলো যখন চাঁদের উপর দিয়ে প্রতিফলিত হয় তখন তা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। চাঁদের স্নিগ্ধ আলোই কিন্তু সূর্যের সেই তেজদীপ্ত আলো ছিল। স্থান ও ক্ষেত্রের বিশেষত্বের কারণে তার মধ্যে কোমলতা ও স্নিগ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। আগুনকে যদি বিশেষ কোন পাত্র ও ক্ষেত্র দিয়ে পরিচালিত করা হয় তবে তাতে শীতলতার প্রভাব সৃষ্টি হয়। যেমন বিদ্যুৎ। আপনি যদি তাকে কোন মেশিনের সাথে সংযোগ করেন তবে তা আগুন। যেমন- হিটার, কয়েল প্রভৃতি। তাতে তেজ আছে, দহন ক্ষমতা আছে। হাত দিলে আপনার হাতকে ধরবে, জ্বালিয়ে দেবে। কিন্তু এই বিদ্যুৎই যদি আপনি রেফ্রিজারেটর দিয়ে পরিচালিত করেন তবে তা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ফল রাখেন, খাবার রাখেন– ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। একই জিনিস ক্ষেত্র বিশেষ আগুন হয়ে যায়, সহ্য করার যোগ্য থাকে না আবার সেই জিনিসই অন্যত্র রাখা হলে তা হয় সহনশীল। সুতরাং আল্লাহর জ্যোতির্ময় কিতাব, তাঁর ইলম এতই উন্নত ও তেজস্বী ছিল যে, কোন সৃষ্টির পক্ষে তা সহ্য করার মত ছিল না। ঐ ইলমে এলাহীকে যখন নববী আত্মা দিয়ে পরিচালিত করা হল তখন তাতে সহনশীলতার দ্যুতি সৃষ্টি হল, তাতে শীতলতা ও কোমলতা এল এবং গ্রহণযোগ্য হয়ে গেল। সুতরাং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে এভাবে আগমন করলেন যে, তাঁর এক হাতে সূর্য ছিল অর্থাৎ নবুওয়াতের আখলাক তাতে পূর্ণ ছিল। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি জিনিস নিয়ে আগমন করেছেন। একটি হল ইলম এবং আরেকটি হল আখলাক। আপনি গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখবেন, দুটি জিনিসের উপরই নবুওয়াতের ভিত্তি। একটি হল ইলমের পূর্ণতা আরেকটি হল আমলের পূর্ণতা। এগুলো হল এমন দুটি বিষয় যা সমগ্র সৃষ্টির জন্য সৌভাগ্যশীলতা। যদি ইলম না থাকে তবে আলো থাকে না। পথ চেনা যায় না এবং মঞ্জিলে মাকসুদ তথা উদ্দিষ্ট লক্ষে পৌঁছা যায় না। আর যদি আখলাক না থাকে তবে পথ চলার শক্তি সৃষ্টি হতে পারে না। আখলাক শক্তি-সামর্থের যোগান দেয় আর ইলম পথ প্রদর্শন করে। তাই আলেমের ইলম তাকে পথ চলাতে পারে না। শুধু

পথ দেখানোই ইলমের কাজ। চলার জন্য মানুষের শক্তি-সামর্থের প্রয়োজন। এই উভয় বিষয়ের যখন সন্নিবেশ ঘটে তখনই কেবল মানুষ লক্ষ্যে পৌছতে পারে। সুতরাং তার জন্য ইলমেরও আবশ্যকতা রয়েছে এবং আমলেরও আবশ্যকতা রয়েছে। তাই নবুওয়াতের ভিত্তি হল দুটি জিনিস। ইলমের পূর্ণতা ও আখলাক তথা চরিত্রের পূর্ণতা।

পার্থিব সৌভাগ্যের ভিত্তি হল ইলম ও আমলের পূর্ণতা

পবিত্র কুরআন শরীফে ইলম ও আমলের পূর্ণতার নিরিখে চার প্রকারের ব্যক্তিদের সৌভাগ্যশীলতার কথা বর্ণিত হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে–

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيْقًا.

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে তারা কাদের সাথে থাকবে? তারা নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহীনদের সাথে থাকবে। [নিসা : ৬৯]

এখানে চারটি প্রকার বর্ণিত হয়েছে। নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহ। গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, এই চার প্রকার ইলম ও আমলের দৃষ্টিকোণ থেকে মূলত দুই প্রকার। অর্থাৎ নবী ও সিদ্দিক হলেন ইলমের দুটি প্রকার এবং শহীদ ও সালেহ হলেন আমলের দুটি প্রকার।

ইলম প্রথমে নবীর উপর আগমন করে বলে তিনি হলেন মূল আর তাঁকে সত্যায়নকারী হলেন সিদ্দিক, যিনি ঐ মূলের অনুগামী। নবী শব্দটি এসেছে نباء থেকে, যার অর্থ সংবাদ দেয়া আর সিদ্দিকের অর্থ হল ঐ সংবাদের সত্যায়নকারী। সুতরাং সত্যায়ন করাও ইলমেরই একটি প্রকার। মূল কথা এই দাঁড়ালো যে, নবী ও সিদ্দিক– এই উভয়টি ইলম-এর দুটি প্রকার। পার্থক্য এতটুকু যে ইলমের ক্ষেত্রে নবী মূল এবং সিদ্দিক তার অনুগামী। এমনিভাবে আমলেরও দুটি অংশ। একটি শহীদ আরেকটি সালেহ। আমলের দিক থেকে শহীদ হল মূল এবং সালেহ হল তার অনুগামী। শহীদ

হলেন যিনি আল্লাহর রাস্তায় নিজের প্রবৃত্তিকেই শুধু নয়, জীবনও বিসর্জন দিয়েছেন। আর সালেহ হলেন তিনি যিনি নেকীর পথ গ্রহণ করে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদাকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সুতরাং শহীদ যদি জীবন দিয়ে পৃথিবীতে চলার পথকে মসৃণ না করতেন তবে সালেহ 'সালেহ' হতে পারতেন না। সালেহ নিজের সালাহিয়্যাতের পথে তখনই চলতে পারবেন যখন পৃথিবী নিরাপদ ও ফেতনামুক্ত থাকবে। পৃথিবী যদি ফেতনায় পূর্ণ থাকে তবে নামাযীর নামাযের হুশ থাকে না। তেলাওয়াতকারীর তেলাওয়াতের হুশ থাকবে না, দরূদ পাঠকারীর দরূদের হুশ থাকবে না। শহীদ নিজের জীবন দিয়ে পৃথিবীকে সাফ করেন যাতে সালেহ তার সালাহিয়্যাতের পথে চলতে পারে। এজন্যই আমলের উচ্চতর স্তর শহীদের এবং সালেহ তার অনুগামী।

সুতরাং ইলমের দুটি অংশ এবং আমলের দুটি অংশ। নবী ও সিদ্দিক ইলমের অংশ। যার একজন মূল ও একজন অনুগামী এবং শহীদ ও সালেহ আমলের অংশ। একজন মূল ও একজন তার অনুগামী। সুতরাং বোঝা গেল যে, দুনিয়ায় সৌভাগ্যের ভিত্তি দুটি– একটি ইলম ও একটি আমল। নবুওয়াতের ভিত্তিও প্রকৃতপক্ষে এই দুটি জিনিস। নবীগণ এক ইলমের পূর্ণতা নিয়ে আগমন করেন আরেক আমলের পূর্ণতা নিয়ে আগমন করেন, যাকে আখলাক বলা হয়। আখলাক হল আমলের ভিত্তি।

আমলের ভিত্তি হল আখলাক

আমলের ভিত্তি হল আখলাক। আখলাক না থাকলে আমল কার্যকর হতে পারে না। আপনার মধ্যে যদি সাহসিকতা ও বীরত্বের আখলাক থাকে তবে যুদ্ধ ও হামলার কাজ আপনার দ্বারা প্রকাশ পাবে। যদি আপনার মধ্যে দানশীলতার চরিত্র থাকে তবেই গরীবদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া আপনার থেকে প্রকাশ পাবে। যদি কৃপণতার স্বভাব থাকে তবে আপনিও দিবেন না। যদি ভীরুতার স্বভাব থাকে তবে যুদ্ধ হতে পিছপা হবেন। সুতরাং অভ্যন্তরীণ শক্তি বাহ্যিক কাজকে পরিচালিত করে। এই অভ্যন্তরীণ শক্তিকেই আখলাক বলা হয়। সুতরাং ব্যক্তির থেকে তার আখলাকের অনুরূপ কাজ প্রকাশ পাবে। আমলের প্রকৃত শক্তি মূলত আখলাক। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত পথ দৃষ্টিগোচর না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আখলাক তার কাজ

করতে পারে না। আর পথ প্রদর্শন করে থাকে ইলম। সুতরাং পূর্ণ সাফল্যের ভিত্তি দুইটি। একটি ইলম আরেকটি আখলাক। ইলম পথ দেখাবে এবং আখলাক সে পথে পরিচালিত করবে। আখলাকী শক্তি ব্যক্তিকে সে পথে তাড়িত করবে।

উক্ত বিষয়টির হুবহু দৃষ্টান্ত হল রেলগাড়ি। আপনি দেখে থাকবেন যে, হাজার লক্ষ মণ বোঝার লোহার গাড়িকে নিজের সাথে বেঁধে নিয়ে ইঞ্জিন ছুটছে। ইঞ্জিনের এই চলা এবং গন্তব্যে পৌঁছার জন্য শর্ত কি? প্রথমত শর্ত হল যে, ইঞ্জিন চলার উপযোগী লোহার লাইন বসানো আছে। দ্বিতীয় শর্ত হল তার ভেতরে স্টিমের শক্তি ভরা আছে। আগুন ও পানিকে একত্র করে বাষ্পীয় ক্ষমতা তার মধ্যে সৃষ্টি করা হয়। সুতরাং যদি লাইন বসানো না থাকে তাহলেও ইঞ্জিন চলতে পারে না। আবার লাইন বসানো সত্ত্বেও যদি তাতে স্টিমের শক্তি না থাকে তাহলেও চলতে পারে না। লাইনে ইঞ্জিন দাঁড়ানো আছে অথচ ভেতরে না আছে আগুন না আছে পানি এবং বাষ্পীয় শক্তিও তৈরি হচ্ছে না। এ অবস্থায় আপনি ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে তাকে কতদূর চালাতে পারবেন? হাজারো লোক মিলে চেষ্টা করলে হয়ত বিঘাত পরিমাণ যাবে কিন্তু আবারো দাঁড়িয়ে পড়বে। যতক্ষণ পর্যন্ত ইঞ্জিনের মধ্যে শক্তি না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে পারবে না। আবার ইঞ্জিনের শক্তি আছে কিন্তু লাইন বিছানো নেই, সে ক্ষেত্রেও যত জোরেই চলুক না কেন মাটিতে আছড়ে পড়বে, কখনোই গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না। সুতরাং গন্তব্যে পৌঁছার জন্য দুটি শর্ত– লাইন বিছানো থাকতে হবে এবং সে লাইনে চলার শক্তিও থাকতে হবে। তবেই চলবে। আর চলবে তো সে এমনভাবে চলবে যে, হাজার মণ লোহা, হাজার মণ বোঝা তার সাথে আপনি জুড়ে দেবেন, সবগুলোকে নিয়ে উদ্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেবে।

শরীয়ত ও তরিকতের অপরূপ সমন্বয়

মনে করুন, ঠিক উপর্যুক্ত উদাহরণের মতই প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন ইঞ্জিন। তার মধ্যেও দুটি জিনিসের প্রয়োজন রয়েছে। প্রথমত চলার জন্য তার সামনে উন্মুক্ত সরল পথ থাকতে হবে যাতে গন্তব্য দৃষ্টির সম্মুখে থাকে। দ্বিতীয়ত তার ভেতরে চলার শক্তি থাকতে হবে। গন্তব্যে পৌঁছার সেই

সরল পথেরই নাম হল 'সীরাতুম মুস্‌তাকিম'। পবিত্র কুরআনের ভাষায়–

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ

নিশ্চয়ই এটা আমার সরল পথ, তোমরা এর অনুসরণ কর।

মানুষের এই চলার পথেরই নাম শরীয়ত। দৃষ্টির সম্মুখে রাস্তা থাকা সত্ত্বেও ভেতরে চলার শক্তি না থাকলে মানুষ চলতে পারে না। অভ্যন্তরীণ এই শক্তি হল আখলাকের শক্তি। তরিকত মানুষের ভেতরে এ শক্তি তৈরি করে। সাধনা ও মুজাহাদার মাধ্যমে মুসলমানের অন্তরে রাসূলপ্রেমের আগুন সৃষ্টি হয়। সেই আগুন ও স্টিম তাকে ঐ রাস্তার উপর পরিচালিত করে। যদি চলার মত রাস্তা না থাকে কিংবা ভেতরে রাসূলপ্রেম বা আল্লাহপ্রেম না থাকে তবে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। মোট কথা, শরীয়তের ইলম পথ প্রদর্শন করে এবং তরীকতের সাধনা চলার শক্তি তৈরি করে। যদি উভয়ের সমন্বয় কারো মধ্যে ঘটে তবে এমন ব্যক্তি শুধু নিজেই চলে না; বরং হাজারো বক্তিকে তার সাথে জুড়ে দিলে রেলগাড়ির মতই সে সকলকে নিয়ে মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছে দেবে।

উক্ত বিষয়টি অন্য শব্দে এভাবে বুঝুন, মানুষের জন্য মাদরাসারও প্রয়োজন রয়েছে, খানকারও প্রয়োজন রয়েছে। যদি মাদরাসা না থাকে, তালিম না থাকে তবে ইলম সামনে আসতে পারে না। পথ স্পষ্ট হয় না আর যদি খানকা না থাকে এবং আখলাক শুদ্ধ না হয় তবে পথ চলার শক্তি তৈরি হতে পারে না। সুতরাং মাদরাসা ও খানকা এই উভয়ের সমন্বয়ে মানুষ মঞ্জিলে মাকসুদে পৌঁছে।

আলেমগণ ও সুফীগণের মধ্যে সংঘর্ষ কেন

আমি তো প্রায়ই বলে থাকি যে, আজকাল আলেম ও সুফী সাধকদের মধ্যে যে সংঘাত দেখা যায় পূর্ব যুগের সংঘাত এমন ছিল না। প্রকৃত অর্থেই যদি কেউ আলেম হয়ে থাকেন তবে সুফীগণের কদর তার চেয়ে বেশি কেউ বুঝবে না। তদ্রূপ কেউ যদি সত্যিকারের দরবেশ ও সুফী হয় তবে আলেমের কদরও তার চেয়ে বেশি কেউ বুঝবে না। কিন্তু ইলমও যদি অসম্পূর্ণ হয় এবং ইশকও যদি অসম্পূর্ণ হবে তবে সংঘাত অনিবার্য। পরবর্তী যুগের আলেম ও সুফীদের মধ্যেই যত সংঘাত দেখা যায়,

পূর্বযুগের কামেল ওলী ও আলেমদের মধ্যে কোন লড়াইয়ের সৃষ্টি হয়নি।

আপনারা জানেন যে, দিল্লীর সুলতানুল মাশায়েখ খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রহ.) কত বড় আলেম ও দরবেশ ছিলেন। চিশতিয়া তরিকার সুফীগণের মধ্যে তাঁর অবস্থান অতি উচ্চে। একটি অতি উজ্জ্বল আলোকিত আত্মা আল্লাহ তাঁকে দান করেছিলেন। অতি উঁচু মাপের সত্তার অধিকারী ছিলেন হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.)। সে যুগে যখন খাজা সাহেবের ফয়েয ও বরকতে পৃথিবী সমৃদ্ধ হচ্ছিল, আখলাকী সম্পদে পূর্ণ হচ্ছিল তখন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাঁর দরবারে হাকিম জিয়াউদ্দিন সানামী (রহ.)কে নিযুক্ত করা হয়েছিল। শরীয়ত পরিপন্থী বা বদ আখলাকী কোন কাজ হয় কি না তা দেখার দায়িত্ব ছিল তার। কাউকে বিদআতে রত দেখলে বা শরীয়ত পরিপন্থী কোন কাজে লিপ্ত থাকতে দেখলে সাথে সাথে গ্রেফতার করতেন। রাষ্ট্রের পক্ষ হতে বিচার করা হত, শাস্তি দেয়া হত।

খাজা নিজামুদ্দিনের ধর্ম-সঙ্গীতের আসর ও হাকিম জিয়াউদ্দিনের প্রতিবাদ

একবার হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রহ.) তাঁর তরিকতের বন্ধুদের নিয়ে দরবারে বসেছিলেন। দরবারে তখন ধর্ম-সঙ্গীত চলছিল। সঙ্গীতের পদ্ধতি এই ছিল যে, তাতে কোন বাদ্য বাজনা থাকত না। প্রকৃত ওলীর দরবারে বাঁশি ও বাদ্যযন্ত্র থাকে না। সঙ্গীত বলতে মধুর আওয়াজে কোন নাত কিংবা গযল বলা। এর দ্বারা আল্লাহপ্রেমে মগ্নদের কলবের জড়তা খুলে যায়, মারেফাতের স্তর উন্নত হয়। তো কোন একজন সঙ্গীত পরিবেশন করছিলেন আর সবাই ভাবাবেশে মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। কেননা এসব সঙ্গীত সুফীগণ জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য শোনেন না; সাধনা ও মোরাকাবার সময় যখন তারা প্রচণ্ড চাপ ও দুর্বিষহ অস্থিরতা অনুভব করেন তখন তার চিকিৎসারূপে শুনে থাকেন। এটা তাদের জন্য এক প্রকারের ওষুধ, কোন খাবার নয় যে রাত দিন তাঁরা এগুলোই আহার করতে থাকবেন। নিতান্তই ওষুধস্বরূপ সুফী সাধকদের দরবারে এসব ধর্ম-সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। যাই হোক, নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রহ.)-এর দরবারে তরিকতের বন্ধুগণ একত্রিত হয়ে জায়েয পর্যায়ের সঙ্গীত শ্রবণ করছিলেন, যাতে কোন বাদ্য বাজনা বা বাঁশির আওয়াজ ছিল না। কিন্তু বাহ্যিকভাবে

তাকে শরীয়ত পরিপন্থী সমাবেশ বলে মনে হচ্ছিল। অথবা এমন ছিল যে, তাদের এই বিশেষ ব্যক্তিবর্গের আসর দেখে সাধারণ মানুষ না আবার বাদ্য বাজনাসহ এমন আসর শুরু করে দেয়। এসব কারণে হযরত জিয়াউদ্দিন সানামী (রহ.) এসে এ আসর বন্ধ করতে চাইলেন এবং হাঁক দিয়ে বললেন, শরীয়ত বিরোধী এসব কাজ বন্ধ কর। কিন্তু তাঁর কথা শোনার মত হুশ কারো সেখানে ছিল না। সবাই নিজ নিজ অবস্থায় বিভোর ছিলেন, নিজের নিজস্ব জগতে ডুবে ছিলেন। কেউ তাঁর কথা শুনলেন না। হাকিম জিয়াউদ্দিন (রহ.) দেখলেন যে, কেউ তার কথা শুনছেন না। তিনি বুঝলেন যে তারা তার কথার অবাধ্যতা করছে বা একগুঁয়েমী করছে এমন নয়; বরং সবাই এক অন্য জগতে চলে গেছে, এ জগতের হুশ কারও নেই। তিনি সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ নীতির উপর আমল করণার্থে প্রথমে তো জোর আওয়াজে বললেন যে সঙ্গীত বন্ধ কর, এর মাধ্যমে লোকজনের মাঝে ফেতনা ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু যখন দেখলেন যে, তাঁর কথা শোনার মত হুশ কারো নেই তখন নির্দেশ দিলেন যে, তাঁবুর রশি কেটে দাও। যখন তাঁবু তাদের মাথার উপর পড়বে তখন সঙ্গীত বন্ধ করবে।

তাঁর সিপাহীগণ এসে তাঁবুর রশি কেটে দিল কিন্তু তাঁবু শূন্যের উপর ঝুলে রইল। সমস্ত রশি কাটা হয়ে গেছে কিন্তু তাঁবু যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। বেচারা হাকিম জিয়াউদ্দিন সাহেব এখন কী করবেন? আমরু বিল মারুফ তথা সৎ কাজের আদেশ করেছে। হাদীসে অন্যায় দেখলে হাত দিয়ে প্রতিহত করতে বলা হয়েছে। তাও করেছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। কেননা তাঁরা তো সঠিক লোক ছিলেন। সকলেই আল্লাহর প্রেমের বিশেষ এক অবস্থায় বিভোর ছিলেন। অতঃপর জিয়াউদ্দিন সাহেব ভাবলেন যে, আমার সাথে থাকা সিপাহীদের আবার এ খেয়াল না হয় যে এরা তো হক কাজই করছিল, শুধু শুধু আমাদের দ্বারা হক কাজে বাধা দিচ্ছে। তাই তিনি বললেন, দেখ, এরা সবাই বিদআতী এবং বিদআতেই রত রয়েছে। কিন্তু এখন যেহেতু তারা নিজস্ব জগতে ডুবে আছে তাই এখান থেকে চলো, অন্য কোন সময় আমরু বিল মারুফ করব।

এই ছিল ধর্ম-সঙ্গীতের ধরন। খাজা সাহেব (রহ.) এবং তাঁর মুরিদ ও উপবিষ্টগণ সকলেই যেহেতু সঠিক পথেই ছিলেন এবং সঙ্গীত যেহেতু জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য নয়; বরং উন্নত স্তরে আরোহণ বা চাপ মুক্তির

জন্য শুনছিলেন এজন্যই তাঁবু যথাস্থানে ছিল। তারা তাদের অবস্থানে সঠিক ছিলেন এবং হাকিম জিয়াউদ্দিন (রহ.)-এর কাজও স্বস্থানে সঠিক ছিল। কেননা তিনি শরীয়তের বিধান কায়েম করছিলেন। তাঁর কর্মগত অবস্থান ছিল পুলিশ ও সৈনিকের। আর পুলিশের কাজ হল আইনের পরিপন্থী কোন কিছু দেখলে তাতে বাধা দেয়া।

হাকিম জিয়াউদ্দিন (রহ.)-এর মর্যাদাগত অবস্থান

উপরিউক্ত ঘটনায় হাকিম জিয়াউদ্দিন (রহ.)-এর একটি দিক প্রকাশ পেয়েছে। নিচের ঘটনায় তাঁর অন্য একটি দিক স্পষ্ট হয়ে উঠবে। হাকিম জিয়াউদ্দিন (রহ.)-এর ইন্তেকালের সময় যখন নিকটবর্তী হল তখন হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রহ.) তাঁকে দেখতে দেলেন। তিনি গিয়ে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে সংবাদ পাঠালে হযরত জিয়াউদ্দিন (রহ.) ভেতর থেকে জওয়াব পাঠালেন যে, তাকে ফিরিয়ে দাও, কোন বিদআতীর মুখ দেখতে চাই না। খাজা নিজামুদ্দিন (রহ.) সংবাদ পাঠালেন যে, তাঁকে গিয়ে বল, বিদআতী বিদআত থেকে তওবা করার জন্য হাজির হয়েছে। এ সময় হাকিম জিয়াউদ্দিন (রহ.) তাঁর পাগড়ি পাঠিয়ে বললেন, এটা বিছিয়ে তার উপর পা দিয়ে আসতে বল এবং জুতা পায়ে আসতে বল। খালি পায়ে যেন না আসে।

খাজা সাহেব পাগড়ি উঠিয়ে মাথার উপর রাখলেন এবং বললেন, এটা আমার ফযিলতের পাগড়ি। সে পাগড়ি মাথায় দিয়েই তিনি তাঁর কাছে গেলেন। মোসাফাহা করে পাশে বসে তাঁর দিকে মনোযোগ দিলেন। তাঁর উপস্থিতিতেই হাকিম জিয়াউদ্দিন (রহ.)-এর ইনতেকাল হল। খাজা সাহেব বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! হাকিম জিয়াউদ্দিনকে আল্লাহ কবুল করেছেন। মর্যাদার উচ্চ স্তরে পদার্পণ করেই তাঁর ইনতেকাল হয়েছে।

তাঁরা উভয়ে নিজ নিজ অবস্থানেই রয়েছেন। নিজের মত করে স্বীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। পরস্পরকে সম্মান করার অবস্থা দেখুন, একজনে নিজের পাগড়ি পাঠিয়ে বলেছেন যেন জুতা পায়ে মাড়িয়ে আসেন। অন্যজন তা মাথায় রেখে বলেছেন যে, এটা আমার জন্য ফযিলতের পাগড়ি, আমার জন্য সৌভাগ্য। একদিকে কামেল ওলী, যিনি তরিকতের মধ্যে উচ্চস্তরে

রয়েছেন অন্যদিকে আলেমে রব্বানী। উভয়ে উভয়ের কদর সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। আল্লাহ মাফ করুন– যদি উভয়ে অসম্পূর্ণ হতেন তবে একে অপরের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে যেতেন, দুনিয়ায় ঝগড়া ফেতনা ছড়ানো শুরু হয়ে যেত। সুতরাং কামেল ওলী ও আলেমগণ একে অন্যের মহত্ত্বকে চিনতে পারেন, একে অন্যের বড়ত্ব বুযুর্গীকে মানেন।

খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রহ.)-এর মর্যাদাগত অবস্থান

উপর্যুক্ত ঘটনা থকে বোঝা যায় যে, হাকিম জিয়াউদ্দিন (রহ.)ও আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন। কিন্তু শরীয়তের বিধান প্রতিষ্ঠা করা এবং শরয়ী হুকুম-আহকামকে অক্ষত রাখার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত ছিল। সুতরাং উলামাদের উদাহরণ যেন পুলিশের মত আর সুফীগণের উদাহরণ যেন বাদশাহর কাছের লোকজনের মত। সব সময় যারা বাদশাহর কাছাকাছি থাকেন, যারা বাদশাহর অতি নৈকট্যশীল তারা বাদশাহর সামনে বসে কখনো কখনো এমন সব কথাবার্তা বলে থাকেন বা কাজ করে থাকেন যা বাইরে এসে করতে পারেন না। সেসব যদি জনসমক্ষে এসে করা হয় তবে পুলিশের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তারা যদি নিজেদেরকে বাদশাহর কাছের মানুষ বলে পরিচয় দেন তবুও পুলিশ তাদের দায়িত্ব পালন করবে এবং তাদেরকে বলবে যে, বাদশাহর মজলিসে গিয়ে যা ইচ্ছা কর, জনসমক্ষে যখন আসবে তখন আইনের অনুসরণ করতে হবে। আইনের রক্ষণাবেক্ষণ আমাদের দায়িত্ব। বাদশাহর দরবারে যখন তোমরা থাকবে তখন যা ইচ্ছে কর, তা দেখার দায়িত্ব আমাদের নয়। তার দরবার আইনের ঊর্ধ্বে। কিন্তু যখন রাস্তায়, মাঠে ও জনসমাবেশে আসবে তখন আইন মান্য করতে হবে।

আলেম উলামাগণ ঐ পুলিশেরই মত। তারা আইনের রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং সুফীগণ বাদশাহর নৈকট্যশীলগণের মত। তাঁরা নিজস্ব জগতে আল্লাহর সান্নিধ্যে থেকে যাই করুন না কেন, বাইরের জগতে যখন আসবেন তখন শরীয়তের বিধান সম্পূর্ণরূপে মান্য করা একান্ত আবশ্যক হয়ে যায়।

ধর্ম-সঙ্গীতের ব্যাপারে হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর ঘটনা

আমি আমার মুরব্বীদের নিকট থেকে শুনেছি, দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) শুধু আলেমই ছিলেন না, কামেল আরেফ বিল্লাহও ছিলেন, রব্বানী ও দরবেশ ছিলেন, কাশফ ও কারামতের অধিকারী আওলিয়াদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি একবার 'খলজ' এলাকায় সফরে গেলেন। সেখানে তাঁর বহু মুরিদ ও সিলসিলার লোক ছিল। নানুতবী (রহ.)-এর এক শিষ্যের শিষ্য মাওলানা আবদুর রহমান সাহেবের বাড়িতে বাদ আসর হযরতের মজলিশ হল। নানুতবী (রহ.)-এর সামনে চার পাঁচশ' লোক বসা ছিলেন। আমাকে যিনি এ ঘটনা শুনিয়েছেন তিনি হলেন নানুতবী (রহ.)-এর খাস খাদেম হাজী আমীর শাহ। শাহ সাহেব বলেন, হযরতের মজলিশ ছিল। হঠাৎ সেখানে তাঁর ভাতিজা এসে উপস্থিত হল, যার নাম ছিল রঙ্গমাস্ত খান। তার কণ্ঠ ছিল অত্যন্ত চমৎকার এবং সে ছিল সঙ্গীতের বড় উস্তাদ। আমির শাহ সাহেব তার গযলের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, একবার আমরা কিছু বন্ধু সাথী মিলে খাবার পাক করার আয়োজনে ছিলাম। কেউ গোশত ধুচ্ছিল, কেউ পেঁয়াজ রসুন কাটছিল, কেউ পানির পাত্র ভরছিল– সকলে নিজ নিজ কাজে রত ছিল। এ সময় এই রঙ্গমাস্ত খান এসে উপস্থিত হল। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বিখ্যাত পারস্য কবি হাফিজ শিরাজীর একটি গযল শুরু করে দিল। তার গযলের যাদু সকলকে এমনভাবে অভিভূত করল যে, যার চাকু পেঁয়াজে ছিল তা পেঁয়াজেই রয়ে গেল, যার হাত পানির পাত্রে ছিল তা সেখানেই রয়ে গেল, যে মশলা পিষছিল তার হাত সেখানেই স্থির হয়ে গিয়েছিল। সবাই নিজেকে ভুলে সুরের মূর্ছনায় বিভোর হয়ে পড়লেন।

আমীর শাহ সাহেব বলেন, নানুতবী (রহ.)-এর এই মজলিশে এই রঙ্গমাস্ত খান এল এবং হযরতের কাছে গিয়ে বসল। আমার ফুফা হযরতের পেছন থেকে রঙ্গমাস্ত খানকে শুরু করার জন্য ইশারা করলে সে শিরাজীর সেই গযলটি শুরু করল। কিন্তু মাত্র তিনটি শব্দ উচ্চারণ করার পরই সে চুপ হয়ে গেল। আমার ফুফা তাকে বলার জন্য পুনরায় ইশারা করল কিন্তু এবার সে মাত্র দুটি শব্দ উচ্চারণ করে থেমে গেল। আমার ফুফা তাকে পুনরায় তাকিদ করলে সে মাত্র একটি শব্দ উচ্চারণ করেই থেমে গেল।

মজলিশ শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে চুপ হয়েই রইল।

আমীর শাহ সাহেব বলেন, মজলিশ শেষে আমার ফুফা রঙ্গমাস্ত খানকে ধমক দিয়ে বললেন, ঐ দিন তো তুমি এমনভাবে পড়লে যে সকলে স্তব্ধ হয়ে গেল। আজ তোমার এ অবস্থা কেন হল?

সে বলল, আমার উপর যে কি মসিবত এসেছিল তা আপনারা দেখেননি।

ফুফা জানতে চাইলেন, কি মসিবত?

সে বলল, আমি শুরু করার পরই হযরত নানুতবী (রহ.) হাত বাড়িয়ে আমার মুখ চেপে ধরলেন। আমি তখন চুপ হয়ে গেলাম। অতঃপর আপনার ইশারায় আবার শুরু করলাম। আবারো তাঁর হাত এগিয়ে এসে আমাকে থামিয়ে দিল। আবার চেষ্টা করলাম, তখনও একই ঘটনা ঘটল। শেষে বাধ্য হয়ে আমি চুপ হয়ে রইলাম।

ফুফা বললেন, কই আমরা তো তা দেখিনি?

রঙ্গমাস্ত খান বলল, খোদার কসম! তিনিবারই তিনি হাত বাড়িয়ে আমার মুখ চেপে ধরেছেন।

এ তো ছিল তার বক্তব্য। হযরত নানুতবী (রহ.) আমীর শাহ সাহেবকে উদ্দেশ্য করে যে কথা বলেছিলেন তার দ্বারা হযরতের মর্যাদাগত অবস্থান অনুমান করা যায়। তিনি বলেছিলেন– 'সুফীগণের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বদনাম যেমন আমার আছে তেমনি মৌলভীর কাতারভুক্তির দুর্নামও আমার সাথে সংযুক্ত। (বিনয় ও নিজেকে ছোট মনে করার কারণে বদনাম ও দুর্নাম শব্দ ব্যবহার করেছেন।)। সুতরাং সে দিকটির প্রতিও খেয়াল রাখা আপনাদের কর্তব্য। আজ যদি ওভাবে গযল গাওয়া হত তবে লোকজন বলতো যে, আলেমরাও গান বাজনায় মশগুল হয়ে পড়েছে। এটা কেউ দেখতো না যে, কোনটি জায়েযের সীমায় ছিল আর কোনটি নাজায়েযের পর্যায়ে ছিল।

বিশেষ ব্যক্তিবর্গের দায়িত্বশীলতা

বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে অনেক জায়েয জিনিস থেকেও বিরত থাকতে হয়। তা না হলে সাধারণ মানুষ আরেকটু অগ্রসর হয়ে নাজায়েয কাজে লিপ্ত হয়ে

পড়বে। সাবধানতা বলুন, আর তাকওয়া বলুন, সাধারণ মানুষের খাতিরে অনেক জায়েয কাজ ছাড়তেই হয়। হাদীস শরীফে এসেছে–

الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ على دينهم.

অর্থাৎ হালাল জিনিসও স্পষ্ট এবং হারাম জিনিসও স্পষ্ট। হারাম ও হালালের মাঝখানে কিছু সন্দেহযুক্ত জিনিস রয়েছে, যাতে হালাল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং হারাম হওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে। এই সন্দেহ থেকে যিনি বেঁচে থাকেন তিনিই হলেন মুত্তাকী। যিনি বেঁচে থাকবেন তিনিই নিজের দীনকে সকল খারাবী থেকে মুক্ত রাখবেন।

ইমাম রাজী (রহ.) ইমাম গাযালী (রহ.)-এর সূত্রে একটি উক্তি সংকলন করেছেন এবং তাকে তিনি হাদীসে মারফু বলেছেন। হাদীসটি হল–

'যখন আলেমগণ জায়েযের সীমার মধ্যে থাকতে চেষ্টা করবেন তখন সাধারণ মানুষ মাকরূহ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে। যখন আলেমগণ মাকরূহ কাজে আসক্ত হয়ে পড়বেন তখন সাধারণ মানুষ হারামে লিপ্ত হয়ে যাবে, আর যখন আলেমগণ হারামে লিপ্ত হয়ে যাবেন তখন সাধারণ লোকজন কুফরী করতে থাকবে (নাউযুবিল্লাহ)।'

এজন্যই আলেম-উলামা তথা বিশেষ ব্যক্তিবর্গের জন্য অধিক সতর্ক হওয়া আবশ্যক। সাধারণ লোকের খাতিরে, তাদেরকে রক্ষা করার খাতিরে মাকরূহ কাজ তো দূরের কথা, জায়েয থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।

এই সতর্কতার কারণেই হযরত নানুতবী (রহ.) তাঁর মজলিশে গযল পরিবেশনকে সমর্থন করেননি। সেদিনের সে পরিবেশে তা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না। কেননা সেখানে কোন বাদ্য-বাজনা ছিল না, হারমোনিয়াম ছিল না। সেতারা ছিল না। শুধু মধুর আওয়াজে কিছু বাণীর উচ্চারণ ছিল, যা সম্পূর্ণরূপে জায়েয। কিন্তু যেহেতু সেটা ছিল আলেমের মজলিশ তাই জায়েয হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাকে সমর্থন করেননি। সাধারণ লোকজন বলতো যে, গানের আসর হচ্ছে। এরপর তারা নিজেদের জন্য সেতারাকেও জায়েয করে নিত।

রাসূল (সা.)-এর ইলম

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اوتيت علم الأولين والأخرين

আমাকে পূর্বাপরের সকল ইলম দান করা হয়েছে।

অর্থাৎ আমার পূর্ববর্তী যুগে যত ইলম দেয়া হয়েছে সমগ্র নবীগণ যত ইলম নিয়ে আগমন করেছেন তার সবটুকু আমার সত্তায় জমা করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং পূর্ব যুগের নবী রাসূলগণের ইলম এর আধার যেমন তিনি তদ্রূপ কেয়ামত পর্যন্ত যত আলেম উলামা ও বিজ্ঞজনের আগমন ঘটবে তাদের সম্মিলিত জ্ঞানেরও আধার তিনি। একথা স্পষ্ট যে পরবর্তী জ্ঞানীজন তো তাঁরই জ্ঞানের প্রতিচ্ছায়। তাঁরই পদধূলির সদকা নিয়ে আলেম 'আলেম' হয়েছেন। তাঁরই পদধূলির সদকা নিয়ে সিদ্দিক 'সিদ্দিক' হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এক মহান কল্যাণরূপে সৃষ্টি করেছেন, পূর্বাপর সকল জ্ঞানের সন্নিবেশ ঘটিয়ে অনন্য করেছেন তাঁকে।

সম্মিলিত ইলমে নববীর স্বরূপ দৃষ্টান্ত

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, পৃথিবীর পূর্বাপর সকল ইলমের সন্নিবেশ ঘটেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে। আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। যেমন- আমাদের চোখ দিয়ে আমরা কোন বস্তুর আকৃতি, রঙ প্রভৃতি দেখি। সুতরাং সে আলেম। কিন্তু চোখের এই ইলম কোন কিছুকে দেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আওয়াজকে চেনা চোখের কাজ নয়, তার জন্য কান রয়েছে। আওয়াজ ভাল না মন্দ, উঁচু না নিচু তার ইলম অর্জন করে কান। কান হল আওয়াজের আলেম। নাক হল সুগন্ধ ও দুর্গন্ধের আলেম। সে ঘ্রাণ নিয়ে বলে দেবে গোলাপ ফুল না চামেলী ফুল। কিন্তু নাক যদি গোলাপের রূপ দেখতে চায়, সে পারবে না। কেননা এটা তার কাজ নয়। জিহ্বার কাজ হল স্বাদ গ্রহণ করা। তিক্ততা, মিষ্টতা বা লবণাক্ততা বর্ণনা করা।

এই মুখমণ্ডলের ভেতরে চোখ, কান, নাক, জিহ্বা রয়েছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিষয়ের আলেম। এ যেন উলামাদের এক আবাসস্থল। আওয়াজের

আলেম কান, আকৃতি ও রঙের আলেম চোখ, স্বাদের আলেম জিহ্বা, সুগন্ধ ও দুর্গন্ধের আলেম নাক। এরা সকলে উলামা। প্রত্যেকের নিজ নিজ বিষয়ের ইলম রয়েছে। আল্লাহর মহান এক নির্মাণশৈলীর বদৌলতে মাত্র কয়েক ইঞ্চির মুখমণ্ডলে এই সবকিছুরই এক অপরূপ সমন্বয় ঘটেছে। কান ও চোখের মধ্যে খুব বেশি দূরত্ব নয়। মাত্র দুই তিন ইঞ্চির দূরত্ব। নাক ও চোখের দূরত্ব এক দুই মাইল নয়, এক দুই ইঞ্চি হবে। কিন্তু এসবের মধ্যে এমনই এক প্রতিবন্ধকতার মজবুত প্রাচীর রয়েছে যে তাকে অতিক্রম করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। চোখের কোন সাধ্য নেই কানের কাজে হস্তক্ষেপ করার, কানের কোন সুযোগ নেই চোখের দায়িত্ব পালন করার। একত্রে মিলেমিশে আছে ঠিকই কিন্তু নিজের সীমার বাইরে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে, নিজ নিজ ইলমে নিয়োজিত। এই কান, নাক, চোখ ও জিহ্বার সকল কাজকে আল্লাহ তাআলা অন্য এক স্থানে সংরক্ষণ করেন। তা হল মস্তিষ্ক। সকল ইলম গিয়ে মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হয়। আপনি যখন দেখেন তখন আপনার চোখ দেখার কাজ সম্পন্ন করে দায়িত্ব মুক্ত হয় কিন্তু চোখের দেখা সে দৃশ্যটি মস্তিষ্ক সংরক্ষণ করে। চোখ বন্ধ করলেও দৃশ্যটি আপনার কাছে অস্তিত্বমান থাকবে। আপনি একটি খাবার খাওয়া শেষ করার পরও তার স্বাদের একটি স্বরূপ আপনার মস্তিষ্কে সংরক্ষিত থাকে। লোকে বলে থাকে এত বছর হল অমুকের ঘরে খাবার খেয়েছিলাম। এখনও যেন তার স্বাদ জিহ্বায় লেগে রয়েছে। কোন স্বাদ স্মরণ থাকা সে স্বাদের অস্তিত্বমানতার আলামত বহন করে। জিহ্বা স্বাদ গ্রহণ করে তা মস্তিষ্কে সংরক্ষণ করেছে। যা এখনও সেই মস্তিষ্কে বিদ্যমান রয়েছে। চোখ কান আকৃতিকে দেখে তা মস্তিষ্কে সংরক্ষণ করেছে। সকল আকৃতিই সেখানে রক্ষিত আছে। যখন ইচ্ছা আপনি তাকে দেখে নিতে পারেন। আপনি যদি দিল্লি সফর করে থাকেন তবে হয়তো দিল্লির জামে মসজিদ দেখে থাকবেন, লাল কেল্লা দেখে থাকবেন। দেখেছিলেন তো একবার কিন্তু এখন যদি আপনি ঘরে বসে দিনে দশবার দেখতে চান তবে দেখতে পারবেন।

এই যে ইচ্ছে করলেই তাকে দেখতে পাওয়া, এর দ্বারা নিশ্চিত প্রমাণ হয় যে ভেতরে তা রক্ষিত আছে। চোখ, কান, নাক, জিহ্বা প্রভৃতির সকল কর্মকাণ্ড ও ইলম আপনার মেধা বা মস্তিষ্কে জমা হয়। সবকিছুর সমন্বিত

আধার হল মস্তিষ্ক। তাতে দেখার ক্ষমতা আছে, শোনার ক্ষমতা আছে, স্বাদ গ্রহণ ক্ষমতা আছে, সুগন্ধ দুর্গন্ধ চেনার ক্ষমতা আছে। এসব অঙ্গ যখন নিজ নিজ কাজ করতে থাকে তখন তার অনুভূতি ও উপলব্ধিসমূহ মস্তিষ্কে সঞ্চয় হতে থাকে। সুতরাং মস্তিষ্কই মূল দায়িত্ব পালন করে। মস্তিষ্ক যখন দেখার জন্য প্রস্তুত থাকে তখনই চোখ দেখে। যদি মস্তিষ্ক দেখার জন্য প্রস্তুত না থাকে তবে চোখ দেখতে পারে না। অন্যমনস্কতা ও অন্য চিন্তায় বিভোর থাকার কারণে অনেক সময় আমাদের চোখের সামন দিয়ে ঘটে যাওয়া জিনিসও আমরা দেখতে পাই না। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে চোখ নয় মস্তিষ্কই দেখে থাকে। শোনা, দেখা, ঘ্রাণ নেয়া, স্বাদ গ্রহণ করা সবকিছুই ভেতর থেকে হয়ে থাকে। এই চোখ, কান, জিহ্বা, নাক মাধ্যম মাত্র। এ কারণেই যদি কারো চোখ উপড়ে যায় তাতে মস্তিষ্কের কোন ক্ষতি হয় না। যদি কারো কান না থাকে তাতেও মস্তিষ্কের কোন সমস্যা হয় না। কিন্তু যদি মস্তিষ্ক আঘাপপ্রাপ্ত হয়, তাহলে চোখ পা নাক সবকিছু বেকার হয়ে যায়। তাদের আর কোন কার্যক্ষমতা থাকে না। যার প্রভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কার্যক্ষম থাকে সেই মস্তিষ্কই যখন অক্ষম হয়ে যায় তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেকার হয়ে পড়ে। কিন্তু চোখ, কান, নাক এগুলো না থাকা বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কোন প্রভাবই মস্তিষ্কে পড়ে না। এ উদাহরণ বুঝে আসার পর এবার লক্ষ করুন, এই পৃথিবীতে হাজারো নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন। প্রত্যেক নবী-রাসূলকে বিশেষ কিছু ইলম দান করা হয়েছে। সকলকেই একই দীন বা জীবন বিধান দান করা হলেও সে দীন বুঝানো ও প্রচারের জন্য তাঁদেরকে বিভিন্ন ইলম দান করা হয়েছে। হযরত আদম (আ.)কে সবকিছুর নাম ও গুণাবলীর জ্ঞান দান করা হয়েছিল। কুরআনের ভাষায়–

عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا

হযরত ইউসুফ (আ.)কে স্বপ্নের তাবির করার ইলম দান করা হয়েছিল। যাকে কুরআন এভাবে ব্যক্ত করেছে–

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ.

হযরত দাউদ (আ.)কে বর্ম তৈরির ইলম দেয়া হয়েছিল। হযরত সুলাইমান

(আ.)কে পাখিদের ভাষা বোঝার ইলম দান করা হয়েছিল। সকল নবীর একটি বিশেষ ইলম ছিল। সুতরাং সকল নবী যেন এমন যে কেউ চোখ, কেউ নাক, কেউ কান অর্থাৎ বিভিন্ন ইলমের ধারক বাহক। কিন্তু জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টান্ত যেন মস্তিষ্কের মত, যা সম্মিলিত সকল ইলমের সংরক্ষিত আধার।

নবীগণ অতিবাহিত হয়ে গেছেন। কিন্তু মস্তিষ্ক তথা দীনে মুহাম্মদী অটুট রয়েছে। অথচ যদি মস্তিষ্ক না হত তাহলে চোখ, নাক, কান থাকত না, এমনকি কিছুই থাকত না। সুতরাং নবী-রাসূলগণের ইলম প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মাদী ইলম ভাণ্ডার থেকেই নির্গত। আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত সার্বিক কল্যাণের মূল প্রতীক হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর ফয়েয থেকেই নবীগণের মধ্যে নবুওয়াতের ইলম এসেছে। অর্থাৎ তিনি হলেন উপলক্ষ, তাঁকে উপলক্ষ করেই নবীগণকে ইলম দান করা হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) অন্যান্য নবীরও নবী

আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহ.) তাঁর 'খাসায়িসুল কুবরা' গ্রন্থে নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

انا نبى الأنبياء

অন্যান্য নবীগণ ছিলেন তাঁদের উম্মতগণের নবী আর আমি হলাম নবীগণের নবী।

আল্লাহ তাআলা নবীগণ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং শেষ নবীর উপর ঈমান গ্রহণ করতে বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ط قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا.

> আর আল্লাহ্ যখন নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, আমি যা কিছু তোমাদের দান করেছি কিতাব ও জ্ঞান এবং অতঃপর তোমাদের নিকট কোন রাসূল আসেন তোমাদের কিতাবকে সত্য বলে দেয়ার জন্য তখন সে রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তার সাহায্য করবে। [আল-ইমরান : ৮১]

তিনি বললেন, তোমরা কি অঙ্গীকার করছো এবং এই শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছ?

তারা বললো, আমরা অঙ্গীকার করছি।

আল্লাহ্ তাআলা নবীগণ, কিতাব ও হিকমাত দান করে শেষ নবীর উপর ঈমান গ্রহণের অঙ্গীকার নিয়েছেন। নবীগণের উপর নির্দেশ ছিল, যদি তোমরা আখেরী নবীকে পাও তবে তাঁর উপর ঈমান গ্রহণ করবে। যদি না পাও তবে তাঁর উপর ঈমান গ্রহণ করার জন্য নিজ কওমকে নির্দেশ দিয়ে এসো। এটাও তাঁর প্রতি তোমাদের ঈমান গ্রহণের শামিল।

প্রকৃতপক্ষে নবীর ঈমানই হল মূল ঈমান। আপনার আমার ঈমান নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিচ্ছবি। আসল মুমিন আমরা নই, আসল মুমিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফয়েযের বদৌলতে সকলের উপর ঈমানের প্রতিচ্ছবি পড়েছে বলে মুমিন হিসেবে গণ্য হচ্ছি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঈমানই মূল ঈমান। আমাদের ঈমান তার অনুগামী।

নবীগণকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান গ্রহণের নির্দেশ দেয়ার মানে হল প্রকৃত ঈমান একমাত্র তাঁকেই দান করা হয়েছে। তাঁরই ফয়েয থেকে অন্যান্য নবীগণকে ঈমান দান করা হয়েছে। তদ্রূপ ইলম-এর মূল ভাণ্ডারও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিনা। তাঁরই ফয়েয থেকে অন্য নবীগণের মধ্যে ইলম পৌঁছেছে। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে পূর্বাপর সকল ইলম দান করা হয়েছে। একই কারণে অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– আদম (আ.)কে সব কিছুর নাম ও গুণাবলী শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যেমনিভাবে সমগ্র নাম ও গুণাবলীর শিক্ষা আমাকে দেয়া হয়েছে।

রাসূল (সা.)-এর ইলমের দীপ্তি

হযরত ইউসুফ (আ.)কে স্বপ্নের তাবির করার ইলম দান করা হয়েছিল। কুরআন শরীফে তাঁর কয়েকটি তাবিরের ঘটনা উল্লেখ হয়েছে। এ এক বিস্ময়কর ইলম। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সত্তার দিকে লক্ষ করলে দেখতে পাব যে, তিনি শুধু স্বপ্নের তাবিরই করেননি; বরং স্বপ্নের তাবিরের উসুল বা মূলনীতিও বলে দিয়েছেন। যার দ্বারা উম্মতের মধ্যে বড় বড় তাবিরকারীর সৃষ্টি হয়েছে। তাবিরের ইমাম তৈরি হয়েছে, বড় বড় কিতাব লিখিত হয়েছে। তো হযরত ইউসুফ (আ.) স্বপ্নের তাবির বা ব্যাখ্যা করেছেন আর জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নের তাবিরের সম্পূর্ণ মূলনীতিসমূহ বলে দিয়েছেন। যার দ্বারা তাবিরকারীর সৃষ্টি হয়েছে। যাদের সংখ্যা লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। এটি একটি স্বতন্ত্র ইলম ও শাস্ত্রের রূপ লাভ করেছে।

স্বপ্ন তাবিরের কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনা

প্রথম ঘটনা : ইমাম ইবনে সিরিন (রহ.) স্বপ্ন তাবিরে পারদর্শী ছিলেন। একবার তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে আরয করল যে, আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার খাটের নিচে আগুন দাউ দাউ করছে। এর ব্যাখ্যা কী?

তিনি বললেন, জলদি বাড়ি গিয়ে স্ত্রী-সন্তান ও মালামালসমূহ ঘর থেকে বের কর, তোমার ঘর ভেঙ্গে পড়বে।

লোকটি দ্রুত গিয়ে তাই করল। এর কয়েক ঘণ্টা পর দেখা গেল সত্যি সত্যি তার ঘরটি ধসে পড়েছে। এ ঘটনার পাঁচ ছয় মাস পর আরেক ব্যক্তি এসে আরয করল যে, আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার খাটের নিচে আগুন দাউ দাউ করছে। এর ব্যাখ্যা কী?

তার এ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় তিনি বললেন, খাটের নিচ খনন করে দেখ, তুমি স্বর্ণ পাবে।

লোকটি তাই করল এবং লক্ষ টাকার সোনাদানা পেয়ে সম্পদশালী হয়ে গেল।

লোকজন ইমাম ইবনে সিরিনের কাছে আরয করল, দুই ব্যক্তি একই রকমের স্বপ্ন দেখল। আপনি একজনের ঘর ধসিয়ে দেওয়ালেন,

আরেকজনকে অঢেল সম্পদ পাইয়ে দেওয়ালেন। প্রথমজন কী অপরাধ করেছিল আর দ্বিতীয়জনই বা কী এমন পুরস্কারযোগ্য কাজ করেছিল? স্বপ্ন তো একই ছিল।

উত্তরে তিনি বললেন, প্রথমজন গ্রীষ্মকালে স্বপ্ন দেখেছিলেন। আর গ্রীষ্মকালে খাটের নিচে আগুন স্বপ্নে দেখা বুনিয়াদ নিশ্চিহ্ন হওয়ার দলিল হয়ে থাকে। সুতরাং আমি ঘর ধসে পড়ার তাবির করেছি। দ্বিতীয়জন শীতকালে স্বপ্ন দেখেছে। আর শীতকালে খাটের নিচে আগুন দেখা অশেষ নেয়ামত ও সৌভাগ্যের জিনিস। আগুনের রূপ যেহেতু স্বর্ণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তাই আমি স্বর্ণ পাওয়ার তাবির করেছি। সুতরাং বুঝা গেল, স্বপ্ন ব্যাখ্যারও মূলনীতি বা উসূল রয়েছে। মূলনীতির নিরিখেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা হয়, স্বপ্ন স্পষ্ট হয়।

দ্বিতীয় ঘটনা : ইমাম ইবনে সিরিন (রহ.) ও ইমাম মালেক (রহ.) ছিলেন সমসাময়িক। ইমাম মালেক (রহ.) একজন বড় মাপের ইমাম। তিনি তাবেয়ী ছিলেন।

মদীনার প্রতি ইমাম মালেক (রহ.)-এর অত্যধিক ভালবাসা ছিল। মদীনার ভালাবাসায় ডুবে ছিলেন। তাঁর মদীনার আসক্তির প্রকৃত কারণ ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালবাসা। এজন্যই মদীনার প্রতিটি জিনিস, প্রতি বিন্দু জমিন তাঁর প্রিয় ছিল। মনেপ্রাণে চাইতেন যেন মদীনায় তাঁর দাফন হয়। মদীনার বাইরে মৃত্যু ও দাফন হওয়ার আশঙ্কায় তিনি নফল হজ আদায় করার জন্য মক্কায় যেতেন না। একদিকে মদীনায় মৃত্যু ও দাফন হওয়ার বাসনা অন্যদিকে নফল হজ আদায় করার জন্য মনের ব্যাকুলতা।

ইমাম মালেক (রহ.) একদিন স্বপ্নে দেখলেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মজলিসের মধ্যমণি হয়ে বসে আছেন এবং তিনি সেখানে উপস্থিত রয়েছেন। অত্যন্ত দরদ ও অনুনয়ের সাথে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মন চায় মদীনার মাটি যেন আমাকে কবুল করে। এজন্যই ভয়ে আমি নফল হজ আদায় করতে যাই না, যাতে মদীনার বাইরে আমার ইন্তেকাল না হয় এবং অন্যত্র দাফন না হই। অতএব অনুগ্রহ করে আমাকে বলে দিন, আমার জীবনের আর কত দিন বাকী আছে। যদি

আমি জানতে পারি, জীবনের আরো কয়েক বছর বাকী আছে তাহলে প্রতি বছর নফল হজ আদায় করতে যেতে পারি।

ইমাম মালেক (রহ.)-এর আবেদন শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত তুলে পাঁচটি আঙুল খুলে দেখালেন। এ সময় ইমাম মালেক (রহ.)-এর ঘুম ভেঙ্গে গেল।

এরপর ইমাম মালেক (রহ.) অত্যন্ত পেরেশানীর মধ্যে পড়ে গেলেন। পাঁচ আঙুলের রহস্য তিনি উদঘাটন করতে পারছিলেন না। কী হতে পারে? পাঁচ দিন? পাঁচ মাস? পাঁচ সপ্তাহ? না কি পাঁচ বছর? রহস্যের সমাধানের জন্য স্বপ্নের তাবির বিশেষজ্ঞ ইমাম ইবনে সিরিন (রহ.)-এর কাছে এক ব্যক্তিকে পাঠালেন। তাকে বলে দিলেন, সে যেন বলে যে, একজন মুসলমান এ স্বপ্ন দেখেছেন, ইমাম মালেক (রহ.)-এর কথা যেন উল্লেখ না করে।

ঐ ব্যক্তি ইবনে সিরিন (রহ.)-এর কাছে স্বপ্নের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে তাবির জানতে চাইলেন। ইবনে সিরিন (রহ.) স্বপ্ন কে দেখেছেন তা জানতে চাইলেন। ইবনে সিরিন (রহ.) বললেন, এ স্বপ্ন কেবল অনেক বড় আলেমের পক্ষেই দেখা সম্ভব। সাধারণ ব্যক্তি তো দূরের কথা, যেনতেন আলেমও এ স্বপ্ন দেখতে পারে না। মদীনায় ইমাম মালেকের চেয়ে বড় কোন আলেম তো নেই, এ স্বপ্ন ইমাম মালেক দেখেননি তো?

প্রতিউত্তরে ঐ ব্যক্তি চুপ করে রইল। ইবনে সিরিন (রহ.) বললেন, ফিরে গিয়ে নাম বলার অনুমতি নিয়ে এস। তারপর আমি তাবির বলবো।

ঐ ব্যক্তি ফিরে গিয়ে নাম বলার অনুমতি নিয়ে এলেন। নাম শুনে ইবনে সিরিন (রহ.) বললেন, ইমাম মালেকের পক্ষেই এ স্বপ্ন দেখা সম্ভব। তাঁকে গিয়ে বল, হায়াত সম্পর্কে জানতে চাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ আঙুল দেখানোর অর্থ পাঁচ মাস, পাঁচ দিন বা পাঁচ বছর নয়; বরং তার দ্বারা ইশারা করা হয়েছে হাদীসের বর্ণনা ও কুরআনের আয়াতের দিকে।

هى من خمس لا يعلمهن الا الله

কারো 'মৃত্যুর সময়' ঐ পাঁচটি জিনিসের অন্তর্ভুক্ত যার জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া কারও নেই। [লুকমান : ৩৪]

إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَاتَدْرِىْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ

যে পাঁচটি বিষয় একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো জানা নেই তা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয় পাঁচটি হল– ১. কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে। ২. কখন বৃষ্টি বর্ষিত হবে। ৩. মাতৃগর্ভে কী আছে। ৪. আগামীকাল মানুষ কী উপার্জন করবে। ৫. কারো মৃত্যু কখন কোথায় হবে। (উক্ত বিষয়াবলীর ব্যাখ্যার জন্য তাফসীর ও অন্যান্য বিতাবাদি দেখা যেতে পারে।)

ইবনে সিরিন (রহ.) একটি মূলনীতির আলোকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেছেন। এজন্যই স্বপ্নদ্রষ্টা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তার তাবির করেছেন। এ আলোচনা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.) শুধু স্বপ্নের তাবির করেছেন আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন ও হাদীসে তাবিরের মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন। যার দ্বারা 'স্বপ্নের তাবির' একটি বড় ধরনের শাস্ত্রের রূপ লাভ করেছে। এ শাস্ত্রের উপর বড় বড় কিতাব লিখিত হয়েছে, বড় বড় ইমাম তৈরি হয়েছেন।

ইমাম ইবনে সিরিন (রহ.)-এর স্বপ্নের তাবির ও মূলনীতিকে একটি কিতাবের মধ্যে সংকলন করা হয়েছে। বৃহৎ বৃহৎ দুই খণ্ডে বিভক্ত 'তাসিরুল মানাম ফি তাবিরিল মানাম' নামক উক্ত কিতাবে হাজার হাজার স্বপ্নের তাবির উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাবিরের মূলনীতিসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। ইবনে সিরিন (রহ.) এ শাস্ত্রের একজন বড় ইমাম। তাঁর পরে আরো বড় বড় আলেম অতিবাহিত হয়েছেন যারা খুব ভাল তাবির করতেন।

তৃতীয় ঘটনা : নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান সাহেবের যমানায় ভূপালের প্রধান বিচারপতি ছিলেন কাজী মুহাম্মাদ আইয়ূব সাহেব (রহ.)। তিনি খুব প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর দেয়া তাবির হুবহু মিলে যেত। তাঁর অফিসে এক আহলে হাদীস যুবক চাকরি করত। একবার দাফতরিক কাজের জন্য কাজী সাহেব ভূপাল থেকে চল্লিশ মাইল দূরে এক তাঁবুতে অবস্থান

করছিলেন। এ সময় এ যুবক একটি স্বপ্ন দেখে কাজী সাহেবের কাছে এসে বলল, হযরত! আমি স্বপ্নে দেখলাম, নামাযের একটি বড় জামাত দাঁড়িয়ে গেছে। লাখো মানুষ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং প্রথম কাতারে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রয়েছেন। আর এই বিশাল জামাতের ইমামতি করছেন নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান। এ স্বপ্নের তাবির কী হবে?

সে যুবক মনে করেছিল যে, যেহেতু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নওয়াব সাহেবের পেছনে নামায আদায় করছেন সেহেতু এর দ্বারা নওয়াব সাহেবের বিশেষ কোন ফযিলত ও বুযুর্গীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কাজী সাহেব বললেন, তুমি কি বাস্তবিকই এ স্বপ্ন দেখেছ?

যুবক বলল, হ্যাঁ, বাস্তবিকই আমি এ স্বপ্ন দেখেছি।

তিনি বললেন, সত্যিই যদি তুমি এ স্বপ্ন দেখে থাক তাহলে নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ইন্তেকাল করেছেন।

যুবকের মনে যে আশা ছিল তাবির তার সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়া দেখে যুবক চুপ হয়ে গেল। এর আরো কিছু পরে সংবাদ এল, নওয়াব সাহেব ইন্তেকাল করেছেন। কিছুদিন যাবত তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালে লোকজন শোক বিহ্বল হয়ে পড়ল। তিন দিন যাবত রাষ্ট্রীয় শোক চলল

তিন দিন পর ঐ আহলে হাদীস যুবক কাজী সাহেবের কাছে জানতে চাইল, আপনার তাবির তো সাথে সাথে মিলে গেল। অথচ নওয়াব সাহেবকে ইমামতি করতে দেখে বাহ্যিকভাবে তো মনে হচ্ছিল তার কোন ফযিলত ও বড়ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে। এ তাবির আপনি কিভাবে বুঝলেন?

কাজী সাহেব বললেন, আমি এ তাবির এভাবে বুঝলাম যে, নবীর উপস্থিতিতে ইমামতি করার অধিকার কারো নেই। নামাযের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে কেউ থাকলে মৃতদেহ থাকতে পারে, জীবিত হতে পারে না।

সুবহানাল্লাহ! কী আশ্চর্য মূলনীতি আর কোথায় পৌঁছেছে চিন্তা।

চতুর্থ ঘটনা : দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)ও স্বপ্নের তাবির করার বিষয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

একদিকে তাবির করতেন অপর দিকে ঘটনা প্রকাশ পেত। সাথে সাথে কিছু যৌক্তিক দলিলও দিতেন যে, এ স্বপ্নের তাবির এই হওয়া উচিত।

দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসার প্রথম 'সদরে মুদাররিসিন' হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব, যিনি শুধু আলেমই ছিলেন না, আরেফ বিল্লাহ এবং কাশফ ও কারামতের অধিকারী কামেল ওলীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, একদিন আমি একটি স্বপ্ন দেখে আমার ভাই কাসেম নানুতবীর কাছে তাবির জানতে চাইলাম। আমার স্বপ্নটি ছিল এমন– আমি আমার ঘর থেকে বের হয়ে কোথাও যাচ্ছিলাম। পথে আমার সাথে বড় মহিষ আকৃতির একটি ভেড়ার দেখা হল। ভেড়াটি আমার পথ রোধ করে দাঁড়াল। আমি এগিয়ে গিয়ে তার শিং ধরে ফেললাম। আমাদের মধ্যে দস্ত াদস্তি শুরু হয়ে গেল। কখনো আমি তাকে ধাক্কিয়ে দু'গজ পিছনে নিয়ে যাই, কখনো ভেড়াটি আমাকে পিছিয়ে নিয়ে যায়। এই দস্তাদস্তির এক পর্যায়ে ভেড়াটি আমার বাম উরুতে শিং দিয়ে আঘাত করল এবং দু'তিন ফোঁটা রক্ত নির্গত হল। এ পর্যায়ে এসে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। এ স্বপ্নের কোন ব্যাখ্যাই আমার বুঝে আসছিল না। তাই নানুতবী (রহ.)-এর কাছে ব্যাখ্যা চানতে চাইলাম।

স্বপ্নের বিবরণ শুনে নানুতবী (রহ.) বললেন, মনে হচ্ছে আপনার চাচাকূলের কোন এক মেয়ে শিশুর ইন্তেকাল হবে। নানুতবী (রহ.) এ তাবির করতে থাকা অবস্থাতেই এক মহিলা কাঁদতে কাঁদতে বলে যাচ্ছিলেন, গত পরশু অমুকের যে মেয়েটি জন্মেছিল সে ইন্তেকাল করেছে। নানুতবী (রহ.) বললেন, নিন ভাই, তাবির এসে গেছে।

মাওলানা ইয়াকুব (রহ.)ও আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বললেন, তাবির তো সত্য হল। কিন্তু আপনি বুঝলেন কি করে যে, চাচা পরিবারের এক ছোট মেয়ের ইন্তেকাল হবে?

হযরত নানুতবী (রহ.) তখন দলিল ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। অর্থাৎ স্বপ্ন মাসআলার দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করতে লাগলেন। বললেন, আপনি ভেড়াকে দেখেছেন, আর হাদীসে এসেছে 'মৃত্যু'কে কেয়ামতের দিন ভেড়ার আকৃতি দিয়ে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে নিয়ে গিয়ে জবাই করে দিয়ে ঘোষণা করা হবে– মৃত্যুর আজ মৃত্যু হল।

মৃত্যুকে ভেড়ার আকৃতি দেয়া হবে। আর আপনি ভেড়া দেখেছেন এবং তার সাথে আপনার মোকাবেলা হয়েছে। সুতরাং আপনার মোকাবেলা হয়েছে মৃত্যুর সাথে। এ গেল স্বপ্নের তাবিরের প্রথম অংশ।

দ্বিতীয় কথা হল, আরবী ভাষায় যখন গোত্রের আলোচনা হয় তখন পিতৃকূল বুঝাতে بطن শব্দের ব্যবহার হয়। অর্থাৎ পেটের অংশ। যেমন- দাদা, পরদাদা প্রভৃতিকে بطون বলা হয়। তদ্রূপ চাচা সম্পর্কীয়দের ক্ষেত্রে فخذ শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে। অর্থাৎ উরুর অংশ। নানুতবী (রহ.) বলেন, আপনার যেহেতু মৃত্যুর সাথে মোকাবেলা হয়েছে এবং মৃত্যুর শিং দ্বারা আপনার উরু আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে– এর দ্বারা আমি বুঝলাম যে, চাচাকূলের মধ্যে মৃত্যু সংঘটিত হবে। বাম উরু আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার দ্বারা বুঝলাম, কোন নারীর মৃত্যু হবে। কেননা নারী বাম দিকের সৃষ্টি। আর যেহেতু মাত্র দু'তিন ফোঁটা রক্ত নির্গত হয়েছে তাই আমি বুঝলাম যার মৃত্যু হবে সে অল্প বয়সী হবে। এইসব কিছু মিলিয়ে আমি তাবির করেছি আর তা সাথে সাথেই মিলে গেছে।

পঞ্চম ঘটনা : হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর আরও একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। এ ঘটনাটি বলেই সামনের আলোচনায় যাব। নানুতবী (রহ.)-এর ভাই মাওলানা মুহাম্মদ মুনীর সাহেব একদিন এসে স্বপ্নের তাবির জানতে চাইলেন। বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম 'বিরিলি' এলাকার দিক থেকে কিছু হাঁস উড়ে এসে আমার ঘরে পড়ল। এর ব্যাখ্যা কী?

হযরত নানুতবী (রহ.) বললেন, ভাইজান! যদি আপনি মিষ্টি খাওয়ান তাহলে মাসে বিশ টাকা বেতনের চাকরি পাইয়ে দেব, আর যদি মিষ্টি না খাওয়ান তাহলে মাসে এগার টাকা বেতনের চাকরি।

তিনি বললেন, আমি মিষ্টি খাওয়াব। অতঃপর হযরত নানুতবী (রহ.) বললেন, আপনার স্বপ্নের তাবির হল, বিরিলিতে মাসিক বিশ টাকা বেতনের আপনার চাকরি হবে। তাবির করার চার পাঁচ দিন পর মাওলানা মুহাম্মাদ মুনীর সাহেবের কাছে তার এক স্নেহভাজনের কাছ থেকে চিঠি এল। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, আমি জানতাম যে আপনার অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভাল যাচ্ছে না। খরচাপাতি চালাতে কষ্ট হচ্ছে। তাই আমি আপনার নামে একটি দরখাস্ত করেছিলাম। সে দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে।

মাসিক বিশ টাকা বেতনের একটি চাকরি আপনার হয়েছে। আপনি চলে আসুন।

চিঠি পাওয়ার পর মাওলানা মুনীর সাহেব নানুতবী (রহ.)-এর কাছে ছুটে এলেন। তাবির বাস্তবায়িত হওয়ার সুসংবাদ দিলেন এবং কিভাবে তিনি এ তাবির করলেন তা খুলে বলার অনুরোধ জানালেন।

হযরত নানুতবী (রহ.) আজব এক দলিল বর্ণনা করলেন। বললেন, তুমি বিরিলি থেকে হাঁস উড়ে আসতে দেখেছ। এর দ্বারা আমি বুঝলাম, বিরিলির দিক থেকে হালাল রুজি আসবে। তোমার ঘরে তাই এল। হাঁসগুলোকে তুমি ডেকে আননি; আপনা আপনি এসেছে। এর দ্বারা আমি বুঝলাম, এ চাকরি তোমাকে খুঁজে পেতে হবে না, এমনিতেই আসবে। এটাও সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তুমি দরখাস্ত করনি। রইল এগার টাকা ও বিশ টাকার মাসিক বেতনের বিষয়টি। সে ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় এই ছিল, হাঁসের আরবি শব্দ بط যাতে 'ত্বোয়া'-এর উপরে তাশদিদ রয়েছে, অথচ একটি 'বয়' ও দুইটি 'ত্বোয়া'। অপরদিকে ফারসি ভাষায় হাঁসের প্রতিশব্দ بط যাতে 'ত্বোয়া'-এর উপর যজম রয়েছে। অর্থাৎ একটি 'বা' ও একটি 'ত্বোয়া'। মোট কথা, ফারসিতে بط বলা হয় আর আরবিতে بط বলা হয়। স্বপ্নের তাবিরদাতার এ স্বাধীনতা রয়েছে যে, সে কোন ভাষার শব্দ গ্রহণ করবে। যদি আমি ফারসি শব্দ গ্রহণ করতাম তবে তাতে একটি 'বা' ও 'ত্বোয়া' রয়েছে। 'বা'-এ সংখ্যামান হল দুই এবং 'ত্বোয়া'-এর সংখ্যামান হল নয়। (রোমান পদ্ধতিতে ইংরেজি বর্ণের যেমনিভাবে সংখ্যামান রয়েছে যথা- i = ১, v = ৫, x = ১০ প্রভৃতি তেমনিভাবে আরবি বর্ণেরও সংখ্যামান রয়েছে। যথা- الف = ১, ب = ২, ج = তিন, ط = ৯ প্রভৃতি)। সুতরাং ফারসি শব্দ হিসেবে بط এর মান হল দুই যোগ নয়; অর্থাৎ এগার। আর আরবি হিসেবে যেহেতু দুই 'ত্বোয়া' তাই তার মান দাঁড়াচ্ছে দুই যোগ নয় যোগ নয় অর্থাৎ বিশ।

তাবিরের মূলনীতি সম্পর্কে সম্যক অবগত না হলে এই সূক্ষ্মদর্শিতা অর্জিত হয় না। সুতরাং স্বপ্নের তাবির করার জন্য ইলমের আবশ্যকতা রয়েছে। হিসাব-নিকাষ জানার আবশ্যকতা রয়েছে।

তাবির বিষয়ে শরীয়তের বহু উসূল প্রণীত হয়েছে। এটি একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ লাভ করেছে।

রাসূল (সা.)-এর আখলাকের দীপ্তি

আখলাকের দিক দিয়ে যদি দেখা যায় তবে সে ক্ষেত্রেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সবচেয়ে উন্নত স্তর দান করা হয়েছে। আর এটাই বিধি যে, সর্বশেষ ও সর্বোন্নত বিষয়ের মধ্যে তার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের বিষয়াবলীর সমাবেশ ঘটে থাকে। যেমন- আপনি বললেন, অমুক ব্যক্তি এম এ পাশ করেছে। মানুষ কখন এম এ পাশ করে? প্রথমে প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করে, এরপর মাধ্যমিক, এরপর উচ্চ মাধ্যমিক, এরপর ডিগ্রি, তারপর গিয়ে এম এ পাশ করে। এর অর্থ হল এই, যিনি এম এ পাস করেছেন তার প্রাথমিকের জ্ঞান আছে। মাধ্যমিকের জ্ঞান আছে, উচ্চ মাধ্যমিকের জ্ঞান আছে। মোট কথা, নিচের সবকিছুর জ্ঞান আছে। কিন্তু যিনি প্রাথমিকের স্তরই কেবল অতিক্রম করেছেন তার জন্য এম এ-এর জ্ঞান থাকা আবশ্যক নয়। সুতরাং নিচের জিনিস জানার জন্য উপরের জিনিস জানা আবশ্যক নয় কিন্তু যিনি উপরের জিনিস জানেন তিনি নিচের সবকিছুই জেনে যান। সুতরাং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন আখলাকের উচ্চ স্তর দান করা হয় তখন তার নিচে যেসব স্তর রয়েছে তা এমনিতেই এসে গেছে। এটা কিভাবে? তা এভাবে যে, আমরা যতদূর লক্ষ করেছি তাতে দেখেছি– আখলাক তিন প্রকার। যথা- আখলাকে হাসানা, আখলাকে কারিমা এবং আখলাকে আজিমা।

আখলাকে হাসানা : এটি আখলাকের প্রাথমিক স্তর। আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহিম (আ.)কে সম্বোধন করে বললেন–

يَا خَلِيْلِيْ حَسِّنْ خُلُقَكَ

অর্থাৎ হে আমার খলিল! তুমি তোমার আখলাককে 'হাসান' বানাও। যদি কাফেরদের সাথেও লেনদেন থাকে তবুও আখলাকে হাসানাকে গ্রহণ কর। এতে বোঝা গেল 'আখলাকে হাসানা' বলতে একটি বিষয় রয়েছে যার তালিম হযরত ইবরাহিম (আ.)কে দেয়া হয়েছে।

আখলাকে কারীমা : এটি আখলাকের মধ্যবর্তী স্তর। যার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে বলেছেন–

بعثت لاتمم مكارم الأخلاق

অর্থাৎ আমি এজন্যই প্রেরিত হয়েছি যে, আখলাকে কারীমাকে পূর্ণাঙ্গ করে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব।

আখলাকে আজিমা : এটি আখলাকের সর্বোচ্চ স্তর। যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্তাগত আখলাক। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

إِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيمٍ

হে নবী! আপনি আখলাকে আজিমের অধিকারী। [কলম : ৪]

কুরআন ও হাদীসে তিন ধরনের আখলাকের আলোচনা পাওয়া যাচ্ছে। একটি প্রাথমিক স্তর, একটি মধ্যবর্তী স্তর এবং আরেকটি সর্বোচ্চ স্তর।

আখলাকে হাসানার পরিচয় : আখলাকে হাসানা বলা হয় সমতা বিধান ও ন্যায়ানুগতাকে। অর্থাৎ লেনদেনের মধ্যে ন্যায়বিচারের সীমা অতিক্রম না করা। আল্লাহ না করুন, কেউ যদি আপনাকে একটি থাপ্পড় মারে এবং সে যতটা জোরে মেরেছে আপনিও যদি ততটা জোরে তাকে একটি থাপ্পড় মারেন তাহলে বলা হবে যে, আপনি আখলাকে হাসানার উপর রয়েছেন। যদি আপনি থাপ্পড়ের পরিবর্তে ঘুষি মারতেন তাহলে বলা হত আপনার আখলাক খারাপ। থাপ্পড়ের পরিবর্তে ঘুষি মেরে আপনি সীমালঙ্ঘন করেছেন, বাড়াবাড়ি করেছেন, জুলুম করেছেন। সুতরাং বাড়াবাড়ি ও জুলুম থেকে বেঁচে থাকা হল আখলাকে হাসানা। অর্থাৎ ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা।

তদ্রূপ কাউকে যদি আপনি এক টাকা দেন এবং বিনিময়ে এক টাকাই প্রত্যাশা করেন তাহলে তা আখলাকে হাসানার শামিল। আর যদি আপনি এক টাকা দিয়ে পাঁচ টাকা উসূল করতে চান তাহলে সেটা বদআখলাকী বলে গণ্য হবে। মোট কথা, আখলাকে হাসানা হল সমতা বিধান ও ন্যায়ানুগতা।

আখলাকে কারিমার পরিচয় : আখলাকে কারিমার মধ্যে সমতা নয়; বরং অপরের প্রাধান্য রয়েছে। অর্থাৎ কেউ আপনার সাথে বাড়াবাড়ি করল, আপনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন। কেউ আপনাকে চড় মারল। আপনি

বললেন, আমার তো প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার আছে। কিন্তু ঐ আহাম্মক ও বেয়াকুবের থেকে কী প্রতিশোধ নেব, মাফ করে দিলাম। নিজের অধিকার ছেড়ে দিয়ে অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে আখলাকে কারিমা বলা হয়।

আখলাকে আজিমার পরিচয় : আখলাকে আজিমা হল, আপনার সাথে কেউ বাড়াবাড়ি করলে আপনি তাকে শুধু ক্ষমাই করেন না; বরং তার প্রতি এহসান করেন। যে প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে–

صل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن إلى من أساء إليك

যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল তার সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার চেষ্টা কর। যে তোমার উপর জুলুম করেছে তাকে মাফ করে দাও এবং যে তোমার প্রতি অসদাচরণ করেছে তুমি তার প্রতি সদাচরণ করতে চেষ্টা কর।

এই চরিত্রকেই খলকে আজিম বলা হয়। আর এটাই ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র।

পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহের সাথে শরীয়তে মুহাম্মদীর আখলাকের তুলনা

হযরত মুসা (আ.) নিজের কওমকে আখলাকে হাসানার তালিম দিয়েছেন। অর্থাৎ পূর্ণ ইনসাফের তালিম শিক্ষা দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ.

আমি তাওরাতের মধ্যে কিসাসের বিধান ফরয করে দিয়েছিলাম। তা হল, জীবনের বিনিময়ে জীবন, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে

কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমের বিনিময়ে সমান জখম। [মায়িদা : ৪৫]

তাওরাত তথা মুসা (আ.)-এর শরীয়তে প্রতিশোধ গ্রহণ ওয়াজিব ছিল, মাফ করে দেয়া জায়েয ছিল না। খুব কঠিন শরীয়ত ছিল। এটা হল আখলাকে হাসানা। হযরত মুসা (আ.) এ আখলাকের তালিম দিতেন।

হযরত মুসা (আ.) আখলাকে কারিমার তালিম দিতেন। তাঁর শিক্ষা ছিল, কেউ যদি তোমার ডান গালে চড় মারে তাহলে বাম গাল এগিয়ে দাও। এটা হল ক্ষমা করা ও অপরের প্রাধান্যতার পর্যায়ভুক্ত। দ্বিতীয়বার আঘাতে হয়তো তার মন শান্ত হবে, তৃপ্ত হবে।

কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে একটি পরিপূর্ণ আখলাক উন্মোচন করেছেন। তা হল, তিনি এও বলেননি যে, প্রতিশোধ নেয়া ওয়াজিব আবার ক্ষমা করে দেয়াকেও ওয়াজিব সাব্যস্ত করেননি। তিনি উভয় বিষয়ের সমন্বয় করেছেন এবং সাথে সাথে উচ্চতর স্তরকেও উপস্থাপন করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ

খারাপ আচরণের বিনিময় অনুরূপ খারাপ আচরণ। তবে কেউ যদি ক্ষমা করে দেয় এবং সদাচরণ করে তাহলে তার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে পুরস্কার রয়েছে। নিশ্চয়ই তিনি জালিমকে পছন্দ করেন না। [শুআরা : ৪০]

অত্র আয়াতে একদিকে যেমন সমপর্যায়ের প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে অন্যদিকে আবার ক্ষমা করার প্রতি উৎসাহিত করে আল্লাহর পক্ষ হতে পুরস্কারের ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিশোধ নেয়া ও ক্ষমা করা– এ উভয় অধিকার মুসলমানদের দেয়া হয়েছে। কারণ ইসলাম পৃথিবীর সকল জাতির জন্য প্রেরিত এক জীবন ব্যবস্থা। পৃথিবীতে নম্র স্বভাবের জাতি যেমন রয়েছে, তেমন রয়েছে কঠিন স্বভাবের জাতিও। যদি এ শিক্ষা দেয়া হত যে, প্রতিশোধ নেয়া তোমাদের জন্য ওয়াজিব, তাহলে নরম স্বভাবের বাঙালী জাতির কেউ হয়তো ইসলাম গ্রহণ করত

না। তারা বলত, এ খুনখারাবীকে কে গ্রহণ করবে? কেউ চড় মারলে তাকেও চড় মারা আমার উপর ওয়াজিব। কেউ লাঠি দিয়ে আঘাত করলে তাকেও আঘাত করা আমার উপর ওয়াজিব। এ তো বড় কঠিন ধর্ম।

আবার যদি এ শিক্ষা দেয়া হত যে, ক্ষমা করে দেয়া ওয়াজিব। তাহলে হয়ত পাঠান জাতির কেউই ইসলাম কবুল করত না। তারা বলত, এই কাপুরুষোচিত ধর্ম কে গ্রহণ করবে? কেউ এক গালে চড় মারলে অন্য গাল বাড়িয়ে দিতে হবে! কেন ভাই? কিসের জন্য? এসব আমরা সহ্য করতে পারি না।

সুতরাং এই উভয় জাতির কথা বিবেচনা করে ইসলাম বিধান দিয়েছে যে, অন্যায়ের প্রতিশোধেরও অধিকার আছে আবার ক্ষমা করে দিলেও তার জন্য পুরস্কার রয়েছে।

আর কেউ যদি অন্যায়ের প্রতিশোধ না নিয়ে শুধু ক্ষমাই করে না, উপরন্তু তার প্রতি এহসান করে ও হিতাকাঙ্ক্ষী হয় তাহলে তা আখলাকে আজিমা। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আখলাক। যে প্রসঙ্গে কুরআন শরীফের এক আয়াতে বলা হয়েছে–

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

আল্লাহর রহমতের বদৌলতে আপনার হৃদয় বিনম্র রয়েছে। যদি আপনি তাদের প্রতি কঠোর হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে দূরে ভেগে যেত। [আল-ইমরান : ১৫৯]

আল্লাহর রহমতের বদৌলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আত্মা বিনম্রতায় পূর্ণ হয়েছে। যার চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম নির্দেশ দেয়া হয়েছে–

فَاعْفُ عَنْهُمْ

কেউ অন্যায় করলে তাকে ক্ষমা করে দিন।

শুধু ক্ষমা করেই ক্ষান্ত হওয়া নয়, দ্বিতীয় নির্দেশে বলা হয়েছে–

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

তাদের জন্য মাগফেরাতের দুআ করুন।

তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া এবং তাদের জন্য মাগফেরাতের কামনা করাই আপনার শানের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, আপনার মর্যাদা আরো ঊর্ধ্বে– এ কথা বুঝাতেই তৃতীয় পর্যায়ে গিয়ে বলা হয়েছে–

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ

কাজ করার সময় আপনি তাদের সাথে পরামর্শ করুন।

এটা এজন্য যাতে তারা বুঝতে পারে যে আমাদেরকে আপন মনে করছে। তারা তাঁর সাথে করে যাচ্ছে অন্যায় আচরণ আর তিনি তাদেরকে করে নিচ্ছেন আপন। তারা গালি দিচ্ছে আর তিনি দুআ করছেন। এই হল আখলাকে আজিমা।

সুতরাং যিনি আখলাকে আজিমার অধিকারী তার ভেতরে আখলাকে হাসানা ও আখলাকে কারিমারও সন্নিবেশ ঘটেছে। কারণ উচ্চস্তর যার অর্জিত হয়েছে নিম্ন ও মধ্যম স্তরও তার অর্জিত হয়েছে। সুতরাং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদত্ত আখলাকের মধ্যে যাবতীয় আখলাকের সমাবেশ ঘটেছে।

ইলমের ক্ষেত্রে যেমন নবুওয়াতের সকল ইলমের অধিকারী তাকে করা হয়েছে, আখলাকের ক্ষেত্রেও তাঁর অবস্থান সকল নবীর ঊর্ধ্বে। আর এ দুটোই ছিল নবুওয়াতের ভিত্তি। এ দুটোর সর্বোচ্চ পর্যায় যেহেতু তাঁর মধ্যে ছিল সেহেতু তাঁর নবুওয়াত ছিল সর্বোন্নত নবুওয়াত। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لى مع الله وقت لا يسعنى ملك مقرب ولا نبى مرسل

আল্লাহ তাআলার সাথে আমার ঐ নৈকট্য অর্জিত হয়েছে, কোন নৈকট্যশীল ফেরেশতা কিংবা প্রেরিত নবীর যে নৈকট্য অর্জিত হয়নি।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের আবির্ভাব সম্পর্কে দুটি উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। প্রথমত انما بعثت معلما অর্থাৎ আমি

শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি, দুনিয়ার মানুষকে তালিম দিয়ে ইলমের প্রসার ঘটাব। দ্বিতীয়ত بعثت لأتمم مكارم الأ خلاق অর্থাৎ আখলাকে কারিমার পূর্ণতার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি।

হাদীস শরীফে এসেছে, একবার হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে তাশরিফ নিলেন। সেখানে সাহাবাদের দুটি দল মসজিদের দু'প্রান্তে অবস্থান করছিলেন। একটি দল মাসআলা মাসায়িল আলোচনা করছিলেন। অর্থাৎ ইলমী আলোচনা হচ্ছিল। অন্য দল ইবাদতে মশগুল ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উভয় দলকে দেখে বললেন– كلا كما على الخير অর্থাৎ তোমরা উভয় দল কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত রয়েছ। অতঃপর বললেন, انما بعثت معلما অর্থাৎ কিন্তু আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি। এই বলে তিনি মাসআলা বয়ানকারী দলে বসে পড়লেন। সুতরাং নবুওয়াতের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হল তালিম। যার মাধ্যমে পৃথিবীতে ইলমের প্রসার ঘটে থাকে। তিনি শিক্ষকরূপে আগমন করে দুনিয়ায় ইলমের প্রসার ঘটিয়েছেন এবং লোকজনকে আলেম বানিয়েছেন।

রাসূল (সা.)-এর ইলমী মুজেযা

ইলম হল আল্লাহ তাআলার গুণ। এ গুণের প্রসার করণ যেন বান্দাকে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করণ। তিনি যেহেতু তালিম দেয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছেন এবং নবুওয়াতের দিক থেকেও শ্রেষ্ঠ নবুওয়াতের অধিকারী সেহেতু শ্রেষ্ঠ তালিমের অধিকারীও তিনিই। এজন্যই তাঁকে ইলমী মুজেযা দান করা হয়েছে। মুজেযার ভেতর শ্রেষ্ঠতম মুজেযা হল ইলমী মুজেযা। হাজারো আমলী মুজেযা তাঁকে দেয়ার পরও শ্রেষ্ঠতম মুজেযা 'পবিত্র কুরআন' তাঁকে দান করা হয়েছে। যা একটি ইলমী মুজেযা। এ কুরআনের অনুরূপ কোন কিছু সৃষ্টি করতে সকলেই ব্যর্থ হয়েছে, অক্ষম হয়েছে। কুরআন স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছে–

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا
بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ

لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

হে নবী! আপনি বলে দিন, যদি মানব ও জিন সম্মিলিতভাবে এবং পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমেও এ কুরআনের অনুরূপ কোন কিছু সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা করে তবে তারা ব্যর্থ হবে।

এরপর আরো কমিয়ে এনে বলেছেন– সমস্ত কুরআনের মত না হোক অন্ত ত অনুরূপ দশটি সূরা বানিয়ে আনুক।

فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيٰتٍ.

কাফেররা অভিযোগ করেছিল যে, এটা আল্লাহর কালাম নয়; বরং স্বরচিত বাণী, যা আল্লাহর নামে মিথ্যা প্রচার। এ অভিযোগের উত্তরে উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে– 'এ ধরনের মিথ্যা তোমরাও উপস্থাপন করে দেখাও, অন্তত দশটি সূরা তৈরি করে নিয়ে এসো।'

অতঃপর আরো কমিয়ে এনে প্রস্তাব করা হয়েছে–

فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ

দশটি সূরা তোমরা তো তৈরি করতে সক্ষম হলে না, 'অন্তত একটি সূরা তৈরি করে দেখাও যা কুরআনের অনুরূপ।' অর্থাৎ তার বর্ণনাভঙ্গি যেন কুরআনের মত হয়, তার ব্যাকরণগত বিশুদ্ধতা ও অলঙ্কার যেন কুরআনের মত বিস্ময়কর হয়, তা যেন হয় কুরআনের মত জ্ঞানপূর্ণ এবং তা যেন সূক্ষ্মতা, তীক্ষ্ণতা ও হুকুম-আহকামে পরিপূর্ণ হয়। এ রকম একটি মাত্র সূরা তৈরি করে আন। আর তাতে এমন কোন শর্তও আরোপ করা হয়নি যে তা সূরা বাকারার মত দীর্ঘ হতে হবে। সূরা কাওসারের মত একটি সূরা তৈরি কর যা লিখতে এক লাইনের চেয়েও কম জায়গা লাগে। এরপর আরো অধিক কমিয়ে এনে বলা হয়েছে–

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صٰدِقِيْنَ

সূরা কিংবা আয়াত না হয় থাক। 'তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তবে কুরআনের অনুরূপ একটি বাণী অন্তত উপস্থাপন কর।' কিন্তু তারা তা উপস্থাপন করতে পারেনি। লোকজন তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়েছে, তাঁকে

গালাগাল করেছে, তাঁর সমালোচনা করেছে কিন্তু কুরআনের অনুরূপ কিছু তৈরি করার মত এই স্পষ্ট পদ্ধতি কেন তারা গ্রহণ করেনি? তাহলে সকল ঝগড়ার অবসান হয়ে যেত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইলমী মুজেযার সবচেয়ে বড় মুজেযা হল কুরআন। আর মুজেযার অর্থ হল, এমন কোন কিছু উপস্থাপন করা যার সাথে তুলনাযোগ্য কিছু প্রদর্শন করতে পৃথিবী ব্যর্থ হয়ে যায়, অপারগ হয়ে যায়।

ইলমী মুজেযা দান করার হেকমত

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাজারো আমলী মুজেযা দেয়া হয়েছে। তবে তাঁকে দেয়া সবচেয়ে বড় মুজেযা, ইলমী মুজেযা। অন্যান্য নবীগণকে শুধু আমলী মুজেযা দেয়া হয়েছে। ঈসা (আ.)কে মৃতকে জীবিত করার মুজেযা দেয়া হয়েছিল। মুসা (আ.)কে লাঠি ও হাত উজ্জ্বল হয়ে যাওয়ার মুজেযা দেয়া হয়েছিল। ইবরাহিম (আ.)কে আগুনে প্রজ্জ্বলিত না হওয়ার মুজেযা দেয়া হয়েছিল। ইউসুফ (আ.)কে তাঁর জামার মুজেযা দেয়া হয়েছিল। তাঁর জামা অন্ধ পিতা ইয়াকুব (আ.)-এর চোখে লাগাবার সাথে সাথে দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল। দাউদ (আ.)কে লোহার মুজেযা দেয়া হয়েছিল। তাঁর হাতে লোহা মোমের মত গলে যেত। এমনিভাবে বিভিন্ন নবী-রাসূলকে বিভিন্ন প্রকারের আমলী মুজেযা দেয়া হয়েছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাজারো আমলী মুজেযা দেয়া হয়েছিল। সবচেয়ে বড় যে মুজেযা দেয়া হয়েছিল তা হল ইলমী মুজেযা অর্থাৎ কুরআন।

ইলমী মুজেযা হওয়ার কারণে কুরআনের প্রভাব ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। আমরা জানি, কোন আমলকারী যখন পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় তখন তার আমলসমূহ আর অবশিষ্ট থাকে না। ব্যক্তির বিদায়ের সাথে সাথে তার কাজসমূহেরও বিদায় ঘটে। কিন্তু আলেম যখন দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন তখন ইলম বিদায় গ্রহণ করে না, ইলম অবশিষ্ট থাকে। মুজেযা মূলত নবুওয়াতের প্রমাণ বা দলিল। পূর্ববর্তী নবীগণের মুজেযাসমূহ আমলী ছিল বলে তাঁদের বিদায়ের সাথে সাথে সেসব মুজেযারও বিদায় ঘটেছে। সুতরাং কারোরই নবুওয়াতের দলিল বর্তমানে

অবশিষ্ট নেই। কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলমী মুজেযা দেয়া হয়েছে, আর আলেমের বিদায়ের সাথে সাথে ইলমের সমাপ্তি ঘটে না। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেও তাঁর নবুওয়াতের দলিল অদ্যাবধি বিরাজমান বিধায় তাঁর নবুওয়াতও বিরাজমান। এজন্যই আপনি বলতে পারেন না যে, মুসা (আ.)-এর নবুওয়াত গ্রহণ কর এবং তাঁর উপর আমল কর। কেননা তাঁর তিরোধানের সাথে সাথে তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণেরও সমাপ্তি ঘটেছে। প্রমাণ বিদ্যমান না থাকায় তাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারছি না বিধায় আমল করতে বলতে পারছি না। পক্ষান্তরে আমরা নবুওয়াতে মুহাম্মদী গ্রহণ করতে এবং তার উপর আমল করতে বলতে পারছি। কেননা তার প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। তা হল ইলমী মুজেযা কুরআন। কুরআনের উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ পূর্বের মতই আজও বিদ্যমান রয়েছে।

মুহাম্মদী সত্তার বিস্ময়

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান ইলমী মুজেযা দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে। পবিত্র ইলম দ্বারাই রচিত হয়েছে তাঁর বরকতময় সত্তা। হাদীসে এসেছে–

اول ما خلق الله نورى

সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন।

এখানে 'নূর' তথা আলো দ্বারা চাঁদ-সূর্যের মত দৃশ্যমান নূর উদ্দেশ্য নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নূরের তুলনায় এগুলো অনুল্লেখযোগ্য পর্যায়ের গৌণ। নূরে মুহাম্মদী হল হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐ সত্তা যা ইলমের খামিরা দ্বারা তৈরি। যার মূল বিষয় ইলম। সুতরাং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্তা প্রকৃতপক্ষে ইলম। তাঁর সত্তা ইলমে পূর্ণ, তাঁকে প্রদত্ত মুজেযা ইলমী মুজেযা, তাঁর উম্মতকেও ইলমী উম্মত বানানো হয়েছে। এটা কুরআনের বরকতেই হয়েছে। ইমাম আওজায়ী (রহ.) লেখেন, 'অধিক পরিমাণে লেখালেখি এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য। দুনিয়ার অন্য কোন উম্মতের মধ্যে এত লেখালেখি পাওয়া যাবে না যা এই উম্মতের মধ্যে পাওয়া যাবে।' এক দুই

হাজার কিংবা এক দুই লক্ষ নয়, কোটি কিতাব আজ পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এ কিতাব বিরাজমান রয়েছে। গ্রন্থাগারসমূহ সমৃদ্ধ রয়েছে। মিসরের গ্রন্থাগার, স্পেনের গ্রন্থাগার, ইরাকের গ্রন্থাগার ইসলামী কিতাবের ভাণ্ডার ছিল। স্পেনের খৃষ্টানদের বিপ্লবের সময় যখন ইসলামী হুকুমত ধ্বংস হয়ে গেল তখন তারা মুসলমানদের সাহিত্য সংস্কৃতি ও জ্ঞান ভাণ্ডারকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিল। ইসলামের অস্তিত্ব বিলীন করে দেয়ার মানসেই তারা এ সিদ্ধান্ত নিল।

এক ইতিহাস লেখিকা স্পেনের ইতিহাস লিখেছেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন– 'মুসলমানদের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জ্ঞানকে নির্মূল করার জন্য স্পেনের খৃষ্টান সরকার মুসলমানদের গ্রন্থাগারসমূহকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেয়। এজন্য তারা স্বতন্ত্র কর্মী বাহিনী নিয়োগ করে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে। স্বতন্ত্র ইনচার্য অফিসার নিয়োগ দেয়। পঞ্চাশ বছর বসে এ কর্মী বাহিনী সমগ্র গ্রন্থাগার ধ্বংস করতে সক্ষম হয়।'

একটি মাত্র দেশের এতগুলো গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব দ্বারা অনুমান করা যায় যে লেখালেখি ও সংকলনের জগতে মুসলমানদের অবস্থান কত ঊর্ধ্বে।

তাতারীদের আক্রমণে বাগদাদের মুসলিম খেলাফত যখন ধ্বংস হয়ে গেল এবং তাতারীরা বিজয় লাভ করল তখন তারা দেখতে পেল যে, বিশাল দজলা নদীর উপর নির্মিত সেতু ভেঙ্গে দিয়ে মুসলমানরা বাগদাদ শহর রক্ষার চেষ্টা করেছিল। বাগদাদ বিজয়ের পর তারা সেতুটি পুনরায় নির্মাণ করার পূর্বে মুসলমানদের একটি গ্রন্থাগার লুট করে তার কিতাব দিয়ে দজলা নদীর উপর একটি রাস্তা নির্মাণ করে। কিতাব ফেলে নির্মিত সে রাস্তা এতটাই প্রশস্ত ছিল যে একাধিক গাড়ি তাতে অনায়াসে পাশাপাশি চলতে পারত।

পরবর্তীকালের লেখকগণ বলেন, ঐ কিতাবসমূহের কালি পানিতে মিশে পানি এতটাই কালো হয়ে গিয়েছিল যে, এক মাস পর্যন্ত লোকজনের কালির প্রয়োজন পড়েনি। দজলার পানিই কালির কাজ দিত। যে জাতির একটি দেশের একটি শহরের একটি গ্রন্থাগারের অবস্থা এই, অনুমান করা যায় সে জাতির সার্বিক লেখালেখির অবস্থা কেমন। বাগদাদে কতগুলো গ্রন্থাগার ছিল? স্পেনে কতগুলো গ্রন্থাগার ছিল? আরবে কতগুলো গ্রন্থাগার

ছিল? মিসরে কতগুলো গ্রন্থাগার ছিল? স্বয়ং আপনাদের পাকিস্তানে কতগুলো গ্রন্থাগার আছে? এ দেশের সিন্ধু ও অন্যান্য এলাকায় বহু গ্রন্থাগার রয়েছে। সে কিতাব আজ শুধু পোকায় কাটছে। তার কোন পাঠক লেখক আজ নেই। হাজারো কিতাব রয়েছে। কিতাবের ভাণ্ডার রয়েছে। এগুলোর সবই মুসলিম আলেমগণ লিখেছেন। আর এ কিতাবসমূহের সবই জ্ঞানময় পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা। প্রত্যেক কিতাবের শুরুতে কোন না কোন আয়াত রয়েছে যার ভিত্তিতে বিষয়ের আলোচনা শুরু করা হয়েছে।

সুতরাং কুরআন শরীফ এতটাই মহান ইলমী মুজেযা যে, লাখো গ্রন্থাগার তৈরি হয়েছে, লাখো ব্যক্তি আলেম হয়েছেন। কিতাব ও কুতুবখানার কোন সীমা পরিসীমা নেই। সেই কুরআন নিয়ে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করেছেন তাঁর ইলমের বিশালতা কেমন? তাঁর নবুওয়াতের স্তর কত ঊর্ধ্বে? তাঁর তালিম কেমন মহান মহান হবে? নিজের সম্পর্কে তিনি বলেছেন–

بعثت معلما

আমাকে শিক্ষক করে প্রেরণ করা হয়েছে।

আর তিনি কুরআনের মাধ্যমে তালিম দিয়েছেন। কুরআন দুনিয়াব্যাপী ইলমের বিস্তার ঘটিয়েছে। বড় বড় উলামা সৃষ্টি করেছে।

কুরআন অন্যকেও মুজেযার অধিকারী করে

আমি বলি, কুরআন নিজেই শুধু মুজেযা নয়; অন্যকেও মুজেযার অধিকারী করে দেয়। মুজেযা সৃষ্টি করে। খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) এ কুরআনের উপর চলেই তো খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী হয়েছেন। আকাবির ওলীগণ এ কুরআনের পথে চলেই তো ওলীআল্লাহ হয়েছেন। আর এ ধারা কেয়ামত পর্যন্ত চলতেই থাকবে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সত্তার মধ্যে এত ইলম রাখা হয়েছিল যে, কেয়ামত পর্যন্ত তা শেষ হবার নয়। আলেম, সুফী, মুহাদ্দিস ও ফকিহগণ থেকে যে ইলম প্রকাশ পাচ্ছে তা তাঁরই ইলম। এ তো তাঁর ইলমের দিক। তাঁর তরবিয়াত ও শিক্ষা এই ছিল যে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার সাহাবীকে

নমুনা বানিয়ে রেখে গেছেন। শিষ্যদেরকে নিজের অনুরূপ করে গড়ে তোলা কোন মুরব্বী ও শিক্ষকের পরম সাফল্য বলে বিবেচ্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবীদেরকে এমনভাবে গড়েছেন যে, এক একজন যেন সমগ্র উম্মতের সমগ্র পৃথিবীর সমতুল্য। সিদ্দিকে আকবর (রা.)কে দেখুন, সমগ্র উম্মতের তুল্য। উমর ফারুক (রা.)-এর দিকে তাকান, সমগ্র জগতের তুল্য। উসমান গনি (রা.)-এর দিকে তাকান, একাই সমগ্র পৃথিবীর সাথে তুলনাযোগ্য। আলী (রা.)কে দেখুন, একাই এক বিশ্ব।

হাদীসে এসেছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– আল্লাহ তাআলা সমস্ত উম্মতকে এক পাল্লায় রেখেছেন এবং আমাকে অপর পাল্লায় রেখেছেন– আমার পাল্লা ঝুঁকে পড়েছে। সমস্ত উম্মতের চেয়ে আমার ঈমান, ইলম ও আমল ভারী প্রমাণিত হয়েছে। অতঃপর বলেন, এরপর আল্লাহ তাআলা এক পাল্লায় আবু বকর সিদ্দিক (রা.)কে রাখলেন এবং অন্য পাল্লায় সমগ্র উম্মতকে রাখলেন, সিদ্দিকে আকবরের পাল্লা ঝুঁকে পড়ল। ইলম, আমল ও আখলাকের দিক দিয়ে সমস্ত উম্মতের চেয়ে তিনি ওজনদার প্রমাণিত হলেন। পুনরায় ঐ পাল্লায় উমর ফারুক (রা.)কে বসানো হল এবং অপর পাশে সমস্ত উম্মতকে রাখা হল, ফারুকে আযমের পাল্লা ঝুঁকে পড়ল।

আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.)-এর মত অজস্র নমুনা তিনি তৈরি করে গেছেন যাদের এক একজন পুরো জগতের সমান প্রমাণিত হয়েছেন। এ ছিল তাঁর তালিম ও তারবিয়াতের প্রভাব। সিদ্দিকে আকবার, ফারুকে আযম, উসমান গনি, আলী মুরতাজা, খালেদ সাইফুল্লাহ, আবদুর রহমান ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)সহ বহু সাহাবীর নাম প্রসিদ্ধ হয়েছে। নাম প্রসিদ্ধ হোক বা না হোক, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সান্নিধ্য যাঁরা লাভ করেছেন, যাঁরা সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন তাদের প্রত্যেকেই অন্য সকল উম্মত হতে শ্রেষ্ঠ। উম্মতের সকল কুতুব, বড় বড় গাউস সম্মিলিতভাবেও 'সাহাবিয়াত'-এর সীমায় পৌঁছতে পারবেন না। সাহাবীদের কলবে যে ইখলাস ও মারেফাত ছিল অন্যদের কলবে তা থাকতে পারে না। একমাত্র দীনই হয়ে গিয়েছিল তাঁদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

সাহাবীগণের মর্যাদা

হাদীসে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একজন সাধারণ সাহাবীর ঘটনা। তিনি কোন আলেম বা ফকীহ ছিলেন না। পেশায় ছিলেন কৃষক। তিনি হালচাষ করা অবস্থায় সংবাদ পেলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকাল হয়েছে। হাল ছেড়ে দিয়ে তিনি দুআ করার জন্য হাত তুললেন। বললেন, হে আল্লাহ! আমার এ চোখ ছিল আপনার রাসূলকে দেখার জন্য, আমার কান ছিল আপনার নবীর কথা শোনার জন্য। যখন আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে নেই তখন এ চোখ কান দিয়ে কী করব! আমার চোখ অন্ধ করে দিন, আমার কান বধির করে দিন। আল্লাহ তাআলা তাঁর দুআ কবুল করলেন। সাথে সাথে তিনি অন্ধ ও বধির হয়ে গেলেন।

এ সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সৌন্দর্য অবলোকন করা ও বাণী শ্রবণ করাকে স্বীয় চোখ ও কানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। যে কওমের অবস্থা এই যে, আলেমের মধ্যেও গণ্য নয় এমন একজন সামান্য ব্যক্তির সকল শারীরিক ক্ষমতার চরম উদ্দেশ্য মারেফাত, আল্লাহমুখিতা ও ইখলাস হয়ে গেছে সে কওমের চেয়ে বড় কোন নমুনা আর কে তৈরি করতে পারবে? এমনি করে নিজের এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নমুনা তৈরি করে গেছেন। এটা ছিল তাঁর তালিম ও আখলাকের পূর্ণতার বহিঃপ্রকাশ। সাহাবীগণের যাঁকেই দেখুন ইলম ও আমলের মূর্তপ্রতীক মনে হয়। সাহাবাদের কলবের যে গতি ছিল উম্মতের কোন স্তরের মধ্যেই তা নেই। এজন্যই শ্রেণীগত দিক দিয়ে পবিত্র কুরআন যদি কোন শ্রেণীকে পবিত্র সাব্যস্ত করেছে তো সাহাবীদেরকেই করেছে। তাদের পুরো শ্রেণীকে সম্মানিত ও পবিত্র সাব্যস্ত করে বলেছেন–

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ، وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا.

আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে

সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কানন-কুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। [তাওবা : ১০০]

শ্রেণীর পর শ্রেণী, স্তরের পর স্তর আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি তাঁর সন্তুষ্টির ঘোষণা করছেন। কোন শ্রেণীর মধ্যে খুঁত থাকলে কিংবা খারাবী থাকলে তার প্রতি কখনোই সন্তুষ্টি প্রকাশ করতে পারেন না। আর ঘোষণা যেহেতু এসেছে কুরআনে এবং কুরআন কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে তাই رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ অর্থাৎ 'আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট'– এ ওয়াদাও কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এতে বুঝা গেল, এ আয়াত অবতীর্ণের পর এমন কোন মুহূর্ত আসতে পারে না যাতে সাহাবীদের মধ্যে এর ব্যতিক্রম কিছু ঘটাতে পারে। সর্ব অবস্থাতেই তাঁরা মনোনীত থাকবেন। কেয়ামত পর্যন্তই তাঁরা পছন্দনীয় থাকবেন। তা না হলে কুরআনের আয়াত ভুল প্রমাণিত হবে। সুতরাং শ্রেণীগতভাবে যাঁদের পবিত্রতা ও বুযুর্গীর কথা বর্ণিত হয়েছে তাঁরা হলেন একমাত্র সাহাবীগণ। আল্লাহ বলেন–

أُولٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَنِعْمَةً

আল্লাহর অনুগ্রহ ও নেয়ামতের বদৌলতে তারাই সৎকর্মশীল। [হুযুরাত : ৭-৮]

আল্লাহ তাআলা যাদেরকে সৎকর্মশীল বলে আখ্যায়িত করেন তাদের সৎকর্মশীলতার ব্যাপারে আর কী কথা থাকতে পারে?

কেউ যদি বলে যে, 'প্রথমে তো তাদের অবস্থা তেমনই ছিল কিন্তু পরবর্তীতে (নাউযুবিল্লাহ) তাদের মধ্যে দীনের প্রতি কিছু বিদ্বেষতার সৃষ্টি হয়েছে।' এমন আপত্তির সম্ভাবনাকেও কুরআন মিথ্যা ও বাতিল সাব্যস্ত করে দিয়েছে। বর্ণিত হয়েছে–

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ عَظِيْمٌ

তারাই হল ঐ সমস্ত ব্যক্তি যাদের অন্তরকে আল্লাহ তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহান প্রতিদান। [হুযুরাত : ৩]

প্রথমেই আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিয়েছিলেন। আর যারা আল্লাহর পক্ষ হতে পরীক্ষিত তাদের ভেতরে খুঁত থাকতে পারে না। তা না হলে পরীক্ষা ভুল প্রমাণিত হবে। যাই হোক, পুরো শ্রেণীকে পবিত্র সাব্যস্ত করা শুধু সাহাবীদেরই শান। আর সাহাবীগণ হলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইলম ও আমলের নমুনা। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اصحابى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم

আমার সাহাবীগণ নক্ষত্র সমতুল্য। তাদের মধ্য থেকে যারই অনুসরণ করবে, হেদায়েতের পথ পাবে।

অন্য এক হাদীসে বলেছেন–

الله الله اصحابى لا تتخذوهم من بعدى غرضا.

আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তাদেরকে গালাগাল করো না। নিজের থেকে তাদের সমালোচনা করো না, তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয়। তাকওয়া অবলম্বন কর।

যাই হোক, হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইলম ও আমলের নমুনা ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.)। সুন্নতের অনুসরণের মধ্যেই তাঁরা ডুবে ছিলেন। তাদের আমলসমূহ দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত ও জীবনাচারের সন্ধান পাওয়া যায়।

উম্মতে মুহাম্মদীর মর্যাদাগত অবস্থান

এ পর্যন্ত আমি দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। একটি হল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতের মর্যাদা ও স্তর। অর্থাৎ ইলম আমল ও আখলাকের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর নবুওয়াতের অবস্থান সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। অপরটি হল নবুওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী ছিল?

তৃতীয় আরেকটি বিষয় হল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তালিম ও তারবিয়াতের ফলাফল কী ছিল? তার প্রভাব কতটা বিস্তৃত? এ

ক্ষেত্রে বলা যায়, তাঁর তালিম ও তারবিয়াতের প্রভাবও *পথ প্রদর্শকের* পর্যায়ের। তা এভাবে যে, ইলম ও আমলের লাখো নমুনা সৃষ্টি হয়েছে এবং তা শুধু সাহাবীগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তার বিস্তৃতি কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

مثل امتى كمثل المطر لا يدرى اوله خير ام اخره

আমার উম্মতের দৃষ্টান্ত বৃষ্টির মত– কেউ বলতে পারে না প্রথম দিকের বৃষ্টি জমিনের জন্য উপকারী, নাকি শেষের দিকের বৃষ্টি, না কি মধ্যবর্তী বৃষ্টি। উদ্দেশ্য এই যে, উম্মতের শুরু থেকে শেষাবধি সর্বত্রই কল্যাণ প্রত্যাবর্তনশীল। শুরুতেও কল্যাণ, মধ্যখানেও কল্যাণ, শেষেও কল্যাণ। মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য থাকবে। মর্যাদাগত পার্থক্য ভিন্ন বিষয়। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে কল্যাণ ও হেদায়াত পুরো উম্মতের জন্যই প্রযোজ্য। শেষেও সর্বোচ্চ নমুনা পাওয়া যাবে, মধ্যখানেও সর্বোচ্চ নমুনা পাওয়া যাবে, শুরুতেও পাওয়া যাবে।

এক হাদীসে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

انا اولها والمهدى وسطها والمسيح اخرها

> ঐ উম্মত কিভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে যার শুরুতে আমি রয়েছি, শেষে ঈসা রয়েছেন এবং মধ্যখানে রয়েছেন ইমাম মাহদী (আ.)।

কখনো বলেছেন–

لاتزال طائفة من امتى منصورين على الحق لا يضرهم من خاذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى امر الله

> আমার উম্মতের মধ্যে আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্যপ্রাপ্ত একটি জামাত সব সময়ই থাকবে (তারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আমি যা করেছি তাই তারা করতে

থাকবে, আমি যা বলেছি তাই তারা বলতে থাকবে, আমার উচ্চারিত ধ্বনি তারা উচ্চারণ করতে থাকবে)। কোন নিন্দাকারী ও বিরোধিতাকারী তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

কখনো আবার বলেছেন– 'সৎকর্মশীলগণের উত্তরাধিকারীদের থেকে সৎকর্মশীলগণ তৈরি হতে থাকবে। খলিফা বা উত্তরাধিকারী সৃষ্টি হতে থাকবে।'

তারা কী করবেন? অর্থ বিকৃতকারীদের বিকৃতিসমূহ দুর করবেন, বাতিল ও বাতিলপ্রিয়দের গোপন মিথ্যাচারের পর্দা উন্মুক্ত করতে থাকবেন। মূর্খদের মূর্খতাপ্রসূত ব্যাখ্যার স্বরূপ উন্মোচন করতে থাকবেন। সত্যকে সত্য এবং বাতিলকে বাতিলরূপে প্রমাণ করে দেখাবেন।

নবুওয়াতের প্রভাব এর চেয়ে বেশি আর কী হতে পারে যে, নবীর যমানায়ও নমুনা তৈরি হয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত তৈরি হতেই থাকবে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مأة من يجدد لها دينها

আল্লাহ তাআলা প্রতি শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ প্রেরণ করতে থাকবেন যারা দীনকে পরিচ্ছন্ন করতে থাকবে। দীন ও বেদীনের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে লোকজন যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে তারা তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবেন।

শতাব্দীর মাথায় আলাদা মুজাদ্দিদের ওয়াদা করা হয়েছে। শতাব্দীর মধ্যে সৎকর্মশীল প্রতিনিধির আলাদা ওয়াদা করা হয়েছে, পুরো উম্মতের মধ্যে 'সময়ের আলেম'-এর জন্য আলাদা ওয়াদা করা হয়েছে। সুতরাং এ উম্মত সামগ্রিকতার বিচারে, স্তর বিচারে ও সময় বিচারে কল্যাণে পরিপূর্ণ। সকল যুগকে সকল সময়কে কল্যাণে পরিপূর্ণ করে দেয়া– এ হল নবুওয়াতের প্রভাব। এসব কেবল তাঁর পক্ষেই করা সম্ভব যাঁর নবুওয়াতের মর্যাদাগত অবস্থান সবার উর্ধ্বে। যাঁর ইলম ও আখলাক সবার উর্ধ্বে।

অত্র মজলিসে আসার পূর্বে তালেবে ইলমদের উদ্দেশে কিছু আলোচনা করার মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও বিশেষত্বের বিষয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মজলিসে আসার পথে আমার কিছু প্রিয়জন বললেন, যদি নবুওয়াতের মর্যাদা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করি তা হলে হয়তো বেশি ভাল হয়। তাই আমি এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করলাম।

শেষ কথা

আমি দুটি হাদীস তেলাওয়াত করেছিলাম। উক্ত হাদীসদ্বয়ের মধ্যে নবুওয়াতের উদ্দেশ্য এবং নবী প্রেরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়েছে। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নবুওয়াতের মর্যাদা সম্পর্কেও আালোকপাত করতে হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে নবুওয়াতের প্রভাব বিষয়ে আলোচনা এসেছে। যাতে নবুওয়াতের মাহাত্ম্য ও বড়ত্ব স্পষ্ট হয়েছে। এজন্যই আমি তিনটি বিষয় পেশ করেছি– নবুওয়াতের মর্যাদা, নবুওয়াতের উদ্দেশ্য এবং নবুওয়াতের প্রভাব। এসব বিষয়াবলী প্রসঙ্গে এই মুহূর্তে স্মৃতিতে যা ছিল তা আলোচনা করেছি। আল্লাহ তাআলা এ উম্মতকে স্বীয় পয়গম্বরের অনুসারী করুন। কেননা অনুসরণের মাধ্যমেই ইলম ও আখলাক নসীব হতে পারে।

যদি এ উম্মত স্বীয় পয়গাম্বরের ইলম ও আখলাকের যে ধারা রয়েছে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে তারা ইলম থেকেও বঞ্চিত হবে এবং আখলাক থেকেও বঞ্চিত হবে। কেননা নবীর আস্তিন ছাড়া কোথাও ইলম মিলবে না। উত্তম আখলাকও তিনি ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না।

সুতরাং আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় কর্তব্য হল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আস্তিনকে আঁকড়ে ধরা, তা যেখানেই হোক আর যেভাবেই হোক। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে যাবেন তাঁর আস্তিনও সেখানে যাবে। আমাদেরকে ধুলোবালির মত আস্তিনের সাথে লেগেই থাকতে হবে। আশা করা যায় ঝেড়ে ফেলে দেবেন না। শত হোক নিজের ঘরেরই তো ধুলো। সুতরাং সংযোগ অবশ্যই স্থাপন করতে হবে, এটাই বড় কথা। মূল বুনিয়াদী বিষয় হল, অবিচ্ছেদ্য সংযোগ স্থাপন করা।

আপনারা দেখে থাকবেন, রেলগাড়িতে সবচেয়ে উন্নত হল প্রথম শ্রেণীর বগি। যাতে সম্পদ বা সম্মানে উঁচু ব্যক্তিবর্গ আরোহণ করে থাকেন। ঐ প্রথম শ্রেণীর বগিতে কর্মচারীদের জন্য একটি কম্পার্টমেন্ট থাকে। তাতে না আছে আরামদায়ক আসন, না আছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, না আছে কোন প্রকারের আরামের আসবাবপত্র। কর্মচারীদের সে কক্ষটি প্রথম শ্রেণীর সাথে সংযোগ স্থাপনের প্রভাব এই যে, প্রথম শ্রেণীর বগিটি যেখানে গিয়ে থামবে সেটিও সেখানেই যাবে। প্রথম শ্রেণীর সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের অবস্থান যেথায় হবে তাদের কর্মচারীদের অবস্থানও তথায় হবে। এটা ভিন্ন বিষয় যে, ধূলি ধূসরিত স্থানে তাদের জায়গা হবে, কিন্তু জায়গা তো হবে একই প্রাসাদে। কর্মচারীগণ বাইরে নিক্ষিপ্ত হবেন না।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্ব জগতের প্রথম শ্রেণীর আরোহী আর আমরা সবাই কর্মচারীর কক্ষে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাওয়ারী যখন জান্নাতে যাবে তখন এই গোলাম বাঁদীরা তাঁর সাথে সেখানেই যাবে। শর্ত হল, সংযোগ স্থাপিত থাকতে হবে। সংযোগ কায়েম রাখাই বড় নেয়ামত। ইলম ও আখলাক এ সংযোগের কারণেই আসবে। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আল্লাহ আমাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তালিম থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আখলাকে নববী থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কুরআন, হাদীস ও উলামায়ে রব্বানী থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।



বয়ান- ৩

আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলগণ হেদায়েতের জন্য উভয়ই আবশ্যক

পবিত্র কুরআন হল ইলমের আধার এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় সত্তা হল আমলের আধার। কুরআন যা বলেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছেন কুরআন তাই বলেছে। আমরা এও বলতে পারি– আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে দুটি কুরআন প্রেরণ করেছেন। এক হল ইলমী কুরআন যা কাগজে সংরক্ষিত রয়েছে। আরেকটি হল আমলী কুরআন তথা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় সত্তা। কাগজে সংরক্ষিত কুরআন হল ইলমের আধার এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় সত্তা হল আমল, আখলাক ও সাফল্যের আধার।





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ o وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ o اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌo

সম্মানিত সুধীবৃন্দ!

আপনাদের দাওয়াত পেয়ে আমি দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে একজন সামান্য তালেবে ইলমের মত এ দেশে উপস্থিত হয়েছি। আপনাদের সাক্ষাত ও সৌভাগ্য লাভের আশায় আমার আগমন। এ সুযোগে আমি আমার সাধ্যমত আপনাদেরকে উপকৃত করা এবং আপনাদের থেকে নিজে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করব। দীনি সাফল্যকে সমৃদ্ধ করা আমার উদ্দেশ্য। যাতে আমরা সীরাতুল মুস্তাকিমের উপর থাকতে পারি এবং বক্রতার পথ পরিহার করে ঐ পথে চলতে পারি যে পথের সন্ধান দিয়েছেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

দীনি ইতিহাসের অভিন্ন মূলনীতি

দীনি ইতিহাসের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে, আল্লাহ তাআলা হেদায়েতের দুটি পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। দুটির সমন্বয় ঘটলেই সরল পথের হেদায়াত নসিব হয় অন্যথায় পরিপূর্ণ গোমরাহী থেকে যায়। একটি হল আল্লাহর বিধান, যা আম্বিয়া (আ.)গণের পবিত্র কলবে আসমান হতে অবতীর্ণ হয়। তদীয় যুগের চাহিদা মাফিক আল্লাহ কিতাব অবতীর্ণ করেন। দ্বিতীয়টি হল ঐ ব্যক্তিত্ব যাঁর মাধ্যমে সে বিধানের পরিচয় লাভ হয়। হুকুমসমূহ জানা যায়, হুকুমসমূহের কারণ, ভিত্তি ও মাসআলাসমূহের দলিল জ্ঞাত হওয়া যায়। হেদায়াতের এই দুটি পদ্ধতি শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই ছিল। আদম (আ.)-এর ত্রিশখানা সহীফার সাথে নবী (আ.)কে প্রেরণ করেছেন। ইবরাহিম (আ.)-এর সহীফাসমূহের সাথে ইবরাহিম (আ.) প্রেরিত হয়েছেন। তাওরাতের সাথে মুসা (আ.), যবুরের সাথে দাউদ (আ.), ইঞ্জিলের সাথে ঈসা (আ.) প্রেরিত হয়েছেন। রাসূলগণ তাঁদের উপর অবতীর্ণ সহীফা ও কিতাবসমূহের অর্থ ও ব্যাখ্যা পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করেছেন। কোন আয়াত দ্বারা আল্লাহর কী উদ্দেশ্য তা ব্যক্ত করেছেন, বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। যখন সর্বশেষ আসমানী কিতাব কুরআন অবতীর্ণ হল তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সত্তাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন। যাতে কুরআনের হাকিকত ও আল্লাহর উদ্দেশ্য মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চারটি কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যাকে কুরআন এভাবে ব্যক্ত করেছে–

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ. وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

আল্লাহ হলেন তিনি যিনি নিরক্ষরগণের মাঝে তাদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেন, যিনি তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন, তাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। ইতোপূর্বে তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল। [জুমআ : ২]

আল্লাহ তাআলা একজন উম্মী তথা নিরক্ষরকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেন। তিনি কোন মকতব বা বিদ্যালয়ে পড়েননি। কোন নবীই কোন বিদ্যালয়ে পড়েননি। কেননা পৃথিবীতে তাদের আগমন জ্ঞান বিতরণের জন্য, জ্ঞান গ্রহণের জন্য নয়। আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তারা সরাসরি ইলম পেয়ে থাকেন। যাঁরা সরাসরি আল্লাহর ছাত্র হয়ে তাঁর থেকে ফয়েয অর্জন করেন তাঁরা অন্যের থেকে ফয়েয অর্জন করতে পারেন না।

আল্লাহর ছাত্র এবং মানব শিক্ষক

কুরআন শরীফে যখনই নবীগণের তালিমের ব্যাপারে আলোচনা এসেছে তখন তাকে আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আদম (আ.)-এর ব্যাপারে বলা হয়েছে–

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا

আল্লাহ আদম (আ.)কে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন।

এমনিভাবে ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্নের তাবিরের বিশেষ গুণের ব্যাপারে বলা হয়েছে–

وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ

আল্লাহ বলেন, আমি আপনাকে স্বপ্ন তাবিরের তালিম দিয়েছি।

হযরত দাউদ (আ.)-এর ব্যাপারে বলেছেন–

عَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَاْسِكُمْ

আমিই আপনাকে বর্ম তৈরি করার শিক্ষা দিয়েছি।

খিজির (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে–

وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا

আমি আমার পক্ষ হতে তাঁকে ইলম দান করেছি।

আর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে ইরশাদ করেন–

وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيْمًا

আপনি যা জানতেন না আল্লাহ আপনাকে তার তালিম দিয়েছেন। এটা আপনার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে অনেক বড় অনুগ্রহ ও পুরস্কার।

অন্যত্র ইরশাদ করেন–

اَلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا

'আমি আপনার প্রতি রূহ প্রেরণ করেছি।' এখানে ইলমকে রূহ বলা হয়েছে। এই রূহের দ্বারাই জাতি জীবন লাভ করে। অজ্ঞতা দ্বারা কোন জাতি জীবন্ত থাকতে পারে না। যে জাতি জীবন লাভ করেছে তারা ইলমের মাধ্যমেই লাভ করেছে। পার্থিব জীবন পার্থিব ইলম দ্বারা এবং পরকালীন জীবন পরকালীন ইলম দ্বারা পেয়েছে। জীবন সর্বদাই ইলমের আওতাধীন। অজ্ঞতা দিয়ে দুনিয়া ও আখেরাতের কোনটাই চলতে পারে না। এজন্যই আল্লাহ তাআলা ইলমকে 'রূহ' আখ্যায়িত করেছেন। ইলমই জাতির

জীবন। এরপর আল্লাহ বলেন– 'আপনি জানতেন না যে কিতাব কী এবং আপনার এও জানা ছিল না যে ঈমানের অর্থ কী। তবে আমি আমার পক্ষ হতে আপনার অন্তরে নূর ছড়িয়েছি, ইলমের রৌশনী ঢেলে দিয়েছি (যার দ্বারা আপনার কাছে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে)। এ নূর দ্বারাই আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করে থাকি।'

এমনিভাবে যেখানেই আল্লাহ তাআলা আম্বিয়া (আ.)দের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানেই নিজেকে শিক্ষকরূপে প্রকাশ করেছেন। নবীগণকে তাঁর শাগরেদ সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং যারা কোন মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি আল্লাহ তাআলার শিষ্য তাঁরা কিভাবে দুনিয়ার শিষ্য হবেন? তারা তো দুনিয়ার শিক্ষক হবেন।

হযরত ঈসা (আ.)-এর বয়স যখন পাঁচ বছর ছিল তখন তাঁর মা পড়ার জন্য তাঁকে মকতবে পাঠালেন। শিক্ষকের সামনে গিয়ে বসলে শিক্ষক বললেন, পড়ো 'আলিফ'। ঈসা (আ.) বললেন, আলিফের অর্থ কী? শিক্ষক বললেন, আলিফের কি কোন অর্থ হয় না কি?

হযরত ঈসা (আ.) বললেন, আপনি অর্থহীন জিনিসের তালিম দেয়ার জন্য বসেছেন? আপনি যেহেতু শিক্ষক, তাই আপনি যা বলেছেন তার অর্থও বলুন। যার অর্থ নেই তার তালিম কিভাবে হয়? তাহলে তো তা অজ্ঞতার তালিম হবে।

শিক্ষক সাহেব বিস্মিত হলেন। এ তো এক অদ্ভুত ছাত্র! আমার কাছে প্রশ্ন করে! শিক্ষক জানতে চাইলেন, আলিফের কি কোন অর্থ আছে?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, আছে।

শিক্ষক সাহেব এবার আলিফের অর্থ জানতে চাইলে হযরত ঈসা (আ.) তাকে শিক্ষকের জায়গা ছেড়ে ছাত্রদের সারিতে এসে বসতে বললেন। শিক্ষক জায়গা ছেড়ে ছাত্রদের সারিতে এসে বসার পর ঈসা (আ.) আলিফের অর্থ বললেন এবং আল্লাহ তাওহিদ ও আল্লাহর বড়ত্ব এমনভাবে প্রমাণ করলেন যে, শিক্ষক চরম আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। এতটুকু বাচ্চার পেট থেকে এ কি বুলি বেরোচ্ছে! সুতরাং নবী (আ.)গণ সরাসরি আল্লাহর ছাত্র বিধায় তারা জগতের শিক্ষক। তাঁরা কারো ছাত্র হওয়ার জন্য আগমন করেন না।

কুরআনের শব্দ ও অর্থ উভয়ই সংরক্ষিত

আল্লাহ তাআলা মানব জাতির হেদায়েতের জন্য বিধান গ্রন্থ আল কুরআন প্রেরণের সাথে সাথে তার অর্থ ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার জন্য হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেন। কুরআন আল্লাহ তাআলার বিধান হয়ে এসেছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষকরূপে আগমন করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন–

انما بعثت معلما

আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত।

পবিত্র কুরআনের শব্দসমূহ সরাসরি আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত। অন্যান্য আসমানী কিতাবকে 'কালামুল্লাহ' বলা হয় ব্যাপক অর্থে কিন্তু একমাত্র কুরআনই প্রকৃত অর্থে কালামুল্লাহ বা আল্লাহর কথা। কারণ কালাম বলা হয় কথকের কথা কে। কোন কিছু যখন বলা হবে বা উচ্চারণ করা হবে তখনই তা প্রকৃত অর্থে কালাম হবে। আসমানী কিতাব 'তাওরাতের' মধ্যে বলার ব্যাপার ঘটেনি, কাঠের টুকরায় লিখে হযরত মুসা (আ.)-এর কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। সুতরাং তাওরাত আল্লাহর কিতাব হলেও তাকে প্রকৃত অর্থে কালামুল্লাহ বলা যায় না, রূপক অর্থে বলা যায়। ইঞ্জিল শরীফকে আল্লাহ তাআলা লিখেও পাঠাননি এবং বলেও শুনাননি; বরং হযরত ঈসা (আ.)-এর অন্তরে অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং তাকে 'আল্লাহ প্রেরিত বিষয়বস্তু' কিংবা আল্লাহর কিতাব বলা হবে। প্রকৃত অর্থে কালামুল্লাহ বলা হবে না।

কুরআনুল কারিমের পুরোটাই আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল (আ.)কে উচ্চারণ করে শুনিয়েছেন এবং জিবরাঈল (আ.) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুনিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা সমগ্র কুরআনের কথক হয়েছেন। আর কথকের কথাকে কালাম বলা হয়। লিখে দিলে বা অন্তরে ঢেলে দিলে তাকে রূপক অর্থে কালাম বলা হয়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- যখন আল্লাহ তাআলা কুরআনের বাণী উচ্চারণ করতেন তখন তার বড়ত্ব ও মহানতায় ফেরেশতাদের মধ্যে বেহুঁশী চলে আসত। জিবরাঈল (আ.)-এর হুঁশ থাকত। তবে তিনিও কিছু আত্মহারার মত হয়ে যেতেন। ফেরেশতাগণের হুঁশ ফিরে এলে তারা জিবরাঈল (আ.)কে জিজ্ঞেস

করতেন–

مَاذَا قَالَ رَبُّنَا

'আমার রব কী বলেছেন?'

তখন তিনি বলতেন–

قَالَ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ

তিনি সত্য বলেছেন, তিনি মহান ও শ্রেষ্ঠ।

কুরআনের প্রতিটি আয়াত আল্লাহ তাআলা তেলাওয়াত করেছেন। কেননা কালামুল্লাহ তাকেই বলা হয় যার শব্দ ও অর্থ আল্লাহর পক্ষ হতে আসে। কুরআনের কোন শব্দ ও অর্থের মধ্যে উম্মত তো দূরের কথা স্বয়ং রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কোন প্রকার সংস্কার সাধন করেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের শব্দাবলীর উপস্থাপক মাত্র। তদ্রূপ অর্থের ব্যাপারে তিনি শুধুই উপস্থাপক। আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কলবে যে অর্থ উদয় করে দিয়েছেন উম্মতের সামনে তিনি তাই পেশ করেছেন। সুতরাং শব্দের ব্যাপারেও তিনি বিশ্বস্ত এবং অর্থের ব্যাপারেও তিনি বিশ্বস্ত। পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে তিনি আল্লাহ প্রেরিত শব্দসমূহ উম্মতের কাছে পৌঁছিয়েছেন এবং আল্লাহ তাআলা যে অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন তাও তিনি উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

ওহী নাযিলের সূচনালগ্নে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় বার বার পড়তে থাকতেন তখন আল্লাহ ইরশাদ করেন–

لَاتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ

আপনি মুখ নাড়াবেন না, তাড়াহুড়ো করবেন না। [কিয়ামাহ : ১৭]

যেহেতু ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি এমন করতেন, তাই আল্লাহ তাআলা বলেন–

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ

এ কুরআন আপনার অন্তরে সঞ্চিত করার দায়িত্ব আমার এবং আপনার থেকে পাঠ করানোর দায়িত্বও আমার। এ বিষয়ে আপনি চিন্তা করবেন না।

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা কুরআনের শব্দকে সংরক্ষণ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তা পাঠ করানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর এ জিম্মাদারী পুরোপুরি আদায়ও করেছেন। আয়াতের এ অংশে শব্দ হেফাযতের কথাই বলা হয়েছে। কেননা এখানে قُرْآنَه শব্দ এসেছে। যার অর্থ কেরাত বা পাঠ। আর পাঠের সম্পর্ক শব্দের সাথে হয়ে থাকে। অর্থের পাঠ হয় না। এতে জানা গেল, কুরআনের শব্দসমূহ আল্লাহ কর্তৃক সংরক্ষিত। এতে কোন প্রকারের রদবদল সম্ভব নয়।

কুরআনের অর্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে বলা হয়েছে–

إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

নিশ্চয়ই এ কুরআনের বর্ণনার দায়িত্ব আমার।

আয়াতের এ অংশে কুরআনের অর্থ সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। কেননা বর্ণনা হয় অর্থের। শব্দের বর্ণনা হয় না, পাঠ হয়। এ আয়াতে কুরআনের অর্থ সংরক্ষণের গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে। এতে কোন রদবদল হওয়া সম্ভব নয়।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শব্দ ও অর্থ উভয় দিক দিয়েই বিশ্বস্ত। কোন প্রকারের সংকীর্ণতা ব্যতীত তিনি সে অর্থ বর্ণনা করেছেন। শব্দকে এজন্যই নাযিল করেছেন যে, কোন বিষয়ের হাকিকত শব্দের ভেতরেই লুকায়িত থাকে। শব্দের সামান্য হেরফের হয়ে গেলে অর্থের ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে যায়। আমি বলি শব্দ তো দূরের কথা, শব্দ উচ্চারণের স্বর ও ভঙ্গি পরিবর্তন হওয়ার দ্বারাই একই শব্দ বা বাক্যের সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পেয়ে থাকে। শুধু বলার ভঙ্গি পরিবর্তনের দ্বারাই যখন অর্থের মধ্যে ভিন্নতা সৃষ্টি হয় তাই কাগজে লিখিত বিষয় সব সময় সঠিক অর্থ প্রকাশ করতে নাও পারে। এ ক্ষেত্রে হয়ত বক্তা নিজে এসে যথার্থ স্বরভঙ্গি প্রয়োগ করে বুঝাবেন, নয়তো তার থেকে জেনে নিয়ে কোন দূত এসে বুঝাবেন। যদি এর কোনটাই না হয়; বরং শুধু কাগজে লিখিত হয় তাহলে যেই ভঙ্গি ও ধরনটি প্রাধান্যযোগ্য মনে হবে আপনি সেই অর্থ বুঝে নেবেন। এটা কিন্তু বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ হবে না; আপনার

ক্ত অর্থ হবে। শব্দ আপনি কথকেরটা নিবেন কিন্তু অর্থ আপনি প্রয়োগ করবেন। এতে মিশ্রণ ঘটে যাবে। শব্দ আল্লাহর এবং অর্থ আপনার। সকল ভাষাতেই ভঙ্গি ও বাকপদ্ধতির ভিন্নতার কারণে অর্থ পাল্টে যায়। কুরআনও তার ব্যতিক্রম নয়।

আল্লাহ তাআলার উদ্দিষ্ট অর্থ সাহাবারাও বুঝতে পারেননি

হযরত আদি ইবনে হাতেম (রা.) ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য সম্মানিত সাহাবী। ইসলামের প্রথম যুগে রোযার বিধানে সারারাত পানাহারের অনুমতি ছিল না। ইফতারের পর ঘুমিয়ে পড়া থেকেই পরবর্তী রোযা শুরু হয়ে যেত। লোকজনের জন্য এটা কষ্টকর হয়ে পড়েছিল বিধায় আল্লাহ তাআলা রোযাকে আরো সহজ করলেন। ইরশাদ হল–

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ.

তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না কালো সুতা থেকে ভোরের সাদা সুতা স্পষ্ট হয়ে যায়। [বাকারা : ১৮৭]

হযরত আদি ইবনে হাতেম (রা.) বালিশের নিচে একটি কালো সুতা ও একটি সাদা সুতা রেখে দিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত দুটি সুতার রঙ আলাদা করে চেনা না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত পানাহার করলেন। অথচ সুবহে সাদেক হয়ে আগেই হয়ে গিয়েছিল। এ কথা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলে তিনি হযরত আদি (রা.)-এর কাছে কারণ জানতে চাইলেন। তিনি কুরআনের আয়াত উল্লেখ করে বলেন, এখানে তো কালো সুতা থেকে সাদা সুতাকে পার্থক্য করতে না পারা পর্যন্ত পানাহার করার কথা বলা হয়েছে। তাই আমি বালিশের নিচে দুই রঙের সুতা রেখে তা দেখে সাহরী খাওয়া শেষ করি। প্রতি উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

ان وسادتك لعريض

তোমার বালিশ বড়ই লম্বা চওড়া।

রাত দিন দুটোই এর মধ্যে এসে যায়। আল্লাহর বান্দা! এখানে خيط الابيض (সাদা সুতা) দ্বারা উদ্দেশ্য সুবহে সাদিকের শুভ্রতা এবং خيط الاسود (কালো সুতা) দ্বারা উদ্দেশ্য রাতের অন্ধকার। তুলা দিয়ে বানানো সুতা উদ্দেশ্য নয়।

আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে হযরত আদি (রা.) কিন্তু ভুল বুঝেননি। আভিধানিক অর্থ বিচারে সঠিক অর্থই বুঝেছেন এবং সঠিক আমলই করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য তা ছিল না। তাঁর উদ্দেশ্য রাত ও দিন। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্দিষ্ট লক্ষ্য বলে দিয়েছেন তখন তাঁর রোযা সঠিক বলে গণ্য হয়েছে।

কুরআনের নিজস্ব পরিভাষা

উপরিউক্ত আলোচনায় বোঝা গেল, শব্দের অর্থ ও ভাষার নিজস্ব বাকরীতি জানা থাকলেই কুরআনের অর্থ জানা যায় না, কুরআনের নিজস্ব পরিভাষাও জানতে হয়। কুরআন যদিও আরবী ভাষায় অবতীর্ণ কিন্তু বহু শব্দের মধ্যে কুরআন নিজস্ব অর্থ প্রয়োগ করেছে সেখানে আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য হয় না; বরং শরীয়তের পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য হয়। যেমন- সালাত শব্দটির অর্থ দুআ এবং রহমাত। ঘরে বসে কেউ পাঁচ ওয়াক্ত দুআ করে নিলে আভিধানিক অর্থে সে নামাযী হয়ে যায়। কিন্তু শরীয়তের পারিভাষিক অর্থে সে নামাযী হবে না। সালাতের আভিধানিক অর্থ দুআ প্রার্থনা হলেও এখানে বক্তার উদ্দেশ্য তা নয়। তাঁর উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কিছু কাজ। এমনিভাবে 'হজ' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'ইচ্ছা করা'। সুতরাং ঘরে বসে ইচ্ছা করলেই তো হাজী হয়ে যাওয়া যায়। কী দরকার দুই তিন লাখ টাকা খরচ করে আরব দেশে যাওয়ার? এমন করলে আভিধানিক অর্থ বিচারে তো হাজী হয়ে যাওয়া যায় কিন্তু কুরআনের হজ শব্দ দ্বারা আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। অন্য অর্থ উদ্দেশ্য। আরবী ভাষার এ শব্দটি কুরআন ব্যবহার করলেও আল্লাহ তাআলা তাতে নিজস্ব অর্থ প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কিছু কাজ করার নাম হজ। শুধু ইচ্ছা করার নাম হজ নয়। এখানে আভিধানিক অর্থকে বাতিল করা হচ্ছে না, আভিধানিক শব্দ নিয়ে পরিভাষা তৈরি করা হচ্ছে। একে বলা হয় منقول اصطلاحى বা

পারিভাষিক রূপান্তর। অর্থাৎ শব্দকে প্রচলিত অর্থে ব্যবহার না করে তাতে নিজস্ব অর্থ জুড়ে দেওয়া। এক্ষেত্রে শিক্ষক এসে অর্থ না বলে দেওয়া পর্যন্ত লোকজন প্রচলিত অর্থই বুঝাবে। যতক্ষণ না শিক্ষক এসে শিক্ষা দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর উদ্দিষ্ট অর্থ অপ্রকাশিত থাকবে।

শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা

পবিত্র কুরআনের আল্লাহ কর্তৃক উদ্দিষ্ট অর্থ বোঝানোর জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন। শুধু শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য হলে তাঁকে প্রেরণের প্রয়োজন পড়ত না; জিবরাঈল (আ.) কাবা ঘরের ছাদে কুরআন রেখে ঘোষণা করতেন, 'হে লোক সকল! তোমরা সবাই আত্মার রোগী, তোমাদের মধ্যে এ চিকিৎসা গ্রন্থ রেখে যাওয়া হল। তোমরা নিজেরাই নিজেদের চিকিৎসা করে নাও।' কিন্তু ডাক্তার কবিরাজ ছাড়া শুধু চিকিৎসাগ্রন্থ দেখে চিকিৎসা করার বিধান পৃথিবীতে নেই। গ্রন্থ মূলনীতি বলে দেবে, পরিমাণ বলে দেবে, প্রয়োগের মাত্রা শেখাবে, তুলনা করা শেখাবে কিন্তু শারীরিক অবস্থা নাড়ির স্পন্দন, পূর্বাপর বিবেচনা, মৌসুম প্রভৃতি তো গ্রন্থে থাকবে না, চিকিৎসককে বিবেচনা করতে হবে। চিকিৎসক ছাড়া চিকিৎসা সম্ভব নয়। একটি হল শারীরিক রোগ, তার জন্য প্রয়োজন শারীরিক চিকিৎসক। আরেকটি হল রূহানী রোগ, তার জন্য প্রয়োজন রূহানী চিকিৎসক। চিকিৎসক ছাড়া না অসুস্থ শরীর ভাল থাকতে পারে, না আত্মা ভাল থাকতে পারে। উভয় ক্ষেত্রে চিকিৎসকের আবশ্যকতা রয়েছে। সুতরাং আসমানী কিতাব হল চিকিৎসা গ্রন্থ এবং আম্বিয়া (আ.) হলেন চিকিৎসক। তাঁরা রূহানী চিকিৎসক। তাঁরা রূহের উত্থান-পতন বুঝে মতামত দেন এবং চিকিৎসা করেন।

কুরআনের অর্থ সংরক্ষণ

আল্লাহ তাআলা কুরআনে শব্দসমূহ সংরক্ষণের গ্যারান্টি দেয়ার সাথে সাথে তার অর্থকেও সংরক্ষণের গ্যারান্টি দিয়েছেন। ইরশাদ করেছেন–

ثُمَّ عَلَيْنَا بَيَانُهُ

কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দায়িত্ব আমার।

অর্থাৎ আয়াতের ব্যাখ্যার জ্ঞান আমি আপনার অন্তরে সৃষ্টি করে দেব এবং আপনি নিজের ভাষায় তা ব্যক্ত করবেন। আমরা যাকে হাদীস বলে থাকি তাও ওহী। হাদীস কুরআনেরই ব্যাখ্যা। কুরআনের প্রথম তাফসির হল হাদীস। হাদীস সম্পর্কে অবগত না হয়ে কখনোই কেউ মুফাসসির হতে পারে না। কুরআনের ভাষ্য মতেই হাদীস হল কুরআনের ব্যাখ্যা। আল্লাহ্ বলেন–

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

হে নবী! আমি আপনার কাছে এ উপদেশবাণী প্রেরণ করেছি, যাতে আপনি বিস্তারিতভাবে এর উদ্দেশ্য ও অর্থ বর্ণনা করতে পারেন।

আল্লাহ তাআলা এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে مبين তথা বর্ণনাকারী আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর অন্তরে যে অর্থ উদিত হত তিনি তাই বর্ণনা করতেন। সুতরাং কুরআনের আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে হাদীস দ্বারা প্রকাশিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা ও কর্মকাণ্ডে কুরআনের অর্থ নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

এ কারণেই হযরত আলী (রা.) যখন ইবনে আব্বাস (রা.)কে খারেজীদের মোকাবেলা করার জন্য যুক্তি তর্ক উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন তখন তাঁকে একটি ওসিয়ত করেছিলেন। বলেছিলেন, খারেজীদের সামনে কুরআন দিয়ে দলিল দিবেন না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত দিয়ে দলিল দিবেন। অর্থাৎ তাঁর কথা ও কাজ দিয়ে দলিল উপস্থাপন করবেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বিস্মিত হয়ে বললেন, আমিরুল মুমিনীন! কুরআনের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দুআ করেছেন। বলেছেন–

اللهم علمه الكتب والحكمة

হে আল্লাহ! ইবনে আব্বাসকে কুরআনের তালিম দিন এবং কুরআনের হেকমত তার অন্তরে ঢেলে দিন।

আমি তো কুরআনের হেকমতের ধারক, আর আমাকেই আপনি তা থেকে দলিল দিতে নিষেধ করছেন, এর কারণ কী?

উত্তরে আলী (রা.) বললেন, কুরআনের বাক্য নানাবিধ অর্থপূর্ণ সূত্রময় বাক্য। আপনি আপনার মত করে আয়াতের এক অর্থ বর্ণনা করবেন, বিরোধী পক্ষ আয়াতের এক অংশ ধরে অন্য অর্থ বর্ণনা করবে। সাধারণ মানুষ বলবে এরাও কুরআন পড়ছে, তারাও কুরআন পড়ছে। এতে করে সত্য স্পষ্ট হবে না। কিন্তু আপনি যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা ও কাজ দিয়ে দলিল গ্রহণ করবেন তখন তাতে কিছু বলার অবকাশ থাকবে না।

কুরআনের অর্থের ব্যাপারে নিজস্ব মতামত প্রদান

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা দেখিয়েছেন এবং বর্ণনা করেছেন তাই হল কুরআনের ব্যাখ্যা। অন্যভাবে বলা যায় কুরআনের ব্যাখ্যাই হল হাদীস। হাদীসকে অস্বীকার করে কুরআনের উদ্দেশ্য বোঝা সম্ভব নয়। হাদীস অস্বীকারকারীরা নিজেদের মনমত কুরআনের ব্যাখ্যা করার জন্যই হাদীসকে অস্বীকার করে। অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে হাদীস প্রতিবন্ধকতা আরোপ করে আর তারা চায় স্বাধীনতা। নিজেদের ইচ্ছেমত আয়াতের ব্যাখ্যা গ্রহণের পথ রুদ্ধ করে দেয় হাদীস। নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধির ভিত্তিতেই তারা হাদীসকে অস্বীকার করে থাকে। হাদীসকে পরিত্যাগ করে নিজেদের ইচ্ছেমত কোন কিছু করলে তা আর দীন থাকে না, ব্যক্তি মতামতের সমষ্টি হয়ে যায়। আর কুরআনের ব্যাপারে কারও ব্যক্তিগত মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

من قال فى القران برأيه فليستبرأ مقعده من النار

কুরআনের অর্থের ব্যাপারে যারা নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে তারা যেন জাহান্নামে নিজেদের ঠিকানা নির্ধারণ করে নেয়।

নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও লোকজন তাই করতে চায়। আমি বলি, নিজেদের উদ্ভাবিত মতামত গ্রহণ করার অধিকার তাদের তো দূরের কথা, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কখনো তা করেননি। এমন কখনো ঘটেনি যে, আয়াত নাযিল হয়েছে এবং একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থেকে তিনি সময়ের চাহিদামত একটি অর্থ গ্রহণ করেছেন। বরং আয়াত অবতীর্ণের পর তিনি আল্লাহ কর্তৃক তার ব্যাখ্যা অবতীর্ণের অপেক্ষা করেছেন। আল্লাহ ব্যাখ্যা জানিয়ে দেয়ার পরেই তিনি তা ব্যক্ত করেছেন।

কখনো কখনো দেখা গেছে, সাহাবীগণ কোন আয়াতের অর্থ জানতে চেয়েছেন কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এখনও আমাকে এর অর্থ বুঝিয়ে দেননি। অতঃপর যখন ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তার অর্থ ব্যক্ত করে দিয়েছেন তখন তিনি সাহাবীদেরকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরই যখন নিজস্ব মতামত গ্রহণ করার অধিকার ছিল না তখন অন্যদের এ অধিকার কিভাবে থাকে? তাদের মতামতের গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্বই বা কি হবে? তা তো ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার যোগ্য হবে।

সুতরাং মূল জিনিস হল কুরআনের শব্দ সম্ভার ও তার অর্থ। এ অর্থ ব্যক্ত করার জন্যেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন। এরই নাম তালিম। দুটি জিনিসের সমন্বয়ে কুরআন। একটি হল শব্দাবলী, যাকে আল্লাহ وَيَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ বলে ব্যক্ত করেছেন। আরেকটি হল কিতাবের তালিম। যাকে আল্লাহ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ বলে ব্যক্ত করেছেন।

হেকমতের তালিম

আল্লাহ কর্তৃক উদ্দিষ্ট অর্থ অবগত হওয়ার পরও কথা থেকে যায়। কারণ কুরআনের বাক্যে একাধিক অর্থ উদ্দেশ্য নেয়ার সম্ভাবনা যেমন রয়েছে, তেমনি মানুষের মাঝে রয়েছে নফস বা রিপু। এজন্যই মানুষের মাঝে এ চিন্তার উদ্রেক হতে পারে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আয়াতের এ উদ্দেশ্য নিয়েছেন কিন্তু আয়াতের ব্যাপকতার কারণে অন্য উদ্দেশ্য ও এ সম্ভাবনাও তো থাকতে পারে। এমন ভাবনা থেকে মানুষ

আসল উদ্দেশ্য হতে বিচ্যুত হয়ে যেতে পারে বিধায় রাসূলগণ আয়াতের তেলাওয়াত ও অর্থের তালিম দেয়ার সাথে সাথে তৃতীয় আরেকটি বিষয় 'হেকমত'-এর তালিম দিয়েছেন। হেকমত দুই প্রকার। প্রথম প্রকার– হেকমতে নাজরী, যার অর্থ হল উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দুআ। আর দ্বিতীয় প্রকার হল হেকমতে আমলী। যার অর্থ হল আমলের নমুনা দেখিয়ে দেয়া। তাই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু হুকুমই দেননি, আয়াতের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমল করেও দেখিয়েছেন যে আমলের নমুনা হল এই। যখন নমুনা সামনে এসে গেছে তখন অন্যান্য সকল সম্ভাবনা শেষ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য পরিপূর্ণরূপে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে, সম্ভাবনার পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলের দ্বারা বিধানাবলী নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। এজন্যই তিনি নামাযের বিধান উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেননি যে–

صلوا كيف ما اتفق

অর্থাৎ তোমাদের যেভাবে মনে চায় সেভাবে নামায পড়; বরং বলেছেন–

صلوا كما رأيتمونى اصلى

অর্থাৎ যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখ সেভাবে নামায পড়।

এমনিভাবে হজের নির্দেশ দিয়েছেন এবং কিভাবে হজ করতে হবে তা করে দেখিয়েছেন। শত্রুদের সাথে আচরণ কেমন হবে তার আমলী দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। আনন্দ মুহূর্তে করণীয়, কষ্টের মুহূর্তের করণীয়, পারিবারিক জীবনের করণীয়, সামাজিক জীবনের করণীয়– মোট কথা, সকল বিষয়ের বাস্তব দৃষ্টান্ত তৈরি করে গেছেন। কিছুই বাকী রাখেননি।

সুতরাং কুরআন হল সকল জ্ঞানের আধার এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় সত্তা হল সকল আমলের আধার। কুরআন যা নির্দেশ করেছে তিনি তাই করে দেখিয়েছেন এবং তিনি যা করে দেখিয়েছেন তাই ছিল কুরআনের নির্দেশ। এজন্যই যদি শুধু কুরআন সামনে থাকত তাহলে বহু সম্ভাবনার উন্মেষ ঘটত কিন্তু যখন আমলের

নমুনা সামনে এসে গেছে এবং বিশুদ্ধ বর্ণনা সূত্রে তা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তখন দ্বিতীয় কোন সম্ভাবনার অবকাশই আর অবশিষ্ট থাকে না। আয়াতের বিষয়বস্তু ইলমী ও আমলী উভয়ভাবে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে।

কুরআনের ব্যাপারে তিনটি বিষয় হল– শব্দ, অর্থ ও আমল। সবই স্পষ্ট, নির্দিষ্ট ও সংরক্ষিত। এরপর আরো একটি বিষয় রয়েছে। তা হল অন্তরের দৃঢ়তা। আয়াতের সবকিছুই জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও অন্তরে যদি বক্রতা ও একগুয়েমী থাকে তাহলে সবকিছুই ভুল বুঝবে। যতই সঠিক অর্থ বলা হোক না কেন অন্তরের দোষের কারণে তাদের তা বুঝে আসবে না। নাসারাদের বক্র দৃষ্টি নিয়ে কেউ যদি কুরআনের দিকে দৃষ্টিপাত করে তবে প্রত্যেক শব্দে নাসারাবাদের পথ সে দেখতে পাবে। কেউ যদি ইহুদী মানসিকতা নিয়ে কুরআন দেখে তবে মনে হবে প্রত্যেক আয়াত থেকে ইহুদীবাদ বেরিয়ে আসছে। কেননা তারা আয়াতের ব্যাপকতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের অন্তরে বিশ্বাস অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করবে।

আত্মশুদ্ধি এবং রাসূল (সা.)-এর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

অন্তরের বক্রতার কারণে যথার্থ বিষয় অনুধাবন করা যায় না বিধায় শব্দ, অর্থ ও আমলের নমুনা উপস্থাপন করার সাথে অন্তরের বক্রতা দূরীভূত করা ও আত্মিক দৃঢ়তা আনয়ন করা আবশ্যক। আর এজন্য মুজাহাদা, সাধনা, অধিক যিকির আযকার করা ও বেশি বেশি নফল ইবাদত করা আবশ্যক। এর দ্বারা কলব সঠিকভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় এবং আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত বিষয় সঠিক পদ্ধতিতে মানুষের অন্তরে এসে যায়। রাসূলের দায়িত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা ويزكيهم আয়াতাংশে এ কথাই বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তাদের আত্মাসমূহকে পরিশুদ্ধ করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দায়িত্ব পালন করেছেন, সাহাবীগণের আত্মশুদ্ধি করিয়েছেন। মক্কার জীবন প্রকৃতপক্ষে আত্মশুদ্ধির জীবন ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তের বছরের মক্কী জীবনে সাহাবীদের প্রতি এ নির্দেশ ছিল, যদি তোমাদের প্রতি কেউ কঠোর আচরণ করে তবুও জবাব দিও না। কেউ যদি মারে তবুও চুপ থাক। কেউ গালাগাল করলে জবাব দিও না। কাজ শুধু এতটুকু– সত্য

কালিমা বলতে থাক; যুদ্ধ, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও তর্ক বিতর্ক কর না। কুরআনে বলা হয়েছে–

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ

সংঘাতে না জড়িয়ে ক্ষমার আদর্শ গ্রহণ কর।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ

অর্থাৎ আপনাকে প্রশাসকরূপে তাদের কাছে প্রেরণ করা হয়নি, দীনের প্রতি দাওয়াত দাতা ও দীনের প্রচারকরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। সত্য পথে চলতে গিয়ে যদি কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় তবে তা সহ্য করে নিন।

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

উচ্চ মর্যাদাশীল রাসূলগণের মত আপনি ধৈর্য ধারণ করুন।

প্রতিশোধ না নিয়ে সবর ও সহ্যের পথ গ্রহণ করুন। সুতরাং দীনের পথে প্রথম সাধনা ও মুজাহাদা ছিল সকল প্রকার কষ্টকে সহ্য করে যাওয়া, 'উহ্' ধ্বনি পর্যন্ত উচ্চারণ না করা। প্রথমে এভাবে তাদের অন্তরকে শুদ্ধির দিকে নিয়েছেন এরপর তাদের দ্বারা পরিশ্রমপূর্ণ সাধনা করিয়েছেন। রাতে নফল ইবাদতে এবং দিনে তাসবীহ তাহলিলে নিয়োজিত রেখেছেন। স্বয়ং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের তত্ত্বাবধান করেছেন। সাহাবাদের রাতের জীবন কেমন, দিনের জীবন কেমন তা তিনি ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করতেন। সাহাবীদের পারিবারিক জীবন সঠিক আছে কি না, কারো ঘর থেকে খারাপ কোন আওয়াজ আসছে কি না তা দেখার জন্য তিনি রাত্রি বেলায় ঘুরে বেড়াতেন।

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন রাতের বেলায় হযরত আবু বকর (রা.)-এর ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন, তিনি এতই আস্তে কুরআন তেলাওয়াত করছেন যে, কান লাগিয়ে শোনাও দুষ্কর। তিনি সামনে এগিয়ে গেলেন। হযরত উমর (রা.)-

এর ঘরের কাছে গিয়ে দেখলেন, তিনি এত জোরে তেলাওয়াত করছেন যে, পুরো মহল্লায় আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ছে।

সকাল বেলা নবীর মজলিসে যখন তাঁরা হাজির হলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রা.)কে ডাক দিয়ে বললেন, তুমি এত আস্তে কেন তেলাওয়াত কর?

উত্তরে সিদ্দিকে আকবর বললেন–

يارسول الله لا ادعوا اصم ولاغائب

> হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি তো তাঁকে ডাকছিলাম যিনি অনুপস্থিতও নন এবং বধিরও নন। আমি তো সেই পরওয়ারদিগারকে ডাকছিলাম যিনি সর্ব অবস্থায় হাজির নাজির, আমার উচ্চ আওয়াজের কী প্রয়োজন?

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর (রা.)-এর কাছে অতি উচ্চ আওয়াজে পড়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি স্বভাবসুলভ বললেন–

اطرد الشيطان واوقض الوسنان

যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষ্য অনুযায়ী তিনি ছিলেন اشد هم فى امرالله عمر 'আল্লাহর ব্যাপারে কঠোরতম হলেন উমর'। সুতরাং তার আমলের মধ্যেও সে কঠোরতার প্রতিফলন রয়েছে। অপরদিকে আবু বকর (রা.) হলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষায়– ارحم امتى بامتى ابوبكر رض 'আমার উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক কোমল হল আবু বকর।' সবকিছুতেই তাঁর নম্রতা ও কোমলতা। তিনি তাঁর স্বভাব মত জবাব দিয়েছেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু বকর! তুমি তোমার আওয়াজকে একটু বাড়িয়ে দাও। উমর! তুমি তোমার আওয়াজকে একটু নিচু কর। এতে সমতার সৃষ্টি হবে। সংকীর্ণতা ও অতিরঞ্জনতা মুক্ত আমল হবে।

এটা জায়েয-নাজায়েযের মাসআলা ছিল না। জোরে পড়াও জায়েয আছে, আস্তে পড়াও জায়েয আছে। এটা ছিল অন্তরকে ঠিক করার মাসআলা। অন্তরের গতির সমতা বিধান ছিল উদ্দেশ্য। সংক্ষিপ্ততা ও বাড়াবাড়ি কোনটাই যেন না হয়। কারণ ইসলামের নীতি হল আখলাকের সমতা, আমলের সমতা, আকিদা-বিশ্বাসের সমতা। মোট কথা, সকল বিষয়ে সমতা বিধান করা।

সকল আমলে সমতা বিধান

আমলের ব্যাপারে বলা হয়েছে–

لا تشددوا فيشدد الله عليكم

আমলের ব্যাপারে কঠোর হয়ো না, তাহলে আল্লাহও তোমাদের প্রতি কঠোর হবেন।

সুতরাং আমলের ব্যাপারে কঠোর না হয়ে মধ্যম পন্থা গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়।

হযরত উম্মে সালমা (রা.) মসজিদে ইবাদত করতেন। তিনি ছাদের সাথে একটি রশি বেঁধে নিয়েছিলেন। একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাপারটি লক্ষ করে রশি ঝুলাবার কারণ জানতে চাইলে বলা হল, উম্মে সালমা (রা.) ইবাদত করার সময় যদি ঘুম আসে তাহলে রশির সাহায্য নেন, যাতে ঘুমে ঢলে না পড়েন এবং ইবাদতে রত থাকতে পারেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার কী প্রয়োজন, যখন ঘুম আসবে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়। لاتفريط فى النوم প্রয়োজনের চেয়ে কম ঘুমিও না। যতটুকু ঘুমের স্বভাবগত অভ্যাস রয়েছে তা পূরণ কর। সুতরাং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমলের মধ্যে সমতা রক্ষা কর। এত জোরে ছুটো না যে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাও এবং চলার শক্তি হারিয়ে ফেল।

অন্যত্র ইরশাদ করেন–

سدوا وقاربوا وروحوا واعدوا

অর্থাৎ নরমভাবে চলো, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, দিনের বেলায় আল্লাহর কিছু ইবাদত কর, রাতের বেলা আল্লাহর কিছু ইবাদত কর, তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী ইবাদত কর।

তিনি ইবাদতের ব্যাপারে উসূল বলে দিয়েছেন–

خير الاعمال ما ديم عليه وان قل

উত্তম ইবাদত হল ঐ ইবাদত যা সদা সর্বদা করা হয়, যদিও তা পরিমাণে অল্প হয়।

এক সাথে বহু পরিমাণে আমল করে ক্লান্ত হয়ে শেষে মাসভর বসে থাকা যেমন ভুল তেমনিভাবে এত অল্প পরিমাণে আমল করা যে তাতে আমলের উদ্দেশ্যই আদায় হয় না, তাও ভুল। এর একটি হল বাড়াবাড়ি অন্যটি হল সংকীর্ণতা। তাই মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাই কর্তব্য।

যাই হোক, ইসলাম সমতা ও মধ্যম পন্থা শিক্ষা দেয়। এ জন্যই সাহাবাদের প্রতি নজরদারী করতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর (রা.)-এর আওয়াজ কিছুটা নিম্ন করতে এবং আবু বক্র (রা.)-এর আওয়াজ কিছুটা উঁচু করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে সমতার সৃষ্টি হয়। এটা জায়েয-নাজায়েযজনিত মাসআলা নয়, অন্তরকে ঠিক করার মাসআলা। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তরের তারবিয়াত ও আত্মশুদ্ধিও করতেন।

অন্তরের ব্যাধির চিকিৎসা

সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে কখনো কোন বিষয়ে যদি খটকা লাগত তিনি সাথে সাথে তার চিকিৎসা করতেন। এগুলোর সম্পর্ক জায়েয নাজায়েযের সাথে ছিল না। অন্তরের অবস্থার সাথে সম্পর্কিত ছিল। কিছু সংখ্যক সাহাবী উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাদের মধ্যে ঈমান অবশিষ্ট নেই। আর ঈমান না থাকলে তো আমল গ্রহণযোগ্য নয়। ঈমান ও আমল পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঈমান না থাকলে আমল কবুলই হবে না।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারণ জানতে চাইলে তাঁরা বললেন, আমাদের অন্তরে এমন সব ওয়াসওয়াসার উদয় হয় যার দ্বারা ঈমান অবশিষ্ট থাকতে পারে না।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াসওয়াসার স্বরূপ জানতে চাইলে তাঁরা বললেন, মনে প্রশ্ন জাগে– পৃথিবী কে বানিয়েছেন? উত্তর মেলে 'আল্লাহ'। চন্দ্র-সূর্য কে বানিয়েছেন? আল্লাহ বানিয়েছেন; আসমান কে সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। এসব উত্তর থেকে একটি কথা দাঁড়ায়– অস্তিত্বমান সবকিছুর জন্য একজন অস্তিত্বদানকারীর, একজন উদ্ভাবকের আবশ্যকতা রয়েছে। প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য স্রষ্টা থাকতে হয়। স্রষ্টা ছাড়া কিছু সৃষ্টি হতে পারে না। সুতরাং আমাদের মনে এ প্রশ্ন জাগে যে, আল্লাহ তো অস্তিত্বমান, তাঁকে কে সৃষ্টি করেছেন? (নাউযুবিল্লাহ)। অন্তরে যখন এ ওয়াসওয়াসা আসে তখন ঈমান কি করে বাকী থাকে?

তিনি চিকিৎসা দিলেন, এক মিনিটের মধ্যে চিকিৎসা হয়ে গেল। বললেন, মনে যে এই ওয়াসওয়াসা আসে একে তোমরা ভাল মনে কর না খারাপ?

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, এতই খারাপ জানি যে জ্বলে পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া সহ্য হয় কিন্তু এ ওয়াসওয়াসা সহ্য হয় না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

ذاك صريح الايمان

এটাই তো ঈমান।

ঈমানই তো বলে দিচ্ছে এ ওয়াসওয়াসা খারাপ। যদি তাই না হত তবে অন্তর এ ওয়াসওয়াসাকে গ্রহণ করে নিত। তোমরা মনে করেছিলে ঈমান নেই। কিন্তু ঈমান ছিল বলেই তো ঐ ওয়াসওয়াসাকে খারাপ মনে হয়েছে। ঈমান না থাকলে কখনোই খারাপ জানতে না। এটাই ঈমানের আলামত। এক জায়গায় বলা হয়েছে–

من سرتك حسنتك وسائت سيئتك وانت مؤمن

সৎকর্ম করে যদি অন্তর খুশি হয় এবং খারাপ কাজ করে যদি অন্তর লজ্জিত হয় তবে তুমি মুমিন।

যদি সৎকর্ম আনন্দ না দেয় এবং অসৎকর্ম বেদনার সৃষ্টি না করে তাহলে বুঝতে হবে ঈমান নেই। তার সৎকর্ম একটি অভ্যাসময় রুসম মাত্র, সৎকর্ম নয়। সুতরাং মূল জিনিস হল অন্তর ঠিক হয়ে যাওয়া। যদি অন্তর ঠিক হয়ে যায় তবে সমস্ত শরীর ঠিক হয়ে যাবে।

হাদীসে বলা হয়েছে–

وفى الجد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله
واذا فسدت فسد الجسد كله الا وني القلب

মানব দেহের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে। যদি তা ঠিক থাকে তাহলে সমগ্র দেহ ঠিক থাকে। আর যদি সে মাংসপিণ্ডটি খারাপ হয়ে যায় তাহলে সমগ্র দেহ খারাপ হয়ে যায়। জেনে রেখ, সেটি হল কলব।

অন্তর যদি ভুল পথে পরিচালিত হয় তাহলে তার সকল কিছুই ভুল পথে চলবে। তার নিয়ত ভুল হবে, তার আমল ভুল হবে, তার ইচ্ছাসমূহ ভুল হবে, তার আবেগ ভুল হবে। মোট কথা, সবকিছু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভুলই হতে থাকবে।

নবীগণের দায়িত্বের বিষয়বস্তু

যেহেতু কলবই মানবদেহের মূল, সেহেতু নবী-রাসূলগণ নিজেদের দায়িত্বের কেন্দ্রবিন্দু করে নিয়েছিলেন মানব কলবকে। কলব ঠিক হয়ে গেলে পুরো শরীর ঠিক হয়ে যাবে। যেমনিভাবে দার্শনিকগণের কাছে বিবেচ্য বিষয় মানব মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক ঠিক হয়ে গেলে পুরো পার্থিব জীবন ঠিক হয়ে যাবে। চাই তাতে মানুষের জীবন বরবাদ হয়ে যাক, তাতে তাদের কিচ্ছু যায় আসে না। তারা মেধা নিয়ে কাজ করে এবং শুধু মেধাকেই ঠিক করে থাকে। তারা মেধা ব্যবহার করে কিছুটা সুখ সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারলেও মেধা দ্বারা কলব ঠিক হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কলব তো আল্লাহর যিকির, আল্লাহর স্মরণ দ্বারা সজ্জিত হয়। বুদ্ধির কাজ কলবকে ঠিক করা নয়।

সুতরাং দার্শনিকগণ মেধাকে বিবেচ্য বিষয় নির্ধারণ করেছেন এবং আম্বিয়া (আ.)গণ কলবকে বিবেচ্য বিষয় নির্ধারণ করেছেন। তারা কলবকে শুদ্ধ করেন যাতে পুরো মানুষ শুদ্ধ হয়ে যায় আর দার্শনিকগণ মেধাকে শুদ্ধ করেন। তাই তাতে কলব বরবাদ হয়ে যাক, চরিত্র ধ্বংস হয়ে যাক, আমলসমূহ নিষ্ফল হয়ে যাক তাতে তাদের কিছু যায় আসে না, সাময়িক সুখ সমৃদ্ধিই তাদের লক্ষ্য। কিন্তু তাতে কোন ফায়দা হয় না, না হয় দুনিয়া, না আখেরাত।

এ জন্যই নবীগণের প্রত্যেকেই পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীগণের সত্যায়নকে আবশ্যক সাব্যস্ত করেছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার উপর ঈমান গ্রহণ করা হবে না যতক্ষণ না মুসা (আ.)-এর উপর ঈমান আনবে, ঈসা (আ.)-এর উপর ঈমান আনবে। এমনকি আদম (আ.) থেকে শুরু করে সমস্ত নবীর উপর যতক্ষণ ঈমান না আনবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার উপর ঈমান গ্রহণ হবে না। যেমন ঘোষণা এসেছে–

قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَاُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ

তোমরা ঘোষণা সহকারে ডেকে ডেকে জানিয়ে দাও, আমরা আল্লাহর উপর ঈমান গ্রহণ করেছি এবং আল্লাহ যা আমাদের উপর নাযিল করেছেন তার উপর ঈমান গ্রহণ করেছি। আর ইবরাহিম (আ.) ইসমাঈল (আ.), ইসহাক (আ.), ইয়াকুব (আ.), মুসা (আ.) ও ঈসা (আ.)-এর উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে এবং সমস্ত নবী (আ.)-এর উপর আল্লাহর পক্ষ হতে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর ঈমান গ্রহণ করলাম। [বাকারা : ১৩৬]

সমস্ত নবী (আ.)-এর কথা উল্লেখের পর বলেছেন–

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ

আমরা তাঁদের মধ্যে কাউকে পার্থক্য করি না, সকলকে সমানভাবে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত মনে করি।

প্রত্যেক নবী উম্মতের জন্য তাঁর পূর্ববর্তী নবীর সত্যায়ন আবশ্যক করেছেন এবং প্রত্যেকেই অনাগত পরবর্তী নবীর ব্যাপারে উম্মতকে বলেছেন তাকে মান্য না করলে আমাকে মান্য করা হবে না। সুতরাং এ এক আশ্চর্য ধারাবাহিকতা যে প্রত্যেক পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীগণকে সত্যায়ন করেছেন এবং পূর্ববর্তীগণ পরবর্তীগণকে সত্যায়ন করেছেন। অপর দিকে দার্শনিকদের মধ্যে রয়েছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়। তাদের পরবর্তীগণ বলেন, আমার মতামতই সঠিক পূর্ববর্তী সকলে ছিল আহম্মক, তারা কিছুই সঠিক বলেননি। একজনে বললেন, পৃথিবী ঘূর্ণায়মান, সূর্য স্থির। আরেকজনে পরবর্তীতে বললেন, আগের মতামত ভুল ছিল, সূর্য ঘূর্ণায়মান পৃথিবী স্থির। আরও পরে এসে একজন বললেন, সূর্য ও পৃথিবী উভয়ই চলমান। আগের সব মতামত ভুল ছিল, সকলেই আহম্মক ছিল। তেমনিভাবে কেউ বলেছেন মহাবিশ্ব অনাদি ও সুপ্রাচীন, যারা একে নতুন সূচিত বলেছে তারা নির্বোধ। তেমনিভাবে দ্বিতীয় পক্ষও আবার প্রথম পক্ষকে নির্বোধ আখ্যায়িত করেছে। প্রত্যেকেই অপরকে নির্বোধ ও মূর্খ সাব্যস্ত করেছে। এর মানে এই যে, সকলেই নির্বোধ, সকলেই মূর্খ। যখন প্রত্যেকেই অপরকে নির্বোধ সাব্যস্ত করছে তখন জ্ঞানী আর কে রইল? যেন প্রত্যেকেই অপরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছে। আর মুসলমানদের ভিত সত্যায়নের উপর, মিথ্যার উপর নয়। সত্যায়নই ঈমানের নাম। অর্থাৎ মানার নাম ঈমান, না মানার নাম ঈমান নয়। না মানাকে কুফর বলে। আর মানার সম্পর্ক কলবের সাথে। এজন্যই হযরত আম্বিয়া (আ.) কলবের পথ গ্রহণ করেছেন, যেন কলবকে ঠিক করা যায়।

উম্মতের দায়িত্ব

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা আমার এই বলা উদ্দেশ্য যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর চারটি দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল– ১. আয়াতের তেলাওয়াত, ২. কিতাবের তালিম, ৩. আদর্শের তালিম এবং ৪. আত্মশুদ্ধি। উম্মতগণ সম্মিলিতভাবে স্বীয় রাসূলের স্থলাভিষিক্ত বিধায় উক্ত

চারটি দায়িত্বই তাদের উপর বর্তায়। তাদের দায়িত্ব হল প্রথমে আয়াতের তেলাওয়াত করা, কুরআন তেলাওয়াত করে শোনানো। এমন মাদরাসার ব্যবস্থা করা যাতে কুরআন শেখানো হবে। নাজেরা পড়ানো হোক বা হেফয পড়ানো তাতে কুরআনের শব্দাবলী সংরক্ষিত থাকবে। কেননা শব্দাবলীর মধ্যেই অর্থ নিহিত রয়েছে।

তারই সাথে সাথে উম্মতের মধ্যে মুয়াল্লিম বা প্রশিক্ষক থাকা আবশ্যক। কারণ দীনের ব্যাপারে ব্যক্তি মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআন বা হাদীস উদ্ধৃত হবে এবং সলফে সালেহীনের গণ্ডির মধ্যে থেকে কুরআনের অর্থ নির্দিষ্ট হবে। যদি সলফে সালেহীনের আস্তিন ছুটে গিয়ে ব্যক্তি মতামত প্রবেশ করে তাহলে নফসের কুমন্ত্রণার সৃষ্টি হবে, নফসের স্বাধীনতার সৃষ্টি হবে। এতে করে মানুষ আর দীনের অনুসারী থাকবে না, নফসের অনুসারী হয়ে যাবে। তাই নফসের কুমন্ত্রণা থেকে বিরত রাখার জন্য আল্লাহ কর্তৃক উদ্দিষ্ট অর্থের তালিম দেয়া আবশ্যক। তালিম ছাড়া তা সম্ভব নয়। কেননা তালিমদাতা বা মুয়াল্লিম বলা হয় তাকে যিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যকে বর্ণনা করেন।

কিতাবের তেলাওয়াত ও তালিমের সাথে সাথে আমলের আদর্শ বা নমুনাও আবশ্যক। আজ আমরা যে নামায পড়ছি তা এজন্যই সঠিক নামায যে, তা আমরা অন্যজন থেকে দেখে দেখে পড়ি। যদি নামাযীদের নমুনা আমাদের সামনে না থাকত তাহলে কখনোই আমরা সঠিক নামায পড়তে পারতাম না। মাসআলার সকল কিতাবও যদি আপনি পড়েন, রুকু-সিজদার অর্থও জানেন তথাপি ততক্ষণ পর্যন্ত নামায আপনার আয়ত্বে আসবে না যতক্ষণ না নামাযীর আকৃতি আপনার সামনে থাকবে। আকৃতি দেখেই নামাযের স্বরূপ জানা যায়। আপনি যদি শুধু কাগজ থেকে নামাযের স্বরূপ জানতে চান তাহলে হাজারো প্রকারের নামায হয়ে যাবে। কেননা মানুষের বুঝ বিভিন্ন রকমের বিধায় যে যার বুঝ অনুযায়ী আমল করবে। তাতে করে নামাযের হাজারো রূপ হয়ে যাবে। এক দীনের লাখো দীন হয়ে যাবে। এজন্যই এমনভাবে অনুসরণ করতে হবে যাতে নবীর আদর্শ ও আমল নির্দিষ্ট হয়ে যায়। আয়াতের অর্থের ক্ষেত্রেও আল্লাহ কর্তৃক উদ্দিষ্ট অর্থ ও উদ্দেশ্যই গ্রহণ করতে হবে, ব্যক্তি মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। যদি কুরআনের শুধু শব্দাবলী আপনার সামনে থাকে এবং কোন মুরব্বী ও

মুয়াল্লিম না থাকে তাহলে আপনার মন যাকে প্রাধান্য দেবে আপনি সেই অর্থটি গ্রহণ করবেন। সেটি আল্লাহর উদ্দেশ্য নাও হতে পারে। কিন্তু আয়াতের সেই অর্থটি বোঝা আবশ্যক যেটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ জানিয়েছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বুঝিয়েছেন তা সাহাবায়ে কেরাম বুঝেছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম সলফে সালেহীন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনকে যা বুঝিয়েছেন আপনারও তাই বোঝা আবশ্যক। এ ছাড়া আপনি আল্লাহ কর্তৃক উদ্দিষ্ট উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন না।

কিতাব এবং ব্যক্তিসত্তা উভয়ই আবশ্যক

কিতাবুল্লাহর সাথে সাথে কিতাবের নমুনা উপস্থাপকেরও আবশ্যকতা রয়েছে। শুধু কিতাব যথেষ্ট নয় আবার শুধু ব্যক্তিসত্তাও যথেষ্ট নয়। যদি শুধু ব্যক্তিসত্তা থাকে এবং কিতাব না থাকে তাহলে শরীয়ত ও গায়রে শরীয়ত একাকার হয়ে যাবে। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির কিছু মানবীয় অবস্থাও থাকে। যদি ব্যক্তির সবকিছু শরীয়ত হয়ে যায়, তাহলে মানবীয় অবস্থার সাথে শরীয়ত সংমিশ্রিত হয়ে মূল দীন অবশিষ্ট থাকবে না। তেমনিভাবে ব্যক্তির কিছু ভুল কথা ও ভুল হালাত থাকতে পারে। যেমন- কোন ব্যক্তি 'বিশেষ হালাতে' জযবা বশত এমন কথা বলল যা নিজের অবস্থা দৃষ্টে সঠিক কিন্তু তা বিধান নয় যে অন্যকে আপনি সেগুলো শেখাবেন। বিধান তো শুধু তাই যা আল্লাহর রাসূল বলেছেন।

মনসুর হাল্লাজের 'আনাল হক' বলাটা কোন বিধান নয় যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে লোকজনকে বলব যে তোমরাও 'আনাল হক' বল। অথচ আমরা তার দাবীকে সঠিক বলে থাকি। কারণ তিনি 'ফানাফিল্লাহ'-এর স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ফানাফিল্লাহর স্তরে পৌঁছে গেলে নিজের নফস উজ্জ্বল হয়ে যায়। নিজের নফসের দিকে দৃষ্টি দিলেও সেখানে আল্লাহর তাজাল্লী পরিদৃষ্ট হয়। এ অবস্থায় যদি কেউ 'আনাল হক' (আমিই ধ্রুব সত্য– আল্লাহ) বলেন তখন তার সামনে তার নফস আর থাকে না। সেখানে 'আমি'র কোন অস্তিত্বই নেই, সেখানে শুধু 'তুমি' আর 'তুমি'। যা কিছুই হোক- সর্বত্রই তুমি।

ہر چہ دیدم در جہاں غیرے تو نیست :: یا تو ئی یا خوئے تو یا بوئے تو

আমি পৃথিবীতে যা কিছুই দেখি না কেন তুমি ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। হয়তো তোমার সত্তা, না হয় তোমার গুণাবলী, না হয় তোমার কর্মকাণ্ড চোখে পড়ে।

আর এসব দিয়েই তো দুনিয়া আবাদ রয়েছে। মারেফাতের এই স্তরে যারা পৌঁছে যান তাদের নফসের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। তার সামন থেকে দুনিয়া নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, একমাত্র আল্লাহর নূরের তাজাল্লি তার সামনে থেকে যায়। সে বাইরের দিকে দৃষ্টি দিলে বলবে– انت الحق 'তুমি আল্লাহ'। নিজের দিকে তাকালে বলবে– انا الحق 'আমি আল্লাহ'। এ অবস্থায় 'আমি' শব্দও নিজের নয় এবং 'তুমি' শব্দও অন্যের জন্য নয়, 'হক'-এর প্রকাশই লক্ষ্য।

মনসুর হাল্লাজের জীবনকে আমরা সঠিক বলে জানি, কিন্তু তা বিধান নয়। শরীয়তই কেবল বিধান, যা অন্যকে শিক্ষা দেওয়া হবে। সুতরাং তরিকত হল ব্যক্তির অবস্থার নাম এবং শরীয়ত হল সাধারণ বিধানের নাম। অভিজাত কিংবা সাধারণ– প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য বিধানই হল শরীয়ত। ব্যক্তিগতভাবে যখন আপনি ঐ বিশেষ অবস্থায় পৌঁছে যাবেন তখন আমরা আপনাকে সঠিক জানবো, আপনাকে ইজ্জত করব, আপনার ঐ অবস্থাকেও সত্য মনে করব– কিন্তু তাকে বিধানরূপে উপস্থাপন করব না। প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থাই স্বতন্ত্র। তাদের একজনের অবস্থা অন্যজনের জন্য দলিল হতে পারে না। মোট কথা, সাধারণ বিধানই শরীয়ত। মঞ্চের উপর তাই উপস্থাপিত হবে। কোন ব্যক্তি তার নিজের অবস্থাকে উপস্থাপিত করবেন না, শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা ও কাজ উপস্থাপিত হবে। এগুলোই শরীয়ত। অন্য কারো কথা ও কাজ শরীয়ত নয়।

এ কারণেই যদি আমার কোন বিশেষ অবস্থা থাকে এবং তা সঠিক হয় তাহলে আল্লাহর নিকট আমি গ্রহণযোগ্য হব, আর যদি সঠিক না হয় তাহলে অগ্রাহ্য হব। এটা হবে ব্যক্তিগত বিষয়, শরীয়তের বিধান এটা নয়। এজন্যই শরীয়তের বিধানের প্রয়োজন পড়েছে এবং ব্যক্তিসত্তারও

প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যদি শুধু ব্যক্তি হত তাহলে খান্দান-পূজা ও ব্যক্তিপূজা শুরু হয়ে যেত। ব্যক্তি থেকে প্রকাশিত কর্মকাণ্ড শরীয়ত হয়ে যেত। এতে শরীয়ত ও শরীয়ত বহির্ভূত বিষয় একাকার হয়ে যেত। এ কারণেই ব্যক্তির অবস্থা যাচাইয়ের জন্য কষ্টি পাথরের ন্যায় কিতাবুল্লাহ্ রয়েছে। ব্যক্তির অবস্থা যদি কুরআন মাফিক হয় তবে তা গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় পরিত্যাজ্য।

সুতরাং ব্যক্তি সত্তা ও কিতাব উভয়ই আবশ্যক। রাসূলের আবশ্যকতাও রয়েছে এবং খোদায়ী বিধানের আবশ্যকতাও রয়েছে। শুধু বিধানও যথেষ্ট নয় এবং শুধু ব্যক্তিও যথেষ্ট নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্তা তো মাসুম কিন্তু পরবর্তীতে আগমনকারীদের সত্তা মাসুম নয়। ভুল বুঝ ও ভুল অবস্থা তাদের থাকতেই পারে। তাদের সবকিছু শরীয়ত হলে শরীয়ত ও গায়রে শরীয়ত একাকার হয়ে গিয়ে দীন আস্থা হারাবে। এজন্যই ব্যক্তিসত্তাকে কিতাবের মানদণ্ডে যাচাই করতে হবে এবং কিতাবের অর্থ ব্যক্তিসত্তা থেকে বুঝতে হবে। এভাবেই দীন চলবে এবং সঠিক হেদায়েতের পথে মানুষ পৌঁছবে।

সাহাবায়ে কেরাম এবং আল্লাহর ওলীগণ কি সত্যের মাপকাঠি

আমি আগেই আলোচনা করেছি যে, হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত হেদায়াতের জন্য এই দুটি পথ নির্ধারিত করা হয়েছে– আল্লাহর বিধান এবং আল্লাহ কর্তৃক গৃহীত ব্যক্তিসত্তা। তাঁরা হলেন নবীগণ, যাঁরা ছিলেন নিষ্পাপ।

আউলিয়ায়ে কেরামের সম্মান করা আবশ্যক। যদিও তারা মাসুম নন। কিন্তু আল্লাহর নৈকট্যশীলগণ এবং ওলীগণ অবশ্যই নিরাপদ থাকেন। আল্লাহর পক্ষ হতে তাদেরকে হেফাযত করা হয়। আল্লাহর তরফ থেকে অন্যায় কাজ হতে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখা হয়। যদিও তাদের সাথেও নফস রয়েছে কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে নফসের চাহিদামত পথে চলতে দেন না। আল্লাহর হেফাযত তাদের সঙ্গী হয়ে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভুল

বোঝার সম্ভাবনা থেকে যায়, ভুল আমল প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। আর 'সম্ভাবনা' যাতে রয়েছে তা আর অকাট্য হতে পারে না। দীন হল অকাট্য হুকুমের নাম, সন্দেহপূর্ণ ও সম্ভাবনার জিনিস নয়। এজন্যই নবীগণ পর্যন্ত তো ঠিক আছে যে, তাদের কথা ও কাজ শরীয়ত কিন্তু অন্যদের ব্যাপারে এ কথা প্রযোজ্য নয় যে, তাদের সব কথা ও কাজকে শরীয়ত সাব্যস্ত করা হবে।

সাহাবায়ে কেরাম শরীয়ত নির্মাণের ব্যাপারে মাপকাঠি নন। অর্থাৎ তারা শরীয়ত তৈরি করতে পারেন না, তাঁরা শরীয়তের অনুসারী। শরীয়ত তৈরির ব্যাপারে মাপকাঠি না হলেও দলগত দিক দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাহাবায়ে কেরামের জামাতকে মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন। কোন একটি দল বা জামাত হক না বাতিল তা সাহাবা (রা.)দের মাধ্যমে যাচাই করা হবে। হাদীসে বলা হয়েছে–

افترقت بنو ارسرائيل على ثنتين وسبعين فرقة

বনি ইসরাইল বাহাত্তর দলে বিভক্ত ছিল আর আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। كلهم فى النار الاواحده সকলেই আকিদা-বিশ্বাসের কারণে জাহান্নামী হবে, শুধু একটি দল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন–

من هم يارسول الله

হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তারা কারা?

ইরশাদ করলেন–

ما انا عليه اليوم واصحابى

আজ আমি যাতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছি এবং আমার সাহাবীগণ রয়েছেন।

সাহাবায়ে কেরামদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সত্তার সাথে শামিল করে নিয়েছেন। যাতে বুঝা গেল, দলগত দিক দিয়ে

কোন দল হকের উপর আছে এবং কোন দল বাতিল তা নিরূপনের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্তা যেমন মানদণ্ড, তাঁর পবিত্র সত্তার পরে সাহাবায়ে কেরামও তদ্রূপ মানদণ্ড। এজন্যই কোন দল বা সম্প্রদায়ের ব্যাপারে প্রথমে আমরা দেখব সাহাবায়ে কেরামের প্রতি তাদের ভালবাসা আছে কি না। যদি সাহাবাদের প্রতি তারা বিরূপ ভাবাপন্ন হয় তাহলে নিশ্চিতভাবে তারা বাতিল। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

من احبهم فبحبى احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم

যারা আমাকে ভালোবাসেন তারা সে ভালোবাসার কারণেই সাহাবায়ে কেরামকে ভালোবাসেন, যারা আমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে সাহাবায়ে কেরামের প্রতি তাদের শত্রুতা তৈরি হবে।

এতে বুঝা গেল, সাহাবায়ে কেরামের প্রতি আমাদের সম্পর্ক শুধু ইতিহাস ভিত্তিক নয়। অর্থাৎ তারা সঠিক সনদের ভিত্তিতে দীনের বর্ণনাসমূহ আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এবং আমরা তা কবুল করেছি। এক্ষেত্রে তাঁরা পূর্ণ আমানত ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক এতটুকুর মধ্যেই সীমিত নয়। এটা তো তাদের সাথে ইতিহাস ভিত্তিক সম্পর্ক। তাঁদের সাথে আমাদের সম্পর্ক এর চেয়ে বহু উর্ধ্বের। অর্থাৎ ইশক ও ভালবাসার সম্পর্ক। আমরা হযরত সাহাবায়ে কেরামের আশেক। আর আশেকের কাজ হল নিজ প্রেমাস্পদের ভেতর ডুবে যাওয়া। তারা তাদের সমালোচনা করেন না। পদে পদে ভুল ধরা, দুর্বলতা খুঁজে বেড়ানো– এসব আশেকের কাজ নয়। সাহাবাদের সাথে আমাদের মহব্বত ও ভালোবাসার সম্পর্ক, শুধুই ইতিহাস ভিত্তিক সম্পর্ক নয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখতে হবে ঐ দলের আকিদাসমূহ সাহাবায়ে কেরামের আকিদা-বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না। যদি সঙ্গতিপূর্ণ হয় তাহলে তারা সঠিক পথে রয়েছেন, যদি সঙ্গতিপূর্ণ না হয় তাহলে তারা বাতিলপন্থী।

এভাবেই কোন দলের পরিচয় নিরূপনে সাহাবায়ে কেরাম হলেন মাপকাঠি। তাদের কষ্টিপাথরে যাচাই করে জেনে নেব, কারা হক এবং কারা বাতিল। যারা শত্রুতা পোষণ করবে তারাও বাতিল, যারা ঘৃণা পোষণ করবে তারাও বাতিল, যারা গালাগাল করবে তারাও বাতিল। আর যারা ভালবাসবে এবং সম্মান প্রদর্শন করবে তারাই কেবল সঠিক দল বলে প্রমাণিত হবে।

সাহাবায়ে কেরামের তাকওয়ার পূর্ণতা

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সর্বসম্মত বিশ্বাস হলো–

الصحابة كلهم عدول

সকল সাহাবায়ে কেরাম মুত্তাকিন এবং ন্যায়পরায়ণ।

কুরআনে কারিম দলগতভাবে যে দলের পবিত্রতা ঘোষণা করেছে তা একমাত্র সাহাবা (রা.)দের দল। ইরশাদ হয়েছে–

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى

তারা হলেন ঐ সমস্ত ব্যক্তি যাদের অন্তরকে আল্লাহ তাআলা তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন।

সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের তাকওয়ার পূর্ণতার ব্যাপারে কুরআন সাক্ষ্য দিয়েছে।

এটা সম্ভব যে কোন কোন সাহাবীর ভুল হয়ে যেতে পারে। এমনকি সাধারণ সাহাবীদের থেকে গুনাহও হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তা তাকওয়ার পরিপন্থী নয়। একজন মুত্তাকিন ব্যক্তিও গুনাহ করতে পারেন। গুনাহ কেবল তখনই তাকওয়ার পরিপন্থী যখন তার মূল অন্তরে প্রোথিত থাকে।

অন্তরে তাকওয়া আছে, কিন্তু বাহ্যিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফেরে পড়ে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার পর অন্তর থেকে গুনাহকে ঘৃণা করা, তাওবা করা এবং লজ্জিত হওয়া তাকওয়ার পরিপন্থী নয়। সাহাবায়ে কেরামের বাতেনী তাকওয়ার ব্যাপারে কুরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে। সুতরাং তাদের যদি কোন আমলী ভুল হয়ে যায় তাতে তাকওয়ার বিন্দু পরিমাণ ক্ষতি হবে না। কুরআনেই বর্ণিত হয়েছে–

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ

মুত্তাকিনগণ শয়তানের সংস্পর্শের কারণে কখনো যদি গুনাহ করে তবে সাথে সাথে সতর্ক হয়ে যায় এবং তাওবা করে। শয়তান কর্তৃক স্পর্শ করা এবং স্বীয় প্রভাব বিস্তার করা সত্ত্বেও আল্লাহ বলেছেন, এরা মুত্তাকিন। সুতরাং সাহাবাদের আমলের মধ্যে কিছু ভুল ত্রুটি হয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয় কিন্তু খারাপ নিয়তে কোন অন্যায় কাজ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। পূর্ণ তাকওয়ার অধিকারী তাঁরা সব সময়ই ছিলেন। ইজতেহাদজনিত ভুল ত্রুটি হয়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

হযরত আলী (রা.) ও হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর মধ্যকার যুদ্ধের ব্যাপারে আমরা বলতে পারি যে, তা ছিল ইজতেহাদজনিত ভুল। শরীয়তের মূলনীতির ব্যবহারিক প্রয়োগের গবেষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকে ইজতেহাদ বলা হয়। ইজতেহাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে–

المجتهد يخطى ويصيب

> ইজতেহাদকারীর সিদ্ধান্ত সঠিক হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে। ভুল হলেও সওয়াব পাবেন এবং সঠিক হলে দ্বিগুণ সওয়াব পাবেন।

গুনাহর কাজ দ্বারা কখনো সওয়াব পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং বোঝা গেল, ইজতেহাদজনিত ভুল গুনাহ নয়। মুজতাহিদগণের সিদ্ধান্ত ভুল হোক বা সঠিক হোক সর্বাবস্থায় তাঁরা প্রতিদানযোগ্য হয়ে থাকেন। মাসআলার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ইজতেহাদী ভুল হয়েছে। যে ভুলের কারণে

যুদ্ধও হয়েছে। বাদানুবাদ ও তর্ক-বিতর্কও হয়েছে। কিন্তু উভয় পক্ষের আন্তরিক তাকওয়া যথাযথ বহাল ছিল। তাদের ভুল ত্রুটিগুলো ইজতেহাদজনিত ও চিন্তাজনিত। সুতরাং তাদের ভুলকে গুনাহ বলা পথহারা ও গোমরা হওয়ার আলামত।

কথায় কথায় আমার আলোচনা অনেক দূরে চলে গেছে। আমি বলছিলাম, সম্মিলিতভাবে এ উম্মত স্বীয় পয়গাম্বরের স্থলাভিষিক্ত। পয়গাম্বরের যে চারটি কাজ ছিল সে কাজ উম্মতের করা আবশ্যক। কাজগুলো হলো– কিতাবের তালিম, আত্মশুদ্ধির তালিম, আমলের তালিম ও আদর্শের তালিম। কুরআনের তেলাওয়াত সমগ্র উম্মতের জন্য ফরয। অর্থ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ঐ পরিমাণ জানা আবশ্যক যার দ্বারা আমরা দীন বুঝে দীনদার হতে পারি। সকলের আলেম হওয়া আবশ্যক নয়। এটা ফরযে কেফায়া। এক হাজার দুই হাজারের মধ্যে একজন আলেম হওয়াই যথেষ্ট। তবে পুরো উম্মত যদি আলেমশূন্য হয়ে যায় তাহলে সবাই গুনাহগার হবে। সকলের আলেম হওয়া যদিও জরুরি নয়, কিন্তু সকলের দীনদার হওয়া জরুরি। আর দীনদার হওয়ার জন্য এতটুকু ইলম থাকা আবশ্যক যার দ্বারা আমরা আমাদের দৈনন্দিনের আমলসমূহ ঠিকমত করতে পারি। আমরা নামায কিভাবে পড়ব, যাকাত কিভাবে আদায় করব, রোযা কেমন করে রাখব, হজের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত কী– এতটুকু জানা থাকা বাধ্যতামূলক। বাচ্চাদের জন্যও এতটুকু তালিমের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। চাই তা মাদরাসার আকৃতিতে হোক, সোসাইটির আকৃতিতে হোক কিংবা ব্যক্তিগতভাবে একক আকৃতিতে হোক।

তালিম ও তারবিয়াতের স্তর

দীন শেখার সর্বোত্তম পদ্ধতি হল তালিম। শিক্ষক নিজের সান্নিধ্যে রেখে শিক্ষা দিবেন। নিজের রঙে রঞ্জিত করবেন। এতে তাকওয়া তার অভ্যাসে পরিণত হবে। এটাই সর্বোত্তম পদ্ধতি এবং আম্বিয়া (আ.)গণেরও পদ্ধতি এটাই ছিল। এজন্যই সাহাবাদেরকে 'সাহাবা' বলা হয়, যার অর্থ সান্নিধ্য প্রাপ্ত। এ কারণেই সলফে সালেহীনদের পরিভাষায় ছাত্র বুঝাতে আসহাব শব্দটি ব্যবহার হত। যেমন আসহাবে আবু হানিফা, আসহাবে শাফেঈ,

আসহাবে মুহাম্মাদ প্রভৃতি। এতে সান্নিধ্য প্রাপ্তির ইঙ্গিত থাকত। তাঁরা শুধু কিতাবই পড়েননি; বরং সান্নিধ্যের দ্বারা কলবের রঙও বদলে ফেলেছেন।

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عٰبِدُوْنَ

আমরা আল্লাহর রঙ গ্রহণ করেছি। আল্লাহর রঙের চেয়ে উত্তম রঙ আর কার হতে পারে? আমরা তাঁরই ইবাদত করি। [বাকারা : ১৩৮]

সুতরাং উত্তম পদ্ধতি হল তালিম। এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে লেখালেখি ও সাহিত্য। সে ক্ষেত্রে বুঝিয়ে দেয়ার মত কেউ থাকতে হবে। অন্যথায় ব্যক্তি নিজ ইচ্ছামত বুঝ গ্রহণ করবে। আকিদা, আখলাক, ঈমান প্রভৃতি বিষয়ে বহু বইপত্র মাতৃভাষায় লিখিত হয়েছে। এগুলোর পাঠ ও সঠিক মর্ম উদ্ধার আবশ্যক। লেখালেখির চেয়ে নিম্ন পর্যায়ে অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরে রয়েছে মা-বাবার শিক্ষা। এটাও অত্যন্ত আবশ্যকীয়। কেননা শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা পাথর খোদাইয়ের মত অন্তরে স্থায়ী হয়ে যায়। বৃদ্ধকাল পর্যন্ত শৈশবের আমলের অভ্যাস অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং মা-বাবার শিক্ষাই মূল শিক্ষা। মায়ের কোল তো শিশুদের প্রথম মাদরাসা। যদি মায়ের কোল ইলমশূন্য হয় তাহলে বাচ্চার কাছে কী পৌঁছবে? বাবা নিজেই যদি মাসআলা না জানেন তাহলে সন্তান কী পাবে?

সন্তানের তারবিয়াত

আপনাদের এখানে (আমেরিকায়) সকলের মধ্যেই আমি এ চিন্তা দেখেছি যে, সন্তান সন্ততি যেন খারাপ না হয়ে যায়, তাদের মধ্যে যেন ঈমান থাকে। সর্বত্রই আমি এ চিন্তা দেখেছি এবং খুব খুশি হয়েছি। আমেরিকার যেসব শহরে আমি গিয়েছি সবখানেই প্রত্যেকের অন্তরে এ চিন্তা লক্ষ করেছি। সবাই চায় সন্তানরা দীনের উপর থাকুক। তারা এর জন্য পথ খুঁজে বেড়ায়। আমি বলেছি, অন্তরে এ চিন্তা থাকা আল্লাহর পক্ষ হতে এক বড় পুরস্কার, একটি বড় নেয়ামত। কিন্তু তার সাথে সাথে এও আবশ্যক

যে, শুধু সন্তানের চিন্তাই নয়, নিজেদের চিন্তাও থাকা আবশ্যক। আপনি যা করবেন সন্তানরা তাই অনুকরণ করবে। স্বভাবগতভাবেই বাচ্চারা অনুকরণ প্রিয়। আপনি নামায পড়লে তারাও রুকু সিজদা করতে শুরু করবে। আপনি যা বলবেন তারাও তা বলার অনুশীলন করবে। আপনি গালাগাল করলে তারা আপনাকে গালি দিতে শুরু করবে।

সন্তানদের ব্যাপারে আপনাদের এই চিন্তা সম্পূর্ণ সঠিক চিন্তা। কিন্তু এই চিন্তা তখনই পূর্ণতা পাবে যখন নিজেদের ব্যাপারেও চিন্তা করবেন। নিজেরাও সঠিক পথে থাকতে চাইবেন। নিজেদের ভাল হওয়া দ্বারা সন্তান ভাল হবে, নিজেদের খারাপ হওয়া দ্বারা সন্তান খারাপ হবে।

دین ملو کہم

মানুষ নিজেদের বাদশাহর পথ-পদ্ধতি গ্রহণ করে।

মা-বাবাই তো ঘরের শাসক। তাদের মত করেই সন্তানরা বেড়ে উঠবে। সুতরাং কিছু তেলাওয়াত, কিছু তালিম, কিছু আমলী নমুনা, কিছু আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। শিক্ষা ও উপদেশের সাথে সাথে কিছু বিধি-নিষেধেরও আবশ্যকতা রয়েছে। তবেই কিছু হওয়া সম্ভব।

হাদীসে এসেছে–

لا ترفعو عصا

সন্তানদের থেকে কখনো লাঠি ত্যাগ কর না।

এর উদ্দেশ্য হল তারা যেন সব সময় তোমাদের নজরদারীতে থাকে। চাই তারা বৃদ্ধ হয়ে যাক, তবু তাদের প্রতি উপদেশ ও শিক্ষা জারী রাখ। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ

উপদেশ দাও, কেননা উপদেশ মুমিনদের জন্য উপকারী।



বয়ান ৪

ইলমী মুজেযা

প্রত্যেক বিষয়ের বিষয় ভিত্তিক আলেম ও কামেল ব্যক্তি তৈরি হয়েছেন। যাদের মাধ্যমে উলামাগণের সাফল্য প্রকাশ পেয়েছে। তাদের ইলমের সামনে দুনিয়ার বিবেক বুদ্ধি পরাজিত হয়েছে। কুরআন নিজে মুজেযা হওয়ার সাথে সাথে অন্যকেও মুজেযার অধিকারীরূপে গড়ে তোলে। এ কুরআন মুসলমানদের মধ্যে মুজেযার শক্তি তৈরি করেছে। এ কুরআন ছেড়ে দিলে আমরা মুজেযা শক্তি থেকে বঞ্চিত হব। উম্মতের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। কুরআনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করলেই কেবল উম্মতের শক্তি ও প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধার হবে।





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ○

বুযুর্গানে মুহতারাম।

আজকের জলসার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আপনারা অবগত আছেন। দারুল উলুম ইসলামিয়া মাদরাসার শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্রদের মাঝে সনদ ও পুরস্কার বিতরণ করা হবে। যাতে মাদরাসার দীনি খেদমতের ফলাফল আপনাদের সামনে এসে যায়। অন্য কথায় বলা যায়, কুরআনে কারিমের খেদমতের ধারাবাহিকতার ফলাফল ও বরকত সামনে উপস্থাপন করা এবং বর্ণনা করা এ জলসার আলোচ্য বিষয়। এজন্যই আমি পবিত্র কুরআন সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করতে চাই। মহান আল্লাহ তাআলার সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমি খুবই কমজোর ও দুর্বল এবং শারীরিকভাবে কিছুটা অসুস্থ। আর ইলমের দিক দিয়ে আমার জানাশোনা খুবই সামান্য। তবে এসব সত্ত্বেও যদি আল্লাহ তাআলা সাহায্য করেন এবং আপনাদের আকাঙ্ক্ষার বরকত যদি সংযুক্ত হয় তাহলে হয়তো কিছু কথা বলতে পারব।

কথার গুরুত্বের মাপকাঠি

প্রথমে জেনে রাখুন, কোন কথার গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা তার বক্তার দ্বারা হয়ে থাকে। বক্তা যে পর্যায়ের তার কথার গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা আপনার কাছে সে পর্যায়ের হবে। আরবীতে একটি প্রসিদ্ধ কথা আছে–

قدر الشهادة بقدر الشهود

সাক্ষ্যের গুরুত্ব সাক্ষ্যদাতাদের দ্বারা হয়ে থাকে।

যদি সাক্ষ্যদাতা ন্যায়পরায়ণ ও সত্যবাদী হয় তাহলে তার সাক্ষ্যও সত্য হয়। যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার সাক্ষ্যও তদ্রূপ হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, একই কথা যদি এমন দু'জন ব্যক্তি বলে যাদের একজন গুরুত্বহীন ব্যক্তি এবং অপরজন গুরুত্বপূর্ণ তাহলে প্রথমজনের কথার গ্রহণযোগ্যতা বহুলাংশে কমে যায়। কিন্তু সেই একই কথা দ্বিতীয়জন বললে তার গ্রহণযোগ্যতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

মানুষের স্বভাবগত কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তার কথা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এর মধ্যে প্রথম বিষয় হল ইলম। বক্তা যখন আলেম হবেন তখন তার

কথায় ইলমের বিচ্ছুরণ থাকবে। কথার মাধ্যমে তার জ্ঞানের পরিধি প্রকাশ পাবে। মূর্খ ব্যক্তির কথার মধ্যে মূর্খতা ফুটে উঠবে। শ্রোতার কাছে তার অজ্ঞতা প্রকাশ পেয়ে যাবে। সুতরাং কারো কথার গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে ইলমই অগ্রগণ্য।

দ্বিতীয় বিষয় হল বুদ্ধি ও বুঝ। জ্ঞানপূর্ণ কোন কথাও যদি নির্বোধ ব্যক্তি উপস্থাপন করে তাহলে তার বেয়াকুফীর কারণে সে কথা তুচ্ছতায় রূপ নেয়। শ্রোতার মনে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

তৃতীয় বিষয় হল, মর্যাদা ও সামাজিক অবস্থান। যিনি কথা বলছেন তার পদমর্যাদা ও পরিচিতি যদি উন্নত হয় তবে তার কথাও উন্নত মর্যাদা পাবে।

চতুর্থ বিষয় হল তার কথা যদি অন্যের থেকে নকলকৃত হয় তবে বর্ণনাসূত্র ও ঐতিহাসিক ভিত মজবুত হতে হবে। যদি বর্ণনাসূত্র না থাকে, বর্ণনাকারী সঠিক না হয় তাহলে তা সঠিকভাবে না পৌঁছাই স্বাভাবিক। যদি পৌঁছেও তবে অসম্পূর্ণরূপে পৌঁছবে। সুতরাং এই চারটি বিষয়ের ভিত্তিতেই ব্যক্তির কথা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কম ইলমের অধিকারী ব্যক্তির কথার প্রতি লোকজনের মনোযোগ কম আকর্ষিত হয়। যেমন- কোন বাচ্চা ছেলে যদি কোথাও কোন আলোচনা রাখে তবে তার কথার মধ্যে তোতলামী থাকবে, ভুল-ত্রুটি হবে, শব্দের অপূর্ণতা থাকবে এবং শ্রোতারাও তা শুনে হাসাহাসি করবে। কিন্তু সাথে সাথে এও বলবে, বাচ্চা মানুষ, কী-ই-বা জানে আর কী-ই-বা বলবে! এভাবেই তার কথা গুরুত্ব হারাবে। আপনি হয়তো তাকে বাহ বাহ জানাবেন, খুব প্রশংসাও করবেন। কিন্তু এগুলো হবে তার উৎসাহ বাড়ানোর জন্য, তার কথার গুরুত্বের জন্য নয়।

যদি ইলম থাকে কিন্তু তা যদি হয় অসম্পূর্ণ তাহলেও তার কথা অসম্পূর্ণ বিবেচিত হয়। মহিলাদের কথা সাধারণত অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে থাকে। কেননা তাদের ইলম ও জ্ঞান উভয়ই অপূর্ণ। إلا ماشاء الله তবে আল্লাহ যাদেরকে ব্যতিক্রম করেছেন তাদের বিষয়টি ভিন্ন। নারীদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ আলেম হয়েছেন, বহু ফযিলতপূর্ণ হয়েছেন। যেমন- ইসলামে বহু নারী আলেম হয়েছেন, বহু ফযিলতের অধিকারী হয়েছেন। তাদের মধ্য থেকে

মুহাদ্দিস অতিবাহিত হয়েছেন, সাহিত্যিক অতিবাহিত হয়েছেন। কিন্তু তা হাজারে এক দুই জন। সাধারণভাবে তারা ইলম, দীন ও জ্ঞানের দিক দিয়ে অপূর্ণ হয়ে থাকেন। এজন্য তাদের মাথায়ও অপূর্ণতা পরিলক্ষিত হয়।

নারীদের কথার গুরুত্বহীনতার কারণ

কুরআনের একটি আয়াতে নারীদের জ্ঞান ও বুদ্ধির অপরিপক্বতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যখন কথা কাটাকাটি হয় তখন স্ত্রী এক নাগারে বলতেই থাকে। স্বামী দলিল প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন করতে থাকে কিন্তু স্ত্রী তার একই বুলি আওড়াতে থাকে। যাকে কুরআন এভাবে উল্লেখ করেছে–

اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِى الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ

এখানে নারীদেরকে 'অলংকারে লালিত' ও 'তর্কে অপারগ' আখ্যায়িত করা হয়েছে। (তর্কে অপারগতা দ্বারা যথাযথ যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপনমূলক তর্ক বুঝানো হয়েছে।) যারা শিশুকাল থেকে অলংকারের ঝংকারের মধ্যে লালিত হয় তাদের অন্তরে স্বর্ণ-রৌপ্যই অধিক প্রবিষ্ট হয়, জ্ঞান-গরিমা খুব বেশি থাকে না। একেবারে শৈশবেই কান ছিদ্র করে বালা পরানো হয়। আরেকটু বড় হলে নাক ছিদ্র করে তাতে নাকফুল দেয়া হয়। আরেকটু বড় হলে গলায় রূপার চেন পরানো হয়। আরো বড় হয়ে বিয়ে-শাদী হয়ে গেলে হাত পায়ে রীতিমত সোনা-রূপার বেড়ি পড়ে যায়। মাথা থেকে পা পর্যন্ত শুধু অলংকারের বন্ধন। এজন্যই তার সমস্ত ধ্যান-ধারণা, শখ-আহ্লাদ ও প্রবল ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে যায় স্বর্ণ-রৌপ্য। নারীদের মাধ্যমেই এ রোগ পুরুষের মধ্যে ছড়ায়। পুরুষ একা হলে স্বর্ণ-রৌপ্যের প্রতি বেশি মনোযোগী হয় না। যাই হোক, অন্তরে যখন স্বর্ণ-রৌপ্য প্রবিষ্ট হয়ে যায় তখন তাতে ইলমের ধারণক্ষমতা কম হয়ে যায়, বিবেক বুদ্ধির ধারণ ক্ষমতা কম হয়ে যায়। অর্থ-সম্পদের মোহে বিভোর একদল লোকের সামনে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) একবার বলেছিলেন–

دست زر الود ایں قدر بدلو می کند :: قلب زر الود مہ قدر بدبو خوہد کرد

স্বর্ণের স্পর্শ লাগা হাতে এত দুর্গন্ধ, তাহলে যে হৃদয়ে স্বর্ণ লেগে রয়েছে তার কেমন দুর্গন্ধ হবে?

যখন স্বর্ণ-রৌপ্যের মুদ্রার প্রচলন ছিল তখন সেগুলো গোনার সময় হাতের আঙুলে ময়লা লেগে কালো হয়ে যেত এবং সেগুলো থেকে দুর্গন্ধ ছড়াত। সে দিকে ইঙ্গিত করেই নানুতবী (রহ.) উক্ত শের বলেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে নারীদের অন্তরে স্বর্ণ-রৌপ্যের মোহ বদ্ধমূল হয়ে যায়। কেননা শুরু হতে শেষ পর্যন্ত তারা এসবের ঝংকারেই লালিত হয়। সুতরাং জ্ঞান-বুদ্ধির প্রতি তাদের মনোযোগ কমই হয়ে থাকে। তারা কথা বললে তাতে টাকা-পয়সা বিষয়ক আলোচনাই বেশি হয়। কুরআনের আলোচনা হয় না। এ কারণে তাদের আলোচনা পূর্ণতা পায় না এবং শ্রোতার মনে প্রভাবও বিস্তার করে না।

কথার মাধ্যমেই ব্যক্তিপ্রকৃতির প্রকাশ ঘটে

কোন ব্যক্তির প্রকৃত অবস্থা তার কথার মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। বক্তার গুণাগুণ সম্পর্কে অবগত হতে চাইলে তার কথা শুনতে হবে। কবির কবিতা আবৃতি দ্বারা সকলেই জেনে যাবেন যে তিনি কবি। তার আলোচনায় জ্ঞান, সাহিত্য, ভাষা বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রকাশ পাবে। যদি শায়খ আলোচনা রাখেন তবে তার আলোচনায় মারেফত, ইলম, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি আলোচিত হবে। সুতরাং শ্রোতা তাকে আরেফ বিল্লাহ রূপে চিনে নিবেন। তেমনিভাবে কোন আলেম যদি কথা বলেন তবে তার কথা বলা দ্বারাই অন্তরের ইলম প্রকাশ হয়ে পড়বে। শব্দে শব্দে তার ইলম ঝরে পড়বে। সুতরাং কথার মধ্যে মূলত কথকই প্রদীপ্ত হন। কথার মধ্যেই ব্যক্তি নিহিত থাকেন।

বাদশাহ আওরঙ্গজেবের মেয়ে জেবুন্নেসা অনেক বড় কবি ছিলেন। মেধাবী ও বুদ্ধিমতীও ছিলেন। শাহী দরবারে যখন কবিতার আসর বসত এবং কবিগণ নিজ নিজ কবিতা ও আলোচনা উপস্থাপন করতেন তখন জেবুন্নেসাও পর্দার অন্তরালে থেকে তাতে অংশগ্রহণ করতেন এবং

সাধারণত তিনিই শ্রেষ্ঠ বিবেচ্য হতেন। লোকজন তার খুব প্রশংসা করতেন।

একদিন আকেল খান নামক রাজ দরবারের এক কর্মকর্তা বললেন, জেবুন্নেসার এত সুন্দর সুন্দর কথা আমরা শুনতে পাই অথচ তাকে দেখতে পারি না, মন চায় তাকে একটু স্বশরীরে দেখি। আক্ষেপের সুরে তার মুখ থেকে বের হল– 'হায়! যদি তাকে দেখতে পেতাম!' কিন্তু একে তো বাদশাহী মহল, তার উপর আবার পর্দার ব্যবস্থা। এ যুগের মত পর্দাহীনতা ও উলঙ্গপনা তখন ছিল না। নারীগণ পর্দার অন্তরালে থাকতেন। দেখার কোন অবকাশ ছিল না।

আকেল খানের এ কথা জেবুন্নেসার কানে পৌছলে তিনি বললেন, আমাকে দেখার পদ্ধতি খুবই সহজ। এরপর তিনি এই শেরটি পড়লেন–

در سخن مخفی منم، چوئے گل در برگ گل

ہر کہ دیدن میل دارد، در سخن بیند مرا

আমি আমার কথার মাঝে তেমনিভাবে লুকিয়ে আছি যেমনিভাবে গোলাপের পাতার মাঝে লুকিয়ে থাকে তার সুগন্ধী। যে আমাকে দেখার আকাঙ্ক্ষা করে সে যেন আমার কথার মাঝে আমাকে দেখে নেয়।

সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির বাহ্যিক আকৃতি দেখার জিনিস নয়, ব্যক্তির প্রকৃতিই হল দেখার জিনিস। বাহ্যিক আকৃতি একটি গৌণ বিষয়, যা শুধু পরিচয়ের মাধ্যম হয়ে থাকে। মানুষের আসল জিনিস তার হাকিকত বা প্রকৃতি।

চরিত্র মাধুর্যের আবশ্যকতা

বাহ্যিক রূপকে পরিপাটি করার পরিবর্তে চারিত্রিক মাধুর্য ফুটিয়ে তোলাই বুদ্ধিমানের কাজ। চরিত্রই মানুষের হাকিকত। বাহ্যিক সুরত তো নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন সমস্ত বাহ্যিক সৌন্দর্য বিগড়ে যায়। যৌবনের রঙ ও জৌলুস তাতে থাকে না। বার্ধক্যই সে রূপ লাবণ্যকে মিটিয়ে দেয়। শুধু বার্ধক্যই নয়; দুশ্চিন্তা, শোক কিংবা অসুস্থতার

কারণেও সকল রূপ-রঙ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সৌন্দর্য বিলীন হয়ে যায়। সুতরাং বাহ্যিক সুরত নির্ভরযোগ্য কিছু নয়, মূল জিনিস হল চারিত্রিক সৌন্দর্য।

আমাদের যুবক বন্ধুরা দিন রাত বিশেষ যত্নের সাথে বাহ্যিক রূপকে সজ্জিত করার চিন্তায় বিভোর থাকে। আরো সৌন্দর্যময়, আরো আকর্ষণীয় হতে চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের দুর্বলতা, বাহ্যিক রূপকে সজ্জিত করতে তারা যতটা মেহনত করে থাকে চরিত্রের ব্যাপারে যদি তা করত তা হলে কোথা থেকে কোথায় চলে যেত। রোজ এক দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করে যে সাজসজ্জা আপনি গ্রহণ করবেন সন্ধ্যায় তা নষ্ট হয়ে যাবে। পরের দিন আবার সময় ব্যয় করবেন, আবার তা নষ্ট হয়ে যাবে। বাহ্যিক সুরতকে কতই বা আর আপনি পরিপাটি রাখবেন? জন্মই তো তার নষ্ট হওয়ার জন্য।

রূপ কেন গুরুত্বহীন

কোন এক বুযুর্গের প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা আছে। ঐ বুযুর্গের খানকায় লোকজন যিকির আযকার করার জন্য আসত। একদিন এক লোক আত্মশুদ্ধির জন্য তার দরবারে এলেন এবং শায়খের হাতে বাইআত গ্রহণ করলেন। তার ওখানে মুরিদদের জন্য শায়খের ঘর থেকে খাবার দেয়ার নিয়ম ছিল। মুরিদদের কামরায় খাবার দেয়ার দায়িত্বে একজন দাসী নিয়োজিত ছিল। উক্ত দাসী কিছুটা রূপসী ছিল। নতুন মুরিদের কামরায় যখন দাসী খানা নিয়ে এল তখন তার চোখ দাসীর প্রতি আটকে গেল। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি দাসীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লেন। যিকির আযকার ছেড়ে রাত দিন দাসীর চিন্তায় বিভোর হয়ে রইলেন। এ সংবাদ শায়খের কাছে গিয়ে পৌঁছল। আল্লাহর ওলীগণ মুখ দিয়ে খুব বেশি চিকিৎসা করেন না, তারা অন্যভাবে তদবির করেন। তিনিও মুরিদের অন্তর থেকে দাসীর রূপের প্রেম দূর করার তদবির দিলেন।

তিনি যে পদ্ধতি গ্রহণ করলেন তা হল দাস্ত হওয়ার ঔষধ আনালেন। জামাল গোটা বা এ জাতীয় কিছু। তিনি তা দাসীকে খাইয়ে দিলেন এবং নির্দিষ্ট একটি জায়গায় পাত্র রেখে সেখানে প্রয়োজন সারতে নির্দেশ

দিলেন। সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত অসংখ্যবার তার দাস্ত হল। পূর্বের রূপ-লাবণ্য শেষ হয়ে গেল, হাড্ডিসমূহ বেরিয়ে এল এবং ভয়ঙ্কর সুরত ধারণ করল।

শায়খ দাসীকে খানা নিয়ে ঐ মুরিদের কাছে পাঠালেন এবং মুরিদের প্রতিক্রিয়া কী হয় তা জানানোর জন্য নির্দেশ দিলেন।

ওদিকে উক্ত মুরিদ সকাল থেকে অধীর প্রতীক্ষায় বসে আছে। তাকে প্রাণ ভরে দেখার, চোখের ইশারায় মনের কথা ব্যক্ত করার নানা জল্পনা কল্পনা করে যাচ্ছে। অবশেষে যখন সে এল তখন তার ভয়ঙ্কর রূপ, বিবর্ণ মুখাবয়ব ও কঙ্কালসার দেহ দেখে তার মনে ঘৃণার উদ্রেক হল। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, খানা রেখে চলে যাও। দাসী চলে গেল এবং শায়খের কাছে গিয়ে মুরিদের আচরণের কথা জানাল। তিনি বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! চিকিৎসা হয়ে গেছে। এরপর শায়খ মুরিদের কামরায় এসে তার হাত ধরে সেই পাত্রের কাছে নিয়ে গেল যেখানে দাসী সারা দিন মলমূত্র ত্যাগ করেছে। সেই নাপাকীর দিকে ইঙ্গিত করে শায়খ বললেন, এই আপনার প্রেমিকা, আপনি একে নিয়ে যান। খুব যত্নের সাথে এ নাপাকীগুলো রেখে দেবেন। কারণ দাসীর প্রতি আপনার ভালবাসা ছিল না, ভালবাসা ছিল এগুলোর প্রতি। যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো তার পেটে ছিল ততক্ষণ আপনি তার আশেক ছিলেন। এগুলো বের হয়ে যাওয়ার পর আপনার আসক্তি কেটে গেছে। আপনার প্রেম তো দাসীর সাথে ছিল না, ছিল এই নাপাকীর সাথে। এ নাপাকীগুলোই তো আপনার প্রেমিকা। সুতরাং এগুলোকে তুলে নিন। নতুন মুরিদ খুবই লজ্জিত হলেন এবং মন থেকে সবকিছু মুছে ফেললেন।

সুতরাং রূপের মোহ প্রকৃতপক্ষে নাপাকীর মোহ। আসল ভালবাসা চরিত্রের সৌন্দর্যে হয়ে থাকে। ইলম, মারেফাত, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক প্রভৃতি চরিত্র নির্মাণকারী গুণাবলী ভালবাসা পাওয়ার যোগ্য। রক্ত মাংসের শরীরের প্রতি ভালবাসা প্রকৃত ভালবাসা নয়, প্রকৃত ভালবাসা চরিত্রের মাধুর্যে নিহিত। আর এ সম্পদ আল্লাহ তাআলা যাকে দান করেন তিনি পরম সৌভাগ্যবান। দুনিয়ার জীবন, কবর জীবন, পরকালীন জীবন– সর্বত্রই এ সম্পদ বিরাজমান থাকে। এগুলো শারীরিক রূপ লাবণ্যের মত ধ্বংস হবার নয়।

কালামুল্লাহর মহামাহাত্ম্য

ইতোপূর্বে আমরা জেনেছি যে, কালাম বা কথার ক্ষেত্রে সর্বজন স্বীকৃত মূলনীতি হল যার ইলম যত উন্নত তার কালাম তত উন্নত। বুদ্ধি ও মর্যাদায় যিনি যতটা গুরুত্বপূর্ণ তার কথাও ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা কালামুল্লাহর দিকে তাকাই তাহলে তার এক অনন্য মহামাহাত্ম্য আমাদের সামনে ফুটে উঠবে। আল্লাহর সত্তার ইলমের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাব তাঁর ইলমের কোন সীমা পরিসীমা নেই। আমি আপনি কেবল সামনের জিনিস দেখতে পাই আর আল্লাহর কাছে সামনে পেছনে, উপস্থিত-অনুপস্থিত সবাই সমান। তিনি একখণ্ড মেঘের আওয়াজ যেমন শুনতে পান, ভূঅভ্যন্তরের কোন এক পাথর খণ্ডের উপর চলমান কোন ক্ষুদ্র কীটের পদধ্বনিও তেমন শুনতে পান। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। আপনি কেবল কারো মুখ থেকে উচ্চারিত আওয়াজই শুনতে পান, আর তিনি অন্তরের গোপন ভেদও জানেন।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

অন্তরের বিষয়াবলী সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞাত।

সুতরাং প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ের জ্ঞানের ধারক তিনি। যে জ্ঞানের কোন সীমা নেই। এ কারণেই তার কালাম এতটাই পূর্ণাঙ্গ হবে যে, তার চেয়ে অধিক পূর্ণাঙ্গতা থাকতে পারে না। তার ফাসাহাত, বালাগাত ও বাদায়াত হবে বিস্ময়কর ও সর্বোন্নত।

ফাসাহাত : ফাসাহাতের দৃষ্টান্ত হল, আপনি পোশাক তৈরি করতে চাচ্ছেন, সর্বাগ্রে আপনি বিবেচনা করবেন কাপড় ঠিক আছে কি না। অর্থাৎ কাপড়ের মূল উপকরণ সঠিক আছে কি না। যদি মূল উপকরণ ভাল হয়, সুতা খুবই উন্নত হয় তাহলে বলবেন, কাপড়টি খুব ভাল। এই যে মূল জিনিসটি উন্নত হওয়া– একে ফাসাহাত বলা হয়। বাক্যের মধ্যকার শব্দ অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হওয়া, কোন শব্দ শ্রুতিকটু না হওয়া, বাক্যের গঠন এমন হওয়া যে, কানে শোনার সাথে সাথে তার হাকিকত অন্তরে স্পষ্ট হয়ে যাওয়া এবং বাক্যের গঠন বক্তব্যকে পূর্ণরূপে ধারণ করার মত পূর্ণাঙ্গ হওয়াকে ফাসাহাত বলা হয়।

বালাগাত : বালাগাতের উদাহরণ এমন– খুব উন্নত কাপড় দিয়ে পোশাক বানানো হল, কিন্তু দর্জি খুবই ভুলভাবে পোশাকটি তৈরি করল। এ পোশাক পরে বের হলে কাপড় লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তারা বলবে যে, পোশাকটি খুব খারাপভাবে তৈরি করা হয়েছে। এভাবে কাপড়ের উত্তমতাও তৈরিগুণে নষ্ট হয়ে যায়। পোশাক শরীরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াকে বালাগাতের সাথে তুলনা করা যায়।

বাদায়াত : পোশাকের উপরে কোন রঙ লাগানো, নকশা করা, নানান কারুকাজে তাকে আকর্ষণীয় করে তোলা– এগুলোকে আমরা বাদায়াতের সাথে তুলনা করতে পারি। অর্থাৎ যে কালাম মূল উপকরণের ভিত্তিতে উন্নত, শ্রোতাদের মানসিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অতুলনীয় অলংকারে পরিপূর্ণ তাকে ফাসিহ, বালিগ ও বাদি বলা হয়।

মহান আল্লাহ তাআলা যেহেতু যাবতীয় গুণাবলীর পূর্ণতার আধার তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কালামে উপরোক্ত সবকিছুই সর্বোচ্চ উন্নত পর্যায়ে থাকবে। তা হবে এমন বিস্ময়কর যে কোন মানুষের কালামই তেমন হতে পারবে না। কারণ মানুষের ইলম তো সীমিত। সুতরাং তাদের কালামও পরিপূর্ণভাবে পূর্ণাঙ্গ হবে না। আল্লাহর ইলম অসীম। সুতরাং কালামের পূর্ণতাও এমন যে কেয়ামত এসে গেলেও সে কালাম থেকে ইলম শেষ হবার নয়। সবকিছুর হুকুম তাতে বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং আল্লাহর কালাম সর্বোচ্চ পূর্ণাঙ্গ, সর্বোচ্চ ফাসিহ, সর্বোচ্চ বালিগ ও সর্বোচ্চ বাদি এবং পরম বিস্ময়কর।

মুজেযার স্বরূপ

প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন একটি মুজেযা। মুজেযা বলা হয় এমন জিনিসকে যার সমকক্ষ কোন কিছু তৈরি করতে সমগ্র পৃথিবী ব্যর্থ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার যতগুলো গুণ রয়েছে তার সবগুলোই মুজেযাময়। তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা চাঁদ-সূর্য তৈরি করেছেন। আসমান জমিন নির্মাণ করেছেন। চন্দ্র-সূর্য তো দূরের কথা আপনি তার একটু আলোও তৈরি করতে পারবেন না। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, আপনি এসব তৈরি করেননি। এমন এক প্রজ্ঞাময় সত্তা তৈরি করেছেন

র প্রজ্ঞার কোন শেষ নেই। আসমান ও চন্দ্র-সূর্যের কথা বাদ দিলাম। এই যে জমিন, যা সার্বক্ষণিক আপনার পদদলিত হচ্ছে, এর সামান্য এক অনুও আপনি সৃষ্টি করতে পারবেন না। এ জমিন দ্বারা আপনি কাজ করতে পারবেন। বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে নানা জিনিস উদ্ভাবন করতে পারবেন। আপনি কেবল উদ্ভাবন করতে পারবেন, অনু পরিমাণ সৃষ্টির সাধ্য আপনার নেই। যে জমিন আপনার ভিত, সর্বদা যা আপনার সামনে রয়েছে, সার্বক্ষণিক আপনি যার উপর চলাফেরা করছেন সেই জমিনের একবিন্দু আপনি বানাতে পারছেন না। এ কথা প্রমাণ করে যে, এটি একটি মুজেযা। এটা ঐ সত্তার সৃষ্টি যার জ্ঞানের কোন সীমা পরিসীমা নেই। যার শক্তি ও সামর্থ অসীম। আল্লাহর যতগুলো সৃষ্টি রয়েছে, তার সবই মুজেযা। সমগ্র পৃথিবী সম্মিলিতভাবেও তা সৃষ্টি করতে অক্ষম।

মাতৃগর্ভে যে বাচ্চা সৃষ্টি হয় তা কে সৃষ্টি করেন? মা কিংবা বাবা কি সৃষ্টি করেন? তাদের তো খবরই নেই যে কী হচ্ছে। অথচ কুদরতের কারখানায় কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। বাচ্চা তৈরি হচ্ছে, আকৃতি গঠন হচ্ছে। পানির ফোঁটার মধ্যে জীবদেহের নকশা তৈরি করা তাঁরই কুদরত। আপনি পানির উপর ছবি আঁকতে পারেন না। কিন্তু আল্লাহর এ কুদরত রয়েছে যে, এক ফোঁটা পানির মধ্যে তিনি ছবি নির্মাণ করেন। সুরত ও আকৃতি গঠন করেন। না মা কিছু করতে পারেন, না বাবা কিছু করতে পারেন। এজন্যই বলা হবে যে, এ বাচ্চার স্রষ্টা হলেন আল্লাহ তাআলা কিন্তু সৃষ্টির মাধ্যম হল এই নারী ও পুরুষ। আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিরাজিকে পৃথিবীতে মাধ্যম অবলম্বন করে প্রদর্শন করেন। নারী ও পুরুষকে মাধ্যম করে বাচ্চা সৃষ্টি করেছেন। তাই বাবা-মা বাচ্চার স্রষ্টা নন, বাচ্চা সৃষ্টির মাধ্যম। এ কারণেই এক জায়গায় আল্লাহ ইরশাদ করেন–

أَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗ أَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ

এসব কিছু তোমরা সৃষ্টি কর, না কি আমি সৃষ্টি করে থাকি?

মানুষ মাটিতে বীজ বপন করে তার দায়িত্ব শেষ করে। মাটির ভেতরে সে বীজকে অঙ্কুরিত করা, চারা গজানো এসব কার কাজ? কৃষক কি এসব করতে পারেন? এ বিষয়ে তার কোন খবরই নেই। সে তো বীজ বপন

করেই দায়িত্ব শেষ করেছে। আর যে বীজ সে বপন করেছে তাও তার সৃষ্টি নয়, আল্লাহরই বানানো। জমিনের ভেতর আল্লাহর কুদরতী মেশিন বীজের অঙ্কুরোদগম থেকে শুরু করে তাকে বৃক্ষে রূপান্তর করছে। সুতরাং আল্লাহ্ হলেন তার স্রষ্টা এবং কৃষক সে সৃষ্টির মাধ্যম।

কিশলয় মাটি থেকে বের হয়ে ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকে। তখন সে খুব নাজুক ও দুর্বল থাকে। বাড়তে বাড়তে এক সময় বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়। এখানে লক্ষণীয় এই যে, গাছের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হল নিম্নমুখিতা। অর্থাৎ তার গতি নিচের দিকে। আপনি একটি ফল বা পাতাকে ছেড়ে দিন। নিচের দিকে নেমে আসবে। একটি ডাল ভেঙ্গে ছেড়ে দিন, সেটি উপর দিকে উঠে যাবে না। নিচেই নেমে আসবে। গাছের এই নিম্নমুখী স্বভাবের বিপরীতে চারা গাছের ঊর্ধ্বমুখিতা– এটা আল্লাহর কুদরত নয় তো কী? স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের বিপরীতে যেতে বাধ্য করে দেয়া মানুষের সাধ্যের বিষয় নয়। এটা কেবল স্রষ্টাই করতে পারেন। এতে প্রমাণিত হয় কৃষক তার স্রষ্টা নয়, আল্লাহই স্রষ্টা। ইচ্ছা করলে তিনি তাকে ঊর্ধ্বমুখী করতে পারেন। ইচ্ছা করলে নিম্নমুখী করতে পারেন। তার স্বভাবকে আল্লাহ্ নিয়ন্ত্রণ করেন। মোট কথা, জীব হোক, বৃক্ষ হোক কিংবা পাথর হোক সব কিছুর স্রষ্টা হলেন আল্লাহ। সৃষ্টি করা তাঁর কাজ। বান্দা কেবল মাধ্যম হতে পারে। আল্লাহর অজস্র বিস্ময়কর সৃষ্টিরাজি আমাদের সামনে রয়েছে। রূপান্তর ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে এগুলো দিয়ে নানা জিনিস সৃষ্টি করার সামর্থ আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন। আর এ সামর্থও তাঁরই দেয়া, আপনি নিজের মধ্যে নিজে এ সামর্থ তৈরি করেননি। আপনি জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে একটি জিনিস উদ্ভাবন করলেন। তখন প্রশ্ন আসবে, আপনার এ জ্ঞান বুদ্ধি কোত্থেকে এল? আপনি নিজে তো নিজের মধ্যে জ্ঞান সৃষ্টি করেননি। তাও আল্লাহরই দেয়া। পুনরায় সে বুদ্ধিকে কোন কিছু উদ্ভাবনে কাজে খাটানো, এও তো আপনার কাজ নয়।

আপনি কোন কিছু উদ্ভাবনের ইচ্ছা যখন করেন তখন আপনার মনে সে ইচ্ছা কে তৈরি করে দেন? এক্ষেত্রেও আপনাকে আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সুতরাং ইচ্ছা, সামর্থ কিংবা সংকল্প যদিও মানুষের কিন্তু তাও আল্লাহরই দেয়া। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন–

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ

আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের কর্মসমূহকেও তিনিই সৃষ্টি করেছেন।

আপনি বললেন, অমুকের ঘরে আগুন লেগেছে। প্রশ্ন হল কেন আগুন লেগেছে? উত্তরে বললেন, বাতি জ্বলছিল। ইঁদুরের ধাক্কা লেগে নিচে পড়ে গিয়ে মালমালে আগুন ধরে গেছে। ইঁদুর কেন ধাক্কা দিল? তার মনে একটা কিছু খেয়াল এসেছিল। খেয়াল কেন এল? এরপর বলবেন, ভাই! আল্লাহর খেলা, আল্লাহ ভাল জানেন। সুতরাং আল্লাহতে গিয়ে সমাপ্তি হল এবং সকল মাধ্যম শেষ হয়ে গেল। এমনিভাবে প্রতি কাজের সমাপ্তি আল্লাহ পর্যন্ত গিয়ে পৌছায়। পবিত্র কুরআন এ বিষয়টিকে একবাক্যে প্রকাশ করেছে–

وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى

প্রত্যেক বিষয়ের সমাপ্তি আপনার প্রতিপালকের কাছে হবে।

وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى

প্রত্যেক প্রাণী আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।

আল্লাহর বরকতময় সত্তাতেই সবকিছুর পরিসমাপ্তি। আমি এ কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে, যে কোন কিছুর সৃষ্টি একমাত্র আল্লাহর পক্ষ হতেই হয়ে থাকে। কারো ঈমান গ্রহণ কিংবা হেদায়াত প্রাপ্তি তাও একমাত্র তাঁরই পক্ষ হতেই আগত। কেননা পূর্ণাঙ্গ পরিপূর্ণতার চাহিদা তো এটাই।

সুতরাং আল্লাহর কালাম সার্বিক পূর্ণাঙ্গ। কেননা তা হল মুজেযা। এর মত দ্বিতীয়টি উপস্থাপন করতে দুনিয়া ব্যর্থ হবে। যেমন ব্যর্থ হবে জমিনের একটি বিন্দু তৈরি করতে, সূর্যের একটু আলো তৈরি করতে, নক্ষত্রের একটি অংশ তৈরি করতে কিংবা এক টুকরো আকাশ তৈরি করতে। ব্যর্থ হবে এ কারণে যে, এগুলোর সবই মুজেযা এবং আল্লাহর কাজ। কুরআন শরীফ হল আল্লাহর কালামের মুজেযা। আল্লাহর কাজের সমকক্ষ কোন কাজ করতে পৃথিবী যেমন অক্ষম, তাঁর কালামের সমকক্ষ কালাম

উপস্থাপনেও তদ্রূপ অক্ষম। কেয়ামত পর্যন্ত সকল বিষয়কে পরিবেষ্টনকারী এমন পূর্ণাঙ্গ কালাম তাঁরই হতে পারে যাঁর জ্ঞান কেয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত এবং সব কিছুই তাঁর সামনে উপস্থিত।

পবিত্র কুরআন প্রকৃত অর্থেই আল্লাহর কালাম ও আল্লাহর কিতাব

আমরা পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে, আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে একমাত্র কুরআনই প্রকৃত অর্থে আল্লাহর কালাম। অন্যান্য কিতাবকে রূপক অর্থে কালাম বলা হয়। কেননা কালাম-এর সংজ্ঞা হল ما يتكلم به অর্থাৎ কথকের কথাকে কালাম বলা হয়। কালাম হতে হলে তা কথক থেকে উচ্চারিত হতে হবে। আসমানী কিতাব তাওরাতকে আল্লাহ তাআলা কাঠের উপর লিপিবদ্ধ করে প্রেরণ করেছেন। ইঞ্জিলের বিষয়বস্তু হযরত ঈসা (আ.)-এর অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন। সুতরাং এগুলো রূপক অর্থে আল্লাহর কালাম। প্রকৃত অর্থে একমাত্র কুরআনই আল্লাহর কালাম। পবিত্র কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তেলাওয়াত করে জিবরাঈল (আ.)কে শুনিয়েছেন।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর কিতাবও। লিখিত বিষয়কে কিতাব বলা হয়। কুরআন মাজিদকে আল্লাহ লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন। লাওহে মাহফুজে বড় বড় হরফে এ কুরআন লিখিত হয়েছে। কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায়, এক একটি হরফ 'কোহে কাফ' (বিখ্যাত এক বড় পাহাড়)-এর সমতুল্য। অপরদিকে হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, ছোট ও সূক্ষ্ম হরফে কুরআনকে আল্লাহ তাআলা হযরত ইস্রাফিল (আ.)-এর কপালে লিখে দিয়েছেন। বড় ও ছোট উভয় প্রকার হরফেই আল্লাহ কুরআন লিপিবদ্ধ করেছেন। আপনি যদি কুরআনকে বড় হরফে ছাপান তবুও আপনি মহান আল্লাহর অনুকরণ করছেন, আর যদি ছোট হরফে ছাপান তবুও আপনি তারই অনুকরণ করছেন। আজকাল তো বহু ছোট আকৃতির কুরআনও দেখা যায়, যাকে পকেটে রাখা সম্ভব। কুরআনের যত রকমের নকশা হতে পারে তা মুসলমানগণ করেছেন।

কুরআনের এক আশ্চর্য নমুনা

বরোদায় একবার আমরা একখানা কুরআন শরীফ দেখেছিলাম। সেখানকার জামে মসজিদে তা সংরক্ষিত রয়েছে। তার পাতার দৈর্ঘ্য আনুমানিক দুই গজ এবং প্রস্থ দেড় গজ হবে। একটি বড় টেবিলে প্রথম পনের পারা রাখা হয়েছে যা ছাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। অপর পনের পারা অন্য একটিতে রাখা হয়েছে। লিপিকার কীভাবে লিখেছেন আল্লাহ জানেন। কেমন কলম নিয়েছেন? আনুমানিক চার আঙুল চওড়া তার হরফসমূহ। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত কুরআন মুসলমানগণ তৈরি করেছেন। কুরআন লেখার ব্যাপারে তারা কোন নমুনাই বাদ রাখেননি। ছোট হরফ, বড় হরফ, চওড়া হরফ, সূক্ষ্ম হরফ, ক্যালিগ্রাফি হরফ, ছাপার হরফ– সর্ব প্রকারের নমুনা তৈরি করেছে।

আয়াতের উদ্দিষ্ট অর্থ আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট

পবিত্র কুরআনের প্রতিটি বাক্য ও প্রতিটি শব্দ দ্বারা কি উদ্দেশ্য তা আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিয়েছেন। এমন নয় যে, শাব্দিক অর্থ ও যুগের চাহিদার সমন্বয়ে আয়াতের অর্থ নির্দিষ্ট হবে। এ বিষয়ে আমরা ইতোপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আরবী ভাষায় পূর্ণ ব্যুৎপত্তি থাকা সত্ত্বেও 'আল্লাহ কর্তৃক উদ্দিষ্ট অর্থ' নিজ থেকে নির্ধারণ করা যায় না। আল্লাহ কর্তৃক জানিয়ে দেয়ার পরই কেবল আয়াতের অর্থ নির্দিষ্ট হবে।

বাস্তবতার নিরিখে আমরা দেখি, একই মাতৃগর্ভে বড় হওয়া দুই বুকে বুক লাগিয়েও যদি বসে থাকে তাহলেও একজনের মনের ভাব অন্যজন বুঝতে পারে না, যতক্ষণ না অন্যজন তা প্রকাশ করে। একই জাতিসত্তার দু'জনের অবস্থা যখন এই যে, একজন বলে না দিলে অন্যজন কিছুই বুঝতে পারে না, সেখানে একচ্ছত্র নূরের অধিকারী আল্লাহ তাআলার কথা একচ্ছত্র অন্ধকারের ধারক বান্দার পক্ষে কী করে বোঝা সম্ভব, যতক্ষণ না তিনি স্পষ্ট করে দেন?

আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করে তাঁর উপর স্বীয় কালাম অবতীর্ণ করেছেন, শব্দ অবতীর্ণ করেছেন, অর্থ অবতীর্ণ

করেছেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের শব্দ ও অর্থ উভয়ের ব্যাপারে 'আমিন'। এর কোন কিছুই তাঁর নিজের নয়, আল্লাহ প্রদত্ত। হাদীসকে যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের সাথে মিলানো না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্য বোঝা যাবে না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা ও কাজের মাধ্যমেই কুরআনের অর্থ নির্দিষ্ট হবে।

কুরআনের কুরআন হওয়া হাদীসের উপর নির্ভরশীল

আমি একবার পাকিস্তানের করাচি শহর থেকে রেলগাড়িতে করে লাহোর যাচ্ছিলাম। একই গাড়িতে আপটুডেট ধরনের এক ব্যক্তি আরোহণ করেছিলেন। তিনি আমার সাথে খুবই ভাল আচরণ করেন এবং অনেক খেদমত করেন। আমি যদি বদনার দিকে হাত বাড়াতাম তাহলে তিনি দ্রুত পানি ভরে নিয়ে আসতেন। যদি কোন জিনিসের প্রতি ইশারাও করতাম তাহলে তা বুঝে নিয়ে আসতেন। অনেক খেদমত তিনি আমার করেছেন। যাই হোক, কয়েক ঘণ্টা তিনি আমার খেদমত করতে থাকলেন। আমারও তাকে খুব ভাল লাগল। পরে জানতে পারলাম, এই ব্যক্তি হাদীস অস্বীকারকারীদের দলভুক্ত। আর তার উদ্দেশ্য ছিল আমাকে তাদের দলভুক্ত করা। এজন্যই তিনি খেদমতের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এক পর্যায়ে তিনি তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। হাদীসের ব্যাপারে কিছু আপত্তি উত্তোলন করে বললেন, হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। শুধু ঐতিহাসিক মর্যাদা ছাড়া এর আর কিছুই নেই।

আমি জানতে চাইলাম, আপনি কোন কিছুই কি মানেন না?

তিনি উত্তর করলেন, কুরআন মানি।

আমি বললাম, কুরআনের কুরআন হওয়া আপনি কিভাবে জানলেন? আপনার কাছে কি ওহী এসেছিল যে, এটা কুরআন? কিভাবে জানলেন?

বললেন, আল্লাহর রাসূলের কথা দ্বারা।

আমি বললাম, রাসূলের সেই কথাই তো হাদীস। সুতরাং কুরআনের কুরআন হওয়া হাদীসের উপর নির্ভরশীল। হাদীসকে যদি আপনি অস্বীকার করেন তাহলে কী শর্তে কুরআন 'কুরআন' হবে? কেমন করে আপনি হাদীস অস্বীকার করেন? এরপর তিনি চুপ হয়ে গেলেন।

আবার বলতে লাগলেন, অন্তর থেকে হাদীসকে অস্বীকার করা তো আসলেই মুশকিল কিন্তু কিছু হাদীস এমনও আছে যা নির্ভরযোগ্য নয়।

আমি বললাম, হাদীস বিষয়টিকে তো আপনি মেনে নিলেন। হাদীসের প্রকার নিয়ে আপনি বিভ্রান্ত হয়েছেন। মুহাদ্দিসীনগণ হাদীসের প্রকারসমূহকে স্পষ্ট করে গেছেন। সকল হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা এক রকম নয়। যে হাদীস মুতাওয়াতির তা নিশ্চিত দৃঢ় বিশ্বাস প্রদান করে। তাকে অস্বীকার করা কুরআনকে অস্বীকার করার মত। কুরআনের কোন এক আয়াতকে অস্বীকার করলে যেমন সে ব্যক্তি ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়, তেমনিভাবে হাদীস মুতাওয়াতিরকে অস্বীকারকারী ব্যক্তিও আর ইসলামের সীমার মধ্যে থাকে না।

দ্বিতীয় স্তরের হাদীস হল হাদীসে মাশহুর। এ প্রকারের হাদীস নিশ্চিত দৃঢ় বিশ্বাসের নিশ্চয়তা প্রদান না করলেও 'প্রবল ধারণা' অবশ্যই তৈরি করে। আর 'প্রবল ধারণা'র উপর হাজারো আহকাম নির্ভরশীল। সুতরাং তাও দলিল হবে।

হাদীসের তৃতীয় স্তরে রয়েছে 'খবরে ওয়াহেদ'। খবরে ওয়াহেদ শুধু ধারণা তৈরি করে। আর ধারণাকেও তো অস্বীকার করা যায় না। বহু হুকুম আছে যা ধারণা ও অনুমান-নির্ভর। আমরা চোখে না দেখে ধারণার উপর অনেক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি। যেমন- অযুর সময় সমস্ত পা ধোয়া ফরয। এক চুল পরিমাণও যদি শুকনা থাকে তাহলেও অযু হবে না। কিন্তু ধোয়ার সময় আপনি কি নিজ চোখে দেখে নেন যে, গোড়ালী সম্পূর্ণরূপে ধোয়া হল কি না? আপনি দেখেন, না প্রবল ধারণায় 'ধোয়া হয়েছে' বলে ধরে নেন? এ প্রবল ধারণাকে শরীয়তও মেনে নেয়। অযু হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত দেয়। এমনিভাবে বহু হুকুম ধারণার উপর নির্ভর করে। যখন আপনার ধারণা কোন কাজ জায়েয হওয়ার দলিল হয় তখন কোন হাদীস যদি ধারণা সৃষ্টি করে তবে তা দলিল হবে না কেন? এরপর আমি বললাম, স্বয়ং মুহাদ্দিসীনগণই স্পষ্ট করেছেন যে, সকল হাদীস একই স্তরের নয়। হাদীস বিষয়কে আপনি আগেই মেনে নিয়েছেন। হাদীসের কোন কোন প্রকার বিষয়ে আপত্তি ছিল, সে বিষয়গুলো স্বয়ং মুহাদ্দিসীনগণই স্পষ্ট করেছেন। এখন আপনার আপত্তি কী?

বললেন, কোন আপত্তি নেই।

আমি বললাম, হাদীসকে আর অস্বীকার করবেন না তো?

তিনি বললেন, না, করব না। লাহোর পর্যন্ত যেতে যেতেই তার খেয়াল ঠিক হয়ে গেছে।

যাই হোক, কুরআনকে মানা হাদীস মানার উপর নির্ভরশীল। হাদীসকে অস্বীকার করা স্বয়ং কুরআনকে অস্বীকার করা। কুরআনের অর্থ অনুধাবনের জন্য হাদীসের আশ্রয় নিতেই হবে। শুধু তাই নয়, কুরআনের শব্দের ব্যাপারেও হাদীসকে মানতেই হবে। আল্লাহর রাসূলই তো বলেছেন যে, এটা কুরআনের আয়াত। সুতরাং কুরআনের শব্দ, অর্থ ও আল্লাহ কর্তৃক উদ্দিষ্ট অর্থ সবই হাদীসের উপর নির্ভরশীল। হাদীসকে অস্বীকারকারীগণ সর্বাগ্রে কুরআনের অস্বীকারকারী। তারা কুরআনকে মানে না। কুরআনকে না মানার উপরে হাদীসকে না মানার পর্দা আরোপ করেছে। প্রকৃতপক্ষে কুরআন না মানাই তাদের উদ্দেশ্য।

ফিকাহ-এর দলিল

কুরআন হল মূল। তার ব্যাখ্যা হল হাদীস। হাদীসেরই ব্যাখ্যা ও পরিচিতিতে ফিকাহ-এর উদ্ভব। সুতরাং মৌলিকভাবে প্রথম দলিল হল কুরআন। দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে হাদীস। বহু মাসআলা হাদীসের মাধ্যম ছাড়া সরাসরি কুরআন হতে নির্গত হয়। মুজতাহিদগণ তাদের ইজতেহাদের মাধ্যমে কুরআনের মধ্যে নিহিত মাসআলা বের করে আনেন। সুতরাং সেগুলো মাধ্যম অবলম্বন করে কুরআন হতে নির্গত হয়।

ফিকাহ'র মাসআলাও প্রকৃতপক্ষে কুরআনেরই মাসআলা। পার্থক্য এতটুকু যে, সে মাসআলাসমূহ আমি বা আপনি বের করার সামর্থ্য রাখি না। যাদেরকে আল্লাহ ইজতেহাদের ক্ষমতা দান করেছেন তাঁরাই কেবল তা বের করতে সক্ষম হন। তারা সেগুলো বের করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেন।

ইমাম শাফেঈ (রহ.) একবার কাবাঘরে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। ইলম-এর একটা জোশ তাঁর মধ্যে এসে গেল। বললেন, আজ যে মাসআলা

তোমরা আমার কাছে জানতে চাইবে আমি তা হাদীস দ্বারা প্রমাণ করব।

এক ব্যক্তি বললেন, আপনার মাযহাব অনুযায়ী সাপ-বিচ্ছুর মত বোলতা ও ইঁদুরকেও হেরেম শরীফের মধ্যে মারা যায় অথচ আবু হানিফা (রহ.)-এর মাযহাব অনুযায়ী এদেরকে হেরেমের মধ্যে মারা যাবে না। তারা রেহাই পাবে। কেবল সাপ ও বিচ্ছুকে মারা যাবে। এবার বোলতা ও ইঁদুরকে মারার বিধান কুরআন থেকে প্রমাণ করুন।

শাফেঈ (রহ.) বললেন, তুমি কুরআন পড়নি? কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

রাসূল তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।

কুরআনের এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলবেন তা মেনে নিতে হবে। অর্থাৎ হাদীস দলিল হওয়ায় কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। আর হাদীসে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اقدوا اهديتم من بعدى ابو بكر وعمر

আমার পরে তোমরা আবু বকর ও উমর (রা.)-এর অনুসরণ কর।

সুতরাং কুরআন দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ মেনে নেয়া ওয়াজিব সাব্যস্ত হল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুম দ্বারা আবু বকর ও উমর (রা.)-এর নির্দেশ মানা ওয়াজিব সাব্যস্ত হল। আর হযরত উমর (রা.) বলেন–

يقتل الز نبور فى الحرام

হেরেম শরীফের মধ্যে বোলতা মারা যায়।

সুতরাং দুটি মাধ্যমের ভিত্তিতে কুরআন দ্বারা এ হুকুম সাব্যস্ত হল। কিছু কিছু আহকাম কুরআন দ্বারা কোন প্রকারের মাধ্যম ব্যতীতই প্রমাণিত হয়, কোন কোন আহকাম হাদীসকে মাধ্যম করে প্রমাণিত হয়। আবার কোন কোনটি ইজতেহাদ ও ব্যাখ্যাকে মাধ্যম করে প্রমাণিত হয়। এসবের

সবগুলোকেই কুরআনের আহকামই বুঝতে হবে। মাধ্যম অবলম্বন করা না করার মধ্যে যারা পার্থক্য করতে চায় তারা ফিকাহ ও হাদীসকে অস্বীকার করতে চায়। এগুলোকে অস্বীকার করা মানে প্রকৃতপক্ষে কুরআনকে অস্বীকার করা।

যাই হোক, আলোচনা অনেক দূর চলে গিয়েছে। আমি আলোচনা করছিলাম যে, কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার কিতাব ও কালাম। আল্লাহ কুরআনকে উচ্চারণও করেছেন এবং লিখেও রেখেছেন। কুরআন প্রকৃত অর্থেই কালাম। তাওরাত হল কিতাবুল্লাহ, তাকে রূপক অর্থে কালামুল্লাহ বলা হয়। আর ইঞ্জিলের বিষয়বস্তু আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা (আ.)-এর অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন। তিনি নিজ ভাষায় তা ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং তা হাদীসের অনুরূপ। হাদীসও তো ওহী, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তরে আল্লাহ উদয় করে দেন এবং তিনি তা নিজ ভাষায় ব্যক্ত করেন।

আল্লাহর কালাম কেন বিলীন হবার নয়

কুরআন হল সেই গ্রন্থ যাকে আল্লাহ শুধু কিতাবরূপেই প্রেরণ করেননি; বরং উচ্চারণও করেছেন। আর এ কথা স্পষ্ট যে, কোন কথা যখন বক্তার মুখে উচ্চারিত হয় তখন তা শেষ হয়ে যায় না। শূন্য মণ্ডলে জমা থাকে। এ কারণেই আমরা রেডিওর মাধ্যমে শব্দ ও কথা শুনতে পাই। রেডিওর ধারক যন্ত্র শূন্য থেকে কথাকে ধারণ করে আমাদেরকে শোনায়। আমাদের কথাই যখন বিলীন হয়ে যায় না তখন আল্লাহর কালাম কেন বিলীন হবে? আমাদের সকল কথা শূন্যে ভাসমান রয়েছে। কেয়ামতের দিন প্রতিটি শব্দ আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হবে। কুরআনে এসেছে–

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

এমন কোন কথা উচ্চারিত হয় না যা সদা সঙ্গী বিশ্বস্ত সংরক্ষক কর্তৃক সংরক্ষিত হয় না।

সুতরাং সমস্ত কথা মহাশূন্যে সংরক্ষিত থাকে। এমনকি বিজ্ঞানীগণ এ দাবীও করেছেন যে, আমরা রেডিও প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে একদিন হযরত ঈসা আ.)-এর কথাও লোকজনকে শুনিয়ে দেব, যা তিনি

হাওয়ারীগণের সামনে বক্তৃতা আকারে পেশ করেছিলেন। শূন্যমণ্ডলে সংরক্ষিত ধ্বনিমালা থেকে প্রত্যেকের ধ্বনি স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করার মেশিন আবিষ্কৃত হলেই এটা সম্ভব হবে। শূন্যমণ্ডল আপনার আমার কালামকে ঘিরে নেয় কিন্তু যখন আল্লাহর কালাম চলে তখন সে কালাম মহাশূন্যকে ঘিরে নেয়। স্বয়ং শূন্যমণ্ডল সে কালামের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে।

শাহ রফিউদ্দিন (রহ.) এক স্থানে লিখেছেন, যখন কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত কর তখন এ কল্পনা কর যে, আমি পড়ছি না, এগুলো আল্লাহর কালাম, আমার মুখ নড়াচড়া করছে মাত্র। কিন্তু এ আওয়াজ আল্লাহর পক্ষ হতে আসছে। এভাবে মশক করতে থাক, পড়তে থাক। একদিন এমন হবে যে, তোমার কানে আসতে থাকবে তুমি পড়ছ না, আল্লাহরই আওয়াজ এবং তিনিই পড়ছেন।

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْهُوَاِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى

আমার নবী মনগড়া কোন কিছু বলেন না, তাঁর কাছে প্রেরিত ওহীর প্রচার করেন।

আল্লাহর কথা নবীর যবানে প্রকাশ পায়। শব্দকে মাধ্যম করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যবানে আল্লাহর কালাম অবতীর্ণ হয়। যদি কোন বান্দা রাসূলের অনুসারী হয়, আল্লাহতে বিভোর হওয়ার পথ গ্রহণ করে এবং ঐ ধ্যান-ধারণায় ডুবে থাকে তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জুতার বরকতে উম্মতের মধ্যেও এমন লোক তৈরি হয় যে, তেলাওয়াত করেন তিনি নিজে আর তার কানে উপর থেকে পড়ার আওয়াজ শ্রুত হয়।

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ বিলীন হলেও কুরআন বিলীন হবার নয়

কুরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাবের মধ্যে পার্থক্য এই যে, অন্যান্য আসমানী কিতাবসমূহ হেফাযতের দায়িত্ব উম্মতকে দেয়া হয়েছিল। তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল প্রত্যেক কিতাবের ব্যাপারেই উম্মত তা হেফাযতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। তারা সে দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে

পারেনি। শব্দ ও অর্থ উভয় ক্ষেত্রে তারা পরিবর্তন সাধন করেছে। নবীর অবর্তমানে কিতাবকে ধ্বংস করেছে। কুরআন শেষ আসমানী কিতাব। কেয়ামত পর্যন্ত আর কোন নতুন দীন আগমন করবে না। এ কুরআন কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে বিধায় এ কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং রাব্বুল আলামিন নিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার জিম্মাদারীতে থাকার কারণে কুরআন বিলীন হবে না। প্রথমত আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, কালাম কখনো ধ্বংস হয় না। শূন্যমণ্ডলে সংরক্ষিত থাকে। কিন্তু আপনার অন্তর থেকে মুছে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্ত রেও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। হাজার হাজার শিশু ছাত্র আপনাদের মাদরাসাসমূহে কুরআন মুখস্থ করছে। তারা কুরআন কী, কুরআনের প্রভাব কী এ বিষয়ে কিছুই জানে না। শুধুই মুখস্থ করে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলাই হেফাযত করছেন। এই বাচ্চাদের অন্তরে কুরআন ঢেলে দিচ্ছেন। যদি বয়স্করা মুখস্থ করত তাহলে সংরক্ষণ করাকে তাদের সাথে সম্পৃক্ত করা যেত। বলা যেত, বুঝদার মানুষ কুরআনকে সংরক্ষণ করার জন্য মুখস্থ করছে। কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে তো সে বোধ নেই। সুতরাং বাচ্চাদের অন্ত রে আল্লাহ তাআলা কুরআনকে সংরক্ষণ করছেন।

কুরআনের অর্থকে আল্লাহ তাআলা উলামাগণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করছেন। ইরশাদ হয়েছে–

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ فِىْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ

সুস্পষ্ট প্রমাণ-সমৃদ্ধ এ আয়াতসমূহকে আমি জ্ঞানীদের অন্তরে সংরক্ষণ করেছি।

সংরক্ষণের আধার এমন জিনিসকে সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, না সেখানে কোন চোর প্রবেশ করতে পারে, না কোন ডাকাত ডাকাতি করে নিয়ে যেতে পারে আর না কোন খেয়ানতকারী খেয়ানত করতে পারে। কুরআনের অর্থ মানুষের অন্তরের ভেতরে সংরক্ষিত। সেখানে কোন চোরের পদার্পণ সম্ভব নয়। যদি লোহার সিন্ধুকে সংরক্ষণ করা হত তা হলে সম্ভাবনা ছিল, লোকেরা তাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে কিংবা মাটিতে পুঁতে রেখে ধ্বংস করবে। চোর-ডাকাত চুরি করে নিয়ে যাবে। সুতরাং সিন্দুকে কিংবা আলমারীতে সংরক্ষণ না করে আলেমগণের অন্তরে সংরক্ষণ

করেছেন। এ হল আল্লাহর পক্ষ হতে সংরক্ষণ। তিনি শিশু ও আলেমগণ দ্বারা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। এরা হলেন মাধ্যম। হেফাযতকারী হলেন আল্লাহ। যেমন- তিনি হলেন স্রষ্টা আর আপনি সে সৃষ্টির মাধ্যম। কৃষককে মাধ্যম করে বৃক্ষ সৃষ্টি করেন, কৃষক স্রষ্টা হয় না। সুতরাং কুরআনের হেফাযতকারী তিনিই, আপনাকে মাধ্যম করেছেন। এ আপনার সৌভাগ্য। আপনি আমি মাধ্যম হয়ে সৌভাগ্যবান হয়েছি। অন্যথায় কুরআন তো সংরক্ষিত থাকবেই।

যাই হোক, আল্লাহর কালাম হল মুজেযা। কেউ এর সমকক্ষ কিছু তৈরি করতে পারবে না এবং কেউ একে ধ্বংসও করতে পারবে না।

কুরআনের সনদের শুদ্ধতা

কুরআনের সনদের সাথে সম্পৃক্ত যা কিছু রয়েছে তাকেও আল্লাহ এমন সুদৃঢ় ও মজবুত করেছেন যে, তাতে কোন প্রকারের বিশৃঙ্খলা হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। সনদ দুই প্রকারের। একটি হল আল্লাহর পক্ষ হতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত আসা, আরেকটি হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাদের পর্যন্ত আসা। একটি অপ্রকাশ্য সনদ, আরেকটি প্রকাশ্য সনদ। অপ্রকাশ্য সনদ হল, আল্লাহ কালাম বলেছেন আর জিবরাঈল (আ.) তা শুনেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত অংশের মধ্যে কোন প্রকারের সন্দেহের অবকাশ নেই। সেখান থেকে যা প্রকাশ পায় তা সর্বোচ্চ আমানতের সাথে প্রকাশ পায়। এতে ভুল কিছু সংযুক্ত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। জিবরাঈল (আ.) থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত আসার ব্যাপারে কথা থেকে যায়। ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.)-এর ব্যাপারে আল্লাহ বলেননি যে, সে মাসুম। সুতরাং তার কথা তোমরা মেনে নাও। অভয় না দিয়ে বরং জিবরাঈল (আ.)-এর গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন– যেসব গুণাগুণ দূতগণের হয়ে থাকে। যাতে করে মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে শাস্ত্র অনুযায়ী বুঝতে পারে যে, এ বার্তাবাহক কোন ভুল বার্তাবাহক নন। বার্তাবাহকের সব মূলনীতিই তার মধ্যে বিদ্যমান। তা না হলে আল্লাহ সরাসরি বলে দিতেন, এ আমার কালাম, আমার ফেরেশতা যা নিয়ে আগমন করেছে, তোমরা একে মেনে নাও। না মানার কোন কারণ

নেই। কিন্তু আল্লাহ তা না বলে বলেছেন, বর্ণনাকারীকে তোমরা যাচাই করে নাও। তার গুণাগুণকে দেখ, যদি বার্তাবাহকের গুণাগুণ তার মধ্যে পাওয়া যায় তবে গ্রহণ কর। পাওয়া না গেলে পরিত্যাগ কর। আল্লাহ তাআলা সূরা আত্-তাকওয়ীর-এ জিবরাঈল (আ.)-এর গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন–

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ

নিশ্চয়ই এটা এক সম্মানিত রাসূলের কথা।

এখানে প্রথমত জিবরাঈল (আ.)কে 'রাসূল' বলা হয়েছে। যার দ্বারা তাঁর আমানতদারী প্রকাশ পেয়েছে। কেননা আল্লাহ তাকে বার্তাবাহক বানিয়েছেন। দুনিয়ার কোন রাষ্ট্র এমন ব্যক্তিকে নিজের বার্তাবাহক বা দূত করে পাঠায় না যার মধ্যে সামান্যতম বিদ্রোহের সংশয় থাকে। রাষ্ট্র তাকেই দূত করবে যে রাষ্ট্রের পলিসির হেফাযতকারী এবং রাষ্ট্রের আইনকে মনপ্রাণ দিয়ে মানে, সামান্যতম খেয়ানত করে না– তাকেই রাষ্ট্র নিজের উদ্দেশ্য অন্য দেশের কাছে ব্যক্ত করার জন্য প্রেরণ করে।

সুতরাং কাউকে বার্তাবাহক সাব্যস্ত করা নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণ হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা যখন ইরশাদ করেন যে, আমার বার্তাবাহক বা রাসূল, তখন তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তিনি আল্লাহর কাছে নির্ভরযোগ্য। সুতরাং প্রথম কথা এই হল যে, জিবরাঈল (আ.) যেনতেন কোন ব্যক্তি নন, সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য এক ব্যক্তিত্ব, যাকে দূতের মর্যাদা দান করা হয়েছে।

কুরআনের সনদের উপর আপত্তির উত্তর

কেউ হয়তো বলতে পারে যে, বার্তাবাহক তো বানিয়েছেন, কিন্তু অনেক সময় বার্তাবাহকের মধ্যে খুঁত থাকে, যার দরুন কিছু পরিবর্তনও হয়ে যেতে পারে। কালামকে পরিবর্তন করে দেয়া বা তার উদ্দেশ্যকে পরিবর্তন করে দেয়া হতে পারে। এ আপত্তির সম্ভাবনা দূর করতে বলা হয়েছে–

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ

তিনি শুধু রাসূলই নন; বরং তিনি একজন সম্মানিত ও বুযুর্গ রাসূল। তাঁর ভেতর বুযুর্গী রয়েছে।

সুতরাং বুযুর্গ ব্যক্তি কীভাবে মিথ্যা বলবেন? একজন সাধারণ নেককার ব্যক্তি যাদের আমরা বুযুর্গ বলে থাকি তাদের ব্যাপারে কখনো আমাদের সন্দেহ হয় না যে এরা মিথ্যা বলবেন, আর ফেরেশতা মাসুম হয়ে মিথ্যা বলে দেবেন? তাও আবার আল্লাহর ব্যাপারে? একজন বুযুর্গ ফেরেশতার পক্ষে এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কেউ হয়তো আপত্তি করতে পারে যে, রাসূল ঠিক আছে, বুযুর্গ হওয়াও ঠিক আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তো এমন হতে পারে যে, সে খুব দুর্বল, নিজে থেকে মিথ্যা সে বলবে না, কিন্তু দুর্বল হওয়ার কারণে কোন শক্তি হয়তো তাকে মিথ্যা বলতে বাধ্য করবে। জিবরাঈল (আ.)-এর ব্যাপারেও তো এমন সম্ভাবনা থাকতে পারে।

এ আপত্তি যাতে না ওঠে সেজন্য আল্লাহ আরো একটি শব্দ সংযুক্ত করে এ সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়েছেন। বলেছেন–

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ذِىْ قُوَّةٍ

অর্থাৎ সে সম্মানিত রাসূল প্রবল শক্তির অধিকারী। সাধারণ দুর্বল কোন ব্যক্তি তিনি নন যে কোন শক্তিধরের কাছে নতিস্বীকার করতে হবে। হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর শক্তি কেমন ছিল? বর্ণিত হয়েছে, হযরত লূত (আ.)-এর জনপদকে যখন উল্টে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হল তখন জিবরাঈল (আ.)কে নির্দেশ দেয়া হল। তিনি সমগ্র জনপদকে এক হাতে আসমান পর্যন্ত তুলে উল্টিয়ে আছাড় দিলেন। এমন শক্তিধর কাউকে পরাজিত করা কি সম্ভব? কে তাকে পরাজিত করে তার দ্বারা ভুল কথা বলাবে? সুতরাং তিনি রাসূল ও বুযুর্গ হওয়ার সাথে সাথে মহাশক্তিধরও। এতদসত্ত্বেও কেউ হয়তো বলতে পারে যে, সব ঠিক আছে। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, শুনতে ভুল হয়ে গেছে। হয়তো দূর হতে আওয়াজ এসেছে। কী থেকে কী শুনেছে ঠিক নেই। কাছ থেকে শুনলে নিঃসন্দেহে এমন হত না। যতই ভাল নিয়ত থাকুক, দূর থেকে শুনলে শোনার মধ্যে তো পার্থক্য হয়ে যেতে পারে।

এ আপত্তির সম্ভাবনা দূর করতে আরো একটি বাক্য বাড়িয়ে আল্লাহ বলেন–

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٌ

অর্থাৎ তিনি আরশের কাছেই ছিলেন। দূরে কোথাও ছিলেন না। এজন্যই শ্রবণজনিত ভুলের সম্ভাবনা নেই। সে তো আমারই আশপাশে থাকে, আমি যা বলি তা কোন প্রকারের মাধ্যম ব্যতীত শুনে থাকে। ভুল করা সম্ভব নয়।

এরপরও হয়তো কেউ কেউ আপত্তি তুলতে পারে যে, সবকিছুই ঠিক আছে, কিন্তু এমনও হতে পারে যে তার পজিশন নিম্ন পর্যায়ের। লোকজন তার কথার গুরুত্ব দেয় না। উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী হলে তার কথা গ্রহণযোগ্যতা পায়।

এ আপত্তির সম্ভাবনা নিরসনকল্পে আল্লাহ্ তাআলা আরেকটি গুণ উল্লেখ করেন مطاع অর্থাৎ তিনি ফেরেশতাগণের সরদার। যিনি সকল নিষ্পাপ ফেরেশতাদের সরদার ও অভিভাবক, তাঁর সম্মানের কি আর কমতি থাকতে পারে? সমস্ত ফেরেশতা যাঁর খেদমত করেন, সকলে যার অনুসরণ করেন, তার কালামে ভুল হওয়া কী করে সম্ভব?

কিন্তু এর পরও আরেকটি সন্দেহের সম্ভাবনা ছিল। তা হল, সকল গুণাবলীই ঠিক আছে। কিন্তু সকলেরই তো কিছু ভুল ত্রুটি থাকে। ভুল করে একটিকে আরেকটি বলে দেওয়াও তো সম্ভব। অথবা ইচ্ছাকৃত কিছু কম বেশি করাও সম্ভব। এই ভেবে যে, সময়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এটাই। এই যমানার লোকজন পূর্বযুগের পরিভাষা বুঝবে না বিধায় কিছু পরিভাষা পাল্টে দিই।

এমন সম্ভাবনাকে নাকচ করে আল্লাহ্ বলেন–

ثَمَّ اَمِيْنٌ

তিনি অত্যন্ত আমানতদার।

উচ্চারণ-ভঙ্গির মধ্যেও কোন প্রকার পরিবর্তন সাধন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। শব্দ ও অর্থের মধ্যে তো নয়ই।

বর্ণনাকারীর এ সকল গুণাবলী আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এ কথা বলেননি যে, বাধ্যতামূলক একে কুরআন বলে মেনে নাও। বরং অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তাকে কবুল করে নাও। দেখ, তার বর্ণনাকারী কেমন? সনদে কোন ভুল আছে কি না।

কাফেররাও বার্তাবাহকের মিথ্যা বলাকে দোষ মনে করে

হিরাক্লিয়াসের কাছে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতের সংবাদ পৌঁছল তখন তিনি খোঁজ খবর নেয়ার জন্য একটি আরব প্রতিনিধি দলকে ডাকলেন। সে দলে আবু সুফিয়ানও ছিল। হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানের কাছে কয়েকটি বিষয় জানতে চাইল। এর মধ্যে একটি হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের দাবীর পূর্বে জীবনে কখনো কোন মিথ্যা বলেছে কি না। আবু সুফিয়ান কাফের ছিল। তখনও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী বলে মেনে নেননি। কথা হচ্ছিল বহু দূরের দেশ সিরিয়ায় বসে। ইচ্ছা করলেই সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে মিথ্যা বলে দিতে পারত। কিন্তু সে বলল, আমি যদি মিথ্যা বলি তাহলে আমার যে পরিচয় মর্যাদা রয়েছে তা ক্ষুণ্ন হবে। এজন্যই আমার সত্য বলা উচিত। বলল, আমার অভিজ্ঞতায় কখনো তাকে মিথ্যা বলতে দেখিনি। যতদূর জানি, জীবনে কখনো তিনি মিথ্যা বলেননি। আমার অনুপস্থিতিতে বলে থাকলে সেটা ভিন্ন বিষয়। এর বাইরে আবু সুফিয়ান কিছু বলতে পারেনি।

এখানে লক্ষণীয়, কাফের হওয়া সত্ত্বেও পরিচয় মর্যাদা রক্ষার্থে সে সত্য বলেছে। এতে প্রমাণিত হয়, বার্তাবাহক কাফের হলেও মিথ্যা বলাকে তারা দূষণীয় মনে করত। একজন মুমিন কেন তাকে দূষণীয় মনে করবে না? আর মুমিন ফেরেশতা, যার ঈমান পূর্ণ কামেল– তিনি কী করে মিথ্যা বলবেন? কী করে তিনি আমানতের খেয়ানত করবেন? আল্লাহ তাআলা মধ্যবর্তী মাধ্যমের গুণাবলী বর্ণনা করে প্রমাণ করেছেন যে, মধ্যখান থেকে কোন ধরনের ভুল এতে সংযুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

তিন বিশ্বস্ততা কালামুল্লাহকে ঘিরে রেখেছে

তৃতীয় হল ঐ সত্তা যার উপর কালামুল্লাহ অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি হলেন আল্লাহর শেষ নবী। সকল পূর্ণতার আধার তিনি। কেয়ামত পর্যন্ত তাঁরই পূর্ণতার দ্যুতি বিচ্ছুরিত হবে। তাঁর উপর কালাম অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে একটি নাম হল 'আমিন'। সুতরাং যার পক্ষ হতে কালাম অবতীর্ণ হয়েছে তিনি আমিন বা বিশ্বস্ত; যার মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে সেই জিবরাঈল (আ.)-এর উপাধি আমিন, আর স্বয়ং কাফেররাই তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমিন উপাধি দিয়েছিল। সুতরাং আমিনের কালাম আমিন বহন করে আমিনের কাছে নিয়ে এসেছেন। সর্বোচ্চ পর্যায়ের তিন বিশ্বস্ততা দ্বারা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পরিবেষ্টিত। এরপর তাতে ভুলের সম্ভাবনা কী করে থাকতে পারে?

কুরআনের প্রমাণে রাসূল (সা.)-এর সত্তার মর্যাদা

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহান সত্তা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর গুণাবলীর আলোচনা দিয়ে শুরু করেছেন। এ কথা বলেননি যে, যেহেতু তিনি নবী, তাই তোমরা মেনে নাও। নবী বলে যদি মেনে নেয়ার কথা বলতেন তাহলে অবশ্যই মেনে নিতে হত। কেননা নবীর মানেই হল মিথ্যা হতে পবিত্র এক উন্নত সত্তা। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। বলেছেন–

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ

তোমাদের সঙ্গী পাগল নন।

এখানে বিবেচ্য হল, তাঁকে জ্ঞানী কেন বলা হল না? জ্ঞানী বলার পরিবর্তে 'পাগলামী'কে নাকচ করা হয়েছে কেন? কারণ, জ্ঞানী বলা দ্বারা সন্দেহ হত, হয়তো তিনি একজন দার্শনিক। অথচ নবুওয়াত ও দর্শনের মধ্যে অনেক পার্থক্য। এজন্যই পাগলামীকে নাকচ করা হয়েছে। যখন সর্বজনমান্য কোন বড় ব্যক্তিত্বের কথা কাউকে মানাতে চাওয়া হয় তখন যেমন বলা হয় তার কথা কেন মানছ না? তিনি তো পাগল কেউ নন? এখানেও ঠিক তেমনিভাবে বলা হয়েছে। সুতরাং পাগলামীকে নাকচ করা মূলত সকল দোষকে নাকচ করা।

এরপর কথা থেকে যাচ্ছে, তিনি জিবরাঈল (আ.) থেকে যা শুনেছেন তা আসলেই কি শুনেছেন? নাকি অনুমানে কিছু বলে দিয়েছেন? (নাউযুবিল্লাহ)। এ সন্দেহ অবসান কল্পে আল্লাহ বলেন–

وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ

তিনি সেই ফেরেশতাকে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন।

অর্থাৎ তিনি জিবরাঈল (আ.)-এর কথা শুধু যে শুনেছেন তাই নয়; বরং তাকে দেখেছেনও। হযরত জিবরাঈল (আ.)কে তার স্বআকৃতিতে তিনি দেখেছেন। সুতরাং যখন বর্ণনাকারীকে দেখেছেন এবং তার কথা পাশে বসে শুনেছেন, বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই যখন বিশ্বস্ত, যিনি বার্তা প্রেরণ করেছেন তিনি যখন বিশ্বস্ত, বার্তা প্রেরণকারী ও বাহক উভয় যখন পরিপূর্ণ পূর্ণতার অধিকারী তখন তাতে ভুলের সম্ভাবনা কেমন করে থাকতে পারে? শত্রুতাবশত অনর্থক কেউ অস্বীকার করলে করতে পারে; কিন্তু মূলনীতির ভিত্তিতে করা জায়েয হবে না।

এরপর এ সন্দেহ থাকা সম্ভব ছিল যে, কথা তো সবই সঠিকভাবে শুনেছেন এবং জিবরাঈল (আ.) থেকে পুরো কালাম নিয়ে নিয়েছেন কিন্তু কার্পণ্য বশত তার সবকিছু মানুষকে জানাননি। এমন বহু মানুষ আছেন যারা নিজের জ্ঞান অন্যকে জানাননি। সমকক্ষ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা এবং একক আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষায় হাজারো মানুষ তাদের জ্ঞানের সাফল্যগাঁথা নিয়ে কবরে চলে গেছে, পৃথিবীতে তার কোন চিহ্নও নেই। বড় বড় হাকিম ও চিকিৎসকগণ তাদের সর্বোন্নত ফর্মূলাসমূহ নিজেদের সিনায় করে নিয়ে গেছেন, কাউকে জানিয়ে যাননি। এতে বোঝা যায়, শাস্ত্রবিদরা অনেক সময় কার্পণ্য করে থাকেন। হতে পারে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বেলায়ও এমন কিছু হয়েছে। এ সন্দেহ দূর করতে আল্লাহ বলেন–

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ

তিনি অদৃশ্য বিষয় প্রচার করতে কার্পণ্য করেন না।

কারো কারো মনে আরেকটি সংশয়ের উদ্রেক হতে পারে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনেছেন ঠিকই; কিন্তু শয়তান মাঝখানে

এসে হয়তো কোন প্রকারের তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে। এ ধরনের সংশয়ের অবসানে আল্লাহ বলেন–

وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ الرَّجِيْمِ

এটা বিতাড়িত শয়তানের কোন উক্তি নয়।

যখন কুরআন নাযিল হতে শুরু করল তখন থেকে শয়তানের আসমানের দিকে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়া হল। এর পূর্বে তারা আসমানের দরজা পর্যন্ত যেতে পারত। সেখান থেকে ফেরেশতাদের কিছু আলাপচারিতা তারা মাঝে মধ্যে শুনেও ফেলত। এরপর তার সাথে আরো কিছু মিলিয়ে তা প্রচার করত। কিন্তু কুরআন অবতীর্ণ হওয়া শুরু হওয়ার পর তাদের এ পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে সূরা জিনের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এর মধ্যে শয়তানের কোন প্রভাব নেই। আর এ কালামও এক বিশ্বস্ত সত্তার। আর যার উপর অবতীর্ণ হয়েছে তিনিও এক বিশ্বস্ত রাসূল। যিনি এ কালাম অন্যের কাছে পৌছানোর ব্যাপারে কোন প্রকারের কার্পণ্য করেননি। শুধু তাই নয়, সাহাবায়ে কেরামকে পৌছাতে নির্দেশ পর্যন্ত দিয়েছেন। বলেছেন– بلغوا عنى ولو اية অর্থাৎ একটি বাক্য, একটি কথা কিংবা একটি আয়াতও যদি আমি বলি তাহলে তোমরা তা অন্যের কাছে পৌছে দিও, কার্পণ্য কর না। বিদায় হজের সময় তিনি যে উপদেশ দিয়েছিলেন তাতে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন–

فليبلغ الشاهد الغائب

যারা উপস্থিত রয়েছে তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার পয়গাম পৌছে দেবে।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)ও এ নির্দেশ গুরুত্ব সহকারে পালন করেছেন। প্রতিটি বর্ণনা উম্মতের কাছে পৌছে দিয়েছেন।

যাই হোক, কুরআনের সনদের একটি বাতেনী দিক রয়েছে। আল্লাহর পক্ষ হতে ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.)-এর কাছে এসেছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছেছে। আর তা সম্পূর্ণ নির্দোষ ও স্বচ্ছভাবে পৌছেছে। এরপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে পৌছিয়েছেন? উম্মতকে তিনি নিজে জানিয়েছেন। সর্বোচ্চ আমানত ও

উদারতার মাধ্যমে এ দায়িত্ব পালন করেছেন। একেকটি শব্দ, যবর, যের এমনকি ধ্বনি ও আওয়াজ পর্যন্ত উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। সাহাবাগণও একই রকমের গুরুত্ব সহকারে তাবেঈনদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তাবেঈগণ একই রকমের গুরুত্বসহকারে তাদের অনুসারীদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এভাবে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

আমার আলোচনার সার সংক্ষেপ এই, যুগ যুগ ধরে একজন দু'জন নয় লক্ষ লক্ষ মানুষ ধারাবাহিকভাবে এ কুরআন বর্ণনা করে যাচ্ছেন। শুধু বর্ণনাই নয়, তাদের অন্তরেও এ কুরআন সংরক্ষিত রয়েছে। শুধু অন্তরে সংরক্ষণকেই তারা যথেষ্ট মনে করেনি, কুরআনকে গলার মাল্য করে নিয়েছেন। কুরআনের স্বাদ-আহ্লাদকে আলেমগণ নিজেদের স্বাদ-আহ্লাদে পরিণত করেছেন। এজন্যই এতে খুঁত থাকা, ভুল থাকা এবং খেয়ানত হওয়ার কোন অবকাশ নেই।

কুরআনের সনদের উপর নীতিগতভাবেই কোন আপত্তি করা যায় না

তিন চারজন ব্যক্তি মিলে যদি কোন কথা বলে তবে আমরা নীতিগতভাবেই তা মেনে নিতে বাধ্য হই। আর প্রত্যেক যুগে লক্ষ কোটি মানুষ যে কুরআন পড়ছে তাতে ভুল থাকা কি করে সম্ভব হয়? কুরআন তো মানুষের সিনার ভেতর সংরক্ষিত। হেফাযতের পদ্ধতিও অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তার সূরাসমূহ নির্দিষ্ট। তাতে কম বেশির অবকাশ নেই। তার আয়াত ও শব্দসমূহেরও হিসাব আমাদের জানা আছে। সে আয়াতের হরফগুলো গণনা করা আছে। সকল আয়াতের ইরাবসমূহও গণনাকৃত। অর্থাৎ কতটি যবর, কতটি যের, কতটি পেশ, কতটি তাশদিদ, কতটি জযম তারও হিসাব রয়েছে। এমন নিখুঁতভাবে যা সংরক্ষিত তার মধ্যে কোন প্রকারের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন কিভাবে সম্ভব? দুয়েকটি শব্দের মধ্যে পরিবর্তন করার মত আহমক ও বেয়াকুব হয়তো পাওয়া যেতে পারে কিন্তু তা সে সেখানেই শেষ হয়ে যায়, উম্মত তা গ্রহণ করে না।

এ ধরনের এক বেয়াকুবের সন্ধানও ইতিহাসে পাওয়া গিয়েছিল। ঘটনাটি এমন- এক কাতেব বা লিপিকার ছিল। যার অভ্যাস ছিল তাকে কিছু

লিখতে দেয়া হলে সে তাতে নিজের থেকে কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করত। তার এ অভ্যাস সকলের জানাও ছিল। তার লেখা ছিল খুব সুন্দর। তাই একবার তাকে কুরআন শরীফ লিখতে দেয়া হল। বার বার বলে দেয়া হল যে, এটা কিন্তু আল্লাহর কালাম। এর মধ্যে কোন পরিবর্তন করা যায় না। তুমি এতে পরিবর্তন করে জাহান্নামে যেও না। সে বলল, আমি কোন পরিবর্তন করব না। লেখা শেষ হওয়ার পর তার কাছে জানতে চাওয়া হল কোন পরিবর্তন সে করেছে কি না।

সে বলল, আমি অন্যেরটায় পরিবর্তন করি ঠিকই কিন্তু আল্লাহর কালাম বলে তাতে তেমন কিছু করিনি। তবে সামান্য একটু পরিবর্তন করেছি। আমি দেখলাম, এই পবিত্র কিতাবের কোন কোন জায়গায় আল্লাহর দুশমন, কাফেরদের নাম রয়েছে। ফেরাউন, হামান, কারূনদের নাম রয়েছে। আমি এদের নাম বাদ দিয়ে সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পিতা ও তাঁর দাদার নাম লিখে দিয়েছি। শুধু এতটুকুই পরিবর্তন করেছি, আর কিছু করিনি।

এ লোকের মত কোন আহমক কিছু পরিবর্তন করে নিজের পরিণতি খারাপ করলেও করতে পারে, কেউ তা মেনে নেয় না। হাজারো ব্যক্তি এমন সৃষ্টি হয়ে থাকবে যারা কুরআনের মধ্যে পরিবর্তনের চেষ্টা করেছে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে। তাদের কোন নাম নিশানা নেই। কুরআন একইভাবে স্বস্থানে রয়েছে।

দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি সম্ভব নয়

নবীগণের নবুওয়াতের প্রমাণ হল তাঁদের মুজেযা। অন্যান্য নবীগণের মুজেযা তাদের তিরোধানের সাথে সাথে শেষ হয়ে গিয়েছে। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বশ্রেষ্ঠ মুজেযা কুরআন এখনও স্বমহিমায় উজ্জ্বল রয়েছে। এ কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে সংরক্ষিত বিধায় এর দাওয়াতও সংরক্ষিত। আজ যদি দাওয়াত দেওয়া হয় তবে কুরআনের প্রতিই দিতে হবে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতের প্রতি দিতে হবে, ইসলামী শরীয়তের প্রতি দিতে হবে।

কেননা এসবের দলিল বিদ্যমান আছে। যদি কেউ সন্দেহ করে, আপত্তি করে তবে কুরআনই সবকিছুর জামিন নিয়েছে। তার দলিল কুরআনে বিদ্যমান। সকল সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছে। সকল আপত্তির জওয়াব তাতে বিদ্যমান রয়েছে। সকল বিরোধের পূর্ণ সমাধান দিয়েছে।

এ কারণেই ইহুদী খৃষ্টানরা এর মোকাবেলা করেছে। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মোকাবেলা করেছে, যুদ্ধ লড়েছে, মুশরিকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু বিজয়ী হতে পারেনি। মুসলমানদের সাথে শুধু অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই লড়েনি, দলিল-প্রমাণ নিয়েও মুসলমানদের মোকাবেলা করেছে। কিন্তু কুরআনের প্রমাণের সামনে কোন প্রমাণ পেশ করতে পারেনি, হেরে গেছে। শেষে মুনাফেকীর পথ গ্রহণ করেছে। মুসলমান সেজে মুসলমানদের মধ্যে দীনের ব্যাপারে বিদ্বেষ ছড়িয়েছে। তাদের এ প্রচেষ্টা অবশ্য সফল হয়েছে। এর দ্বারা মুসলমানদের একতায় ফাটল ধরেছে, তারা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং মুনাফেকীর পথ গ্রহণ করে মুসলমানদের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ানো যায়, তবে সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণের দ্বারা কেউ যদি মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ তৈরি করতে চায়, তাহলে তা সম্ভব নয়।

মুসলমানদের কাছে খুবই মজবুত প্রমাণাদি রয়েছে যা দ্বারা সকল প্রকারের বাতিলকে প্রতিরোধ করা সম্ভব। বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায় দলিল প্রমাণ নিয়ে মোকাবেলা করে ব্যর্থ হয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, কেউ দলিল প্রমাণ দিয়ে মুসলমানদের পরাজিত করতে পারবে না। দুনিয়ার সকল জাতি গোষ্ঠী মিলেও সম্ভব নয়। মুসলমানরা অস্ত্রশস্ত্র দিয়েও মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু মুনাফেকীর মোকাবেলায় তারা সক্ষম হয়নি। কেননা মুনাফেকীর ব্যাপারে বলা হয়েছে– এ উম্মতের মধ্যে বহু মুনাফেক তৈরি হবে, যেমন তৈরি হবে ত্রিশজন মিথ্যা নবীর দাবিদার। সুতরাং মুনাফেকী দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি তৈরি করা গেলেও প্রমাণের ভিত্তিতে তা করা সম্ভব নয়। অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারাও সম্ভব নয়।

সুতরাং কুরআন মাজিদ যেমনিভাবে অনন্য এক মুজেযা, তেমনিভাবে নবুওয়াতের দলিল ও আল্লাহর কালাম। মুজেযা নবুওয়াতের দলিল হয়ে থাকে বিধায় কেয়ামত পর্যন্ত এর দাওয়াত জারি থাকবে। এ কুরআন সংরক্ষণের ওয়াদা আল্লাহ করেছেন। শিশু ও বয়স্কদের দ্বারা আল্লাহ

সংরক্ষণ করিয়েছেন। উম্মতের মধ্যে এমন বড় বড় লোক বহু তৈরি হয়েছে যারা বাচ্চাদেরকে কুরআন হিফজ করানোর সাথে সাথে বৃদ্ধ বয়সে নিজেরাও হিফজ করেছেন।

হযরত নানুতবী (রহ.)-এর কুরআন হিফয করার ঘটনা

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) প্রথমবার যখন হজ করলেন তখন করাচীর পথে পালতোলা জাহাজে করে গিয়েছিলেন। সে সময় স্টিমারের ব্যবস্থা ছিল না। পালতোলা জাহাজে করে হজ করতে যেতে হত। বাতাস অনুকূলে থাকলে পাল তুলে দেয়া হত, প্রতিকূল বাতাসের সময় নোঙর করে রাখা হত। জেদ্দা পৌঁছতে পাঁচ ছয় মাস সময় লেগে যেত। যাই হোক, তাদের সফরের মধ্যে রমযান মাস এসে গেল। ঘটনাক্রমে তিনশ' যাত্রীর মধ্যে একজনও হাফেয ছিলেন না। নানুতবী (রহ.)-এর কাছে খুব খারাপ লাগল। এতগুলো মানুষ শুধু সূরা তারাবীহ পড়বে? পুরো কুরআন শুনতে পারবে না? সেদিনই তিনি কুরআন মুখস্থ করতে বসে গেলেন। প্রতিদিন এক পারা করে মুখস্থ করে রাতে তারাবীহর নামাযে পড়তে লাগলেন।

আমি বলি, এও কুরআনের মুজেযা। বৃদ্ধ বয়সে এসেও তা মুখস্থ করা সম্ভব। অন্য কোন গ্রন্থ এভাবে অন্তরে গেঁথে যাওয়া সম্ভব নয়। এটা কুরআনের এক বিশেষ শক্তি। বুঝা যাচ্ছে, কুরআন মানুষের জন্মগত স্বভাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। স্বভাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়কে স্বভাব অনায়াসে আয়ত্ব করতে পারে।

হযরত মাদানী (রহ.)-এর কুরআন হিফয করার ঘটনা

হযরত মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)কে ইংরেজরা গ্রেফতার করে জেলে বন্দি করে রাখে। জেলে বসে তাঁর অন্যকোন কাজ না থাকায় কুরআন শরীফ মুখস্থ করতে শুরু করেন। আনুমানিক দুই তৃতীয়াংশ তিনি সেখানে বসে মুখস্থ করেন এবং প্রতিদিন তা তারাবীহ'র নামাযে পড়ান। এ সময় তাঁর বয়স ছিল সত্তর পঁচাত্তর বছর। এ বয়সে স্মরণশক্তি দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু এও কুরআনের এক মুজেযা। যে তার

প্রতি মনোযোগী হয় কুরআনও তার মধ্যে এসে যায়। যে অমনোযোগী হয় কুরআন তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

অমনোযোগীদের কাছ থেকে কুরআন দূরে চলে যায়

কুরআন শরীফ হাদীসের মধ্যে পলায়নপর উটের সাথে তুলনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, রশি দিয়ে তাকে বেঁধে রাখ। যদি সুযোগ পায় তবে ভেগে যাবে। কুরআন এক সম্ভ্রান্ত কালাম। সে তোমার মুখাপেক্ষী নয়, তুমি তার মুখাপেক্ষী। হাজার বার তার কাছে তোমাকে আসতে হবে। তুমি যদি সামান্য শিথিলতা প্রদর্শন কর তাহলে সে তোমার থেকে দূরে চলে যাবে।

কুরআন যেহেতু আল্লাহর কালাম এবং কারো প্রতি তার মুখাপেক্ষিতা নেই। আমরা তার প্রতি মেহনত করব। এটা তার অনুগ্রহ যে, সে আমাদের কাছে এসে যায়, আমাদের সাথে সংযুক্ত হয় এবং আমাদের শরীরের অংশে পরিণত হয়ে যায়। আর যদি তার প্রতি অমনোযোগী হওয়া হয়, তা হলে সে দূরে চলে যায়, ধরা দেয় না। এজন্যই তাকে পলায়নপর উটের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

কুরআন সংরক্ষণের পদ্ধতি

মুসলমানগণ নানাভাবে কুরআনকে সংরক্ষণ করেছেন। কুরআনের শব্দাবলী সংরক্ষণের ব্যাপারে হাফেযে কুরআনগণ দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রতি যুগেই লাখো হাফেয ছিলেন। অর্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে আলেমগণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তারা কুরআনের অর্থকে সংরক্ষণ করেছেন এবং কিতাব লিখেছেন। তাদের লিখিত কিতাবে লক্ষ লক্ষ কুতুবখানা ভরে উঠেছে। কুরআনের হাকিকত ও মারেফাত সংরক্ষণের ব্যাপারে সুফীগণ দায়িত্ব পালন করেছেন। সে মারেফাতের পরিচয় পেয়ে দুনিয়া বিস্ময়াভিভূত হয়েছে। 'রুসমুল খত' তথা লিখন পদ্ধতির ব্যাপারে আলেমদের একটি দল দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তারা একই বানান রীতিতে কুরআন লেখার ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখেছেন। যেমন- সাধারণভাবে 'রহমান' শব্দটিকে মীমের পরে আলিফ সংযুক্ত করে رحمان লেখা হয় কিন্তু কুরআনের বানানরীতি

অনুযায়ী কুরআন শরীফে আলিফের পরিবর্তে সেখানে খাড়া যবর দিয়ে رحمن লেখা হয়। কুরআনের এ বানানরীতি পৃথিবীর সর্বত্র রক্ষা করা হয়। এমনিভাবে কুরআনের পঠনরীতি সংরক্ষণের ব্যাপারে কারী ও মুজাব্বিদগণ দায়িত্ব পালন করেছেন। আরবগণ যেভাবে পাঠ করে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে পাঠ করেছেন সেই উচ্চারণভঙ্গি হেফাযতের দায়িত্ব তারা পালন করে থাকেন। এমনকি আওয়াজকে পর্যন্ত তারা সংরক্ষণের চেষ্টা করেছেন। অনারবদের মত কিংবা বাঁশির আওয়াজের মত করে যেন পড়া না হয়; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মত করে যেন উচ্চারণ করা হয়– এ ব্যাপারে তাঁরা প্রচেষ্টা করে গেছেন। কুরআনের ধ্বনি উচ্চারণের ব্যাপারে বলা হয়েছে–

يتلون القران بلحون القرب

অর্থাৎ কুরআনকে আরবি লাহানে তেলাওয়াত কর।

অন্যত্র বলা হয়েছে–

زينوا القران باصواتهم، فان صوت الحسنة يزيدا القران حسنا

মধুর আওয়াজ ও দরদভরা আওয়াজে কুরআন তেলাওয়াত কর। এতে কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

কুরআন দ্বারা অমুসলিমরাও প্রভাবিত হয়

অমুসলিমরাও যে কুরআন শুনে প্রভাবিত হয় তার একটি কাহিনী শোনাব। যদি সঠিক লাহানে, দরদ নিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, তাহলে কাফের মুশরিকরাও তাতে প্রভাবিত হয়, যারা সে আয়াতের কোন অর্থই জানে না।

একবার ভারতে কংগ্রেসের এক জনসভায় মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহারকে সভাপতি করা হল। মাওলানা মুহাম্মদ আলী সাহেব স্বভাবগতভাবেই খুব সাহসী ছিলেন। বাহাদুরীর একটি ভাব তাঁর মধ্যে সব সময়ই ছিল। দেড় দুই লক্ষ লোকের জনসভা ছিল। মাওলানা মুহাম্মদ আলী দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে জনসভা

শুরু হবে। লোকজন বলতে লাগল, জনাব! এটা একটি রাজনৈতিক জনসভা। তাও আবার কংগ্রেসের সভা। হিন্দু ও মুসলমান সকলেই এখানে সমবেত হয়েছে। এখানে কুরআনের কী দরকার? যদি আপনি এমন করেন তাহলে পণ্ডিত বলবে– আমিও শ্লোক বলব, পাদরী সাহেব বলবে, আমি ইঞ্জিল পড়ব, ইহুদী কেউ থাকলে সে বলবে, আমি তাওরাত পড়ব।

মাওলানা বললেন, সকলকে সুযোগ দেয়া হবে। সকলেই পড়বে। তবে শুরু হবে কুরআন দিয়ে। এ কথা শুনে সবাই চুপ হয়ে গেল। কারী ইবরাহিম রশিদ ছিলেন একজন আরব। হায়দারাবাদের জামে মসজিদের তিনি ছিলেন খতিব। মাওলানা মুহাম্মদ আলী তাকে ডাক দিলেন এবং কুরআন তেলাওয়াত করতে বললেন। কারী ইবরাহিম সাহেব একে তো আরব ছিলেন, দ্বিতীয়ত খুব মধুর সুরে আরবি লাহানে দরাজ গলার কেরাত পড়তেন। নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে তিনি সূরা সফ পড়তে শুরু করলেন। এক নাগাড়ে আধা ঘণ্টা পর্যন্ত তিনি তেলাওয়াত করলেন। তিনি তেলাওয়াত করছিলেন আর মনে হচ্ছিল যেন লোকজনের মাথার উপর পাখি বসে রয়েছে। তারা কোন নড়াচড়াই করছিল না। বহু অমুসলিম হিন্দুদের চোখ দিয়ে অশ্রুধারা ঝরছিল। তারা কিছুই বুঝছিল না কিন্তু অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। সুতরাং কেউ যদি সঠিকভাবে কুরআন পাঠ করে, উত্তম তাজবিদের সাথে পড়ে, সঠিক আওয়াজে পড়ে তাহলে অমুসলিম কাফের পর্যন্ত তাতে প্রভাবিত হয়।

কুরআনের সংরক্ষকগণ আল্লাহর খলিফা

এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– যখন ওহী অবতীর্ণ হত তখন এমন আওয়াজ শুনতাম যে– كانها صلصلة على صفوان অর্থাৎ তা ছিল যেন ঘণ্টা-ধ্বনির মত। এরপর তা হতে শব্দ তৈরি হত, তাতে অর্থ ও ব্যাখ্যা সংযুক্ত হত। এতে জানা গেল, কুরআন নাযিলের মধ্যে আওয়াজও অন্তর্ভুক্ত। শুধু শব্দ তাঁর অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়নি, শুনানোও হয়েছে। আর যখন শোনানো হয়েছে তখন তাতে পঠনরীতি ও উচ্চারণ ভঙ্গিও ছিল। আর কুরআনের এ পঠনরীতি সংরক্ষণের জন্য স্বতন্ত্র আলেম দলও তৈরি হয়েছে, যাদেরকে মুজাব্বিদ বলা হয়। মুজাব্বিদগণ

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করছেন। মূল পাঠক হলেন আল্লাহ। তারা হলেন তাঁর খলিফা। এমনিভাবে কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

এখানে আল্লাহ তাআলা নিজেকে হাফিয বা সংরক্ষক বলেছেন। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

نَتْلُوْ عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاءِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ

এখানে আল্লাহ নিজেকে তেলাওয়াতকারী বলেছেন। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ

এ আয়াত দ্বারা জানা গেল, কুরআনের মূল কারী বা পাঠক হলেন আল্লাহ। এসব আয়াত দ্বারা জানা গেল, তিনি একাধারে কুরআনের হাফেয, তেলাওয়াতকারী ও কারী। এটা আল্লাহর করুণা যে, যারা কুরআন মুখস্থ করেন তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, আজ থেকে আমার যে উপাধি সে উপাধি তোমারও। কেউ তেলাওয়াত শিখলে বলেন, মূল তেলাওয়াতকারী তো আমি কিন্তু আজ আমি আমার উপাধি তোমাকে দিয়ে দিলাম। তেমনিভাবে মূল কারী তো আমি, কিন্তু যেহেতু তুমি কেরাত পড়ছ তাই তুমিও এ উপাধি ব্যবহার করতে পার।

এভাবেই কুরআনের সংরক্ষকগণ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করছেন।

কুরআন সংরক্ষকগণের উপাধি ও মর্যাদা

আল্লাহ তাআলা কুরআনের বিভিন্ন প্রকারের হেফাযতকারীকে স্বীয় উপাধি দান করেছেন। এটা আল্লাহর এক বিশেষ করুণা। পৃথিবীর নিয়মের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, উপরস্থদের উপাধি ব্যবহার করলে তা শাস্তি যোগ্য অপরাধ বলে বিবেচ্য হয়। যেমন- কেউ নিজেকে প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী দাবী করলে তা শাস্তিযোগ্য বিবেচ্য হবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার নিজস্ব উপাধি 'হাফেয', 'তালী', 'কারী, প্রভৃতি আমাদের ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। এটা কুরআনের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। জান্নাতে যাওয়ার

পর আল্লাহ প্রত্যেক জান্নাতীকে উপাধি দিবেন। সে উপাধিগুলো হবে আল্লাহর নামে।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– জান্নাতীগণকে আনন্দ দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের কাছে চিঠি পাঠাবেন। ফেরেশতাগণ চিঠি নিয়ে আগমন করবেন। যাতে কুশলাদি জানতে চাওয়া হবে। দৈনন্দিনের নানা বিষয়ের খোঁজ নেয়া হবে। কারো কাছে যদি প্রধানমন্ত্রী কিংবা প্রেসিডেন্টের চিঠি আসে তাহলে সে নিজের পজিশন বাড়ানোর জন্য লোকজনকে জানাবেন, পত্রিকায় প্রকাশ করবেন। আগের যুগের বাদশাহী ফরমান যদি কারো ঘরে থাকে তাহলে তারা আজও তা নিয়ে গর্ব করে। আর যদি স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ হতে কারো কাছে চিঠি আসে তাহলে তার অবস্থা কেমন হবে? আল্লাহর চিঠি পাওয়ার পর জান্নাতীদের আনন্দের স্বরূপ কেমন হবে? আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত চিঠির খামের উপর লেখা থাকবে–

من العزيز الرحيم الى العزيز الرحيم

আযিযুর রহীমের পক্ষ হতে আযিযুর রহীমের কাছে প্রেরিত।

'আযিযুর রহীম' হল আল্লাহর উপাধি। তিনি এ উপাধি জান্নাতীদেরকে প্রদান করবেন। কুরআনে কারিমের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, তার পাঠকারীকে আল্লাহ দুনিয়াতেই তাঁর উপাধি ব্যবহার করার সুযোগ দান করেন। কুরআনের সকল কিছুরই মূল অধিকারী হলেন আল্লাহ। বান্দাকে তিনি খলিফা বা প্রতিনিধি মনোনীত করেছেন। কারো ইলমের খেলাফত জুটেছে, কারো আখলাকের খেলাফত জুটেছে, কারো কেরাতের, কারো তেলাওয়াতের খেলাফত মঞ্জুর হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের চেয়ে বড় ইজ্জত আর কী হতে পারে?

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি নিজের সন্তানকে কুরআন হেফয করাবে কেয়ামতের দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষের সামনে তার মাথায় নূরের তাজ পরানো হবে। যার আলোয় সমগ্র ময়দানে মাহ্শার আলোকিত হয়ে যাবে। সাথে সাথে ঘোষণা করা হবে, এ ব্যক্তি তার সন্তানকে কুরআন মুখস্থ করিয়েছেন।

সকল আদম সন্তানের সামনে তাদের তাজ পরানো হবে। এ যেন এক বাদশাহী মুকুট। আপনারা যারা নিজ সন্তানকে কুরআনের হাফেয বানিয়েছেন তারা সে দিন সকল বনি আদমের সামনে বাদশাহী মর্যাদায় থাকবেন। হাফেযগণ দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করছেন, পরকালে শুধু তারাই নন; তাদের পিতাগণও রাজকীয় মর্যাদার অধিকারী হবেন।

কুরআনুল কারীম দীন ও দুনিয়ার উন্নতির সোপান

ইমাম মালেক (রহ.) বলেন–

لا يصلح اخر هذه الامة الا بما صلح به اولها

এ উম্মতের প্রথম যুগের ব্যক্তিবর্গের সংশোধন যার মাধ্যমে হয়েছে শেষ যুগের সংশোধনও তারই মাধ্যমে হবে। আর তা হল কুরআন।

সাহাবায়ে কেরামের কুতুবখানায় কুরআন ছাড়া কোন কিতাব ছিল না। এ কুরআনই তাঁদেরকে সংশোধন করেছে। কুরআনের মাধমেই তাঁরা উচ্চ মর্যাদা ও উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছেন। আজও যদি কেউ উন্নতি করতে চায় তাহলে কুরআনকেই আঁকড়ে ধরতে হবে। কিন্তু কুরআন আঁকড়ে ধরাকে আজকাল লোকজন 'মোল্লা' হয়ে যাওয়া মনে করে। উন্নতির সকল পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া মনে করে। এটা মানুষের নিছক এক অনর্থক চিন্তা। কুরআনই তো হল উন্নতির ধারক বাহক। এ কুরআনই দীন ও দুনিয়া উভয় শিখিয়েছে। এ কুরআন ইলম ও কামালের সাথে সাথে পার্থিব সাফল্য, হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা ও রাষ্ট্র পরিচালনা করাও শিক্ষা দিয়েছে। সৈন্যদল গঠন ও পরিচালনা, রাষ্ট্র পরিচালনা, প্রশাসনিক জীবন, প্রতিপত্তিময় জীবন– পার্থিব এমন নানা বিষয় কুরআন শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং কুরআন শিখলে উন্নতি সাধন হবে না– এটা একটা সম্পূর্ণ ভুল চিন্তা। প্রকৃত উন্নতি তো কুরআনের মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব। আরো গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাব যে, মূল হুকুমত তো আল্লাহর। সুতরাং এখানে যদি কুরআনী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে সেটা মূলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় বিধায় তাতে শৃঙ্খলা ও সাফল্য পূর্ণরূপে অর্জিত হয়। যদি

তা না হয় তাহলে ফিতরাত বা স্বাভাবিকতা পরিপন্থী হয় বিধায় অসম্পূর্ণ, বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ও গোলোযোগপূর্ণ হয়ে যায়। এজন্যই ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার দ্বারা একদিকে যেমন সার্বিক শৃঙ্খলা ও সাফল্য অর্জিত হয় অপরদিকে যারা এর ব্যবস্থা করেন তারা আল্লাহর কাছে সম্মানিত হন। সুতরাং কুরআনুল কারিম পশ্চাদপদতা ও নিচতা শেখায় না; উন্নতি ও সাফল্যের শিখরে নিয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআনী শক্তি মুসলমানদের মধ্যে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা উন্নত ও সম্মানিত থাকবে। এ শক্তি হারিয়ে ফেললে তাদের অধঃপতন অনিবার্য। ইতিহাসে দেখা যায়, মুসলমানগণ যতদিন কুরআনের ধারক ছিলেন ততদিন তারা ছিলেন উন্নতির শিখরে আরোহিত। শুধু নিজেদেরই উন্নতি সাধিত হয়নি, পুরো পৃথিবীর উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল। এরপর যখন তারা কুরআন ছেড়ে দিয়েছে, তখন তাদের মাঝে নেমে এসেছে অধঃপতনের লাঞ্ছনা।

পৃথিবীকে শুদ্ধ ও সংশোধন করার জন্য মুসলমানগণের আগমন ঘটেছে। আর তা তখনই সম্ভব হবে যখন সে শুদ্ধি নিজেদের মধ্যে অর্জিত হবে। ভিক্ষুকরূপে পৃথিবীতে মুসলমানদের আগমন ঘটেনি। পৃথিবীর কাছে কৃষ্টি-কালচার ও সামাজিকতা ভিক্ষা করা মুসলমানদের কাজ নয়। তার দায়িত্ব হল আল্লাহ প্রদত্ত স্বভাবগত সামাজিকতা ও শাসন ব্যবস্থা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করা। পৃথিবীকে আল্লাহর বিধানের দিকে নিয়ে আসা। পৃথিবীর কাছে মাথানত করা তার কাজ নয়।

ঐ শাসকবর্গ বাস্তবিকই সম্মানের যোগ্য, যারা কুরআনকে সামনে রেখে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে চায়, ইসলামী মূলনীতির উপর রাষ্ট্র পরিচালনার ইচ্ছা পোষণ করে। তারা মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য। তাদেরকে সম্মান করা সকলের দায়িত্ব। কারণ, মূল সম্মানের অধিকারী হলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁদেরকে যারা আঁকড়ে ধরবেন তারাও সম্মানের যোগ্য বিবেচিত হবেন।



বয়ান : ৫

মূর্খ আরব থেকে সাহাবার মর্যাদা

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সান্নিধ্যের প্রভাবে তাঁরা এমন এক আদর্শ জীবনের অধিকারী হয়েছিলেন যে, দুনিয়ার অন্যান্য জাতিও তাঁদেরকে নমুনারূপে উপস্থাপন করে। এটা শুধু কুরআনের তালিম ও আত্মাকে পবিত্র করার প্রভাব ছিল। সুতরাং ইলম ও আখলাকের শেষফল এই দাঁড়ালো– যে জাতি পৃথিবীর সকল জাতি থেকে পিছিয়ে ছিল তাঁরা এত উন্নত হয়েছেন যে, পৃথবীর সকল জাতির উর্ধ্বে উঠে গিয়েছিলেন। যে যুগকে জাহিলী যুগ বলে আখ্যায়িত করা হত সেই যুগই কুরআনের তালিমের বরকতে 'খায়রুল কুরুন' নামে পরিচিতি পায়। যাদেরকে 'মূর্খ আরব' বলা হত, যাদের দুশ্চরিত্রের কথা বর্ণনা করে গালাগাল করা হত, কুরআনের তালিমের বদৌলতে এখন সাহাবাদের কথা যখন উল্লেখ করা হয় তখন তাঁদের নামের সাথে লোকজন রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু বলে থাকেন। এ বিপ্লব কীভাবে ঘটল? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আখলাক শিক্ষা ও সান্নিধ্যের বরকতের প্রভাবেই এটা সম্ভব হয়েছে।





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، وَعَدَاللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِىْ ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا وَّمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ o

নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য

বুযুর্গানে মুহতারাম!

পৃথিবীর মানব গোষ্ঠী যখন এমন পেরেশানী ও মসিবতে পতিত হয় যে, তারা না পারে সামনে অগ্রসর হতে আর না পারে সস্থানে স্থিত থাকতে, তাদের অন্তরে যখন কোন স্থিতিশীলতা ও সুখ-শান্তি থাকে না, রাত দিন শুধু পেরেশানী ও মসিবত তাদেরকে অস্থির করে রাখে– এমন পরিস্থিতি যখন তৈরি হয়েছে তখনই আল্লাহ তাআলা আম্বিয়া (আ.)দের প্রেরণ করেছেন। তাঁরা এসে জাতির মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন। পৃথিবীতে নবীগণের আগমন শুধু এজন্যই ঘটে না যে, তারা মসজিদে নামায পড়াবেন কিংবা হজের সফরে হজের নির্দেশনা দিবেন। এগুলো মূল উদ্দেশ্য হলেও এর সাথে সাথে পার্থিব সমস্যাবলীর সমাধান, মানুষের মধ্যে স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা বিধান, মানুষের অধিকার আদায় করণ প্রভৃতি বিষয় নবীগণের কর্তব্যের অন্তর্গত ছিল। যেমনিভাবে তাঁরা পরকালীন মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন, তেমনিভাবে পার্থিব সমস্যাবলী থেকেও পরিত্রাণের ব্যবস্থা করেছেন। যারা তাঁদের অনুকরণ করেছে তারা মুক্তি পেয়েছেন। যারা অনুকরণ বা অনুসরণ করেনি তারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় হারিয়েছেন।

যাই হোক, নবীগণের আগমন দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের জন্যই ঘটেছে। শুধু পরকালের জন্য নয়। হযরত মুসা (আ.)-এর কওম বনি ইসরাইল যখন ফেরাউন কর্তৃক আরোপিত মসিবতে পতিত ছিল এবং ফেরাউন তাদেরকে এমন নিম্নতম জাতিতে পতিত করেছিল যে, তাদের না ছিল পার্থিব কোন মর্যাদা, না ছিল ধর্মীয় কোন মর্যাদা। নিম্ন থেকে নিম্ন পর্যায়ের কাজ তাদের দ্বারা করানো হত। অথচ তারা ছিল নবীগণের বংশধর। তারা লজ্জিত জাতিতে পারিণত হয়ে গিয়েছিল। যাদের ব্যাপারে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

আমি তাদেরকে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

সেই জাতিকে ফেরাউন এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যে, তাদের না ছিল কোন পার্থিব শান্তি, না ছিল পরকালীন কোন আশা। হযরত মুসা (আ.)

তাদেরকে আল্লাহর পথে নিয়ে আসলেন এবং হেদায়েতের পথ দেখালেন। অতঃপর এক সময় তারা ফেরাউনের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেল। আর ফেরাউন নিজেই নিমজ্জিত হল। বনি ইসরাইল স্থিতি লাভ করল। তাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় কল্যাণকর হল।

এরপর বনি ইসরাইল আবারো মসিবতে নিপতিত হল। এটা ছিল হযরত দানিয়া (আ.)-এর যুগ। তিনি তাদেরকে হক পথের প্রতি দাওয়াত জানিয়েছেন। সে পথে চলার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। অন্যথায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভীতি প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু তারা নবীর কথায় কর্ণপাত করেনি। আরাম-আয়েশ ও আনন্দ-ফূর্তিতে বিভোর থেকেছে। নবীর দাওয়াত অস্বীকার করার ফলস্বরূপ বাদশাহ বখতে নসরের অত্যাচার তাদের উপর গযবরূপে নেমে এল। পুরো জাতিকে বখতে নসর ধ্বংস করে দিল। সত্তর হাজারের মত বনি ইসরাইলকে হত্যা করল এবং আরো সত্তর হাজারকে বন্দী করে গোলাম বানিয়ে নিয়ে গেল। বাইতুল মুকাদ্দাসকেও সে ধ্বংস করে দিল। অত্যন্ত মর্যাদাশীল একটি জাতি তাদের বদ আমলের কারণে দুনিয়াতেই ধ্বংস হয়ে গেল। আখেরাতের খবর তো আল্লাহ ভাল জানেন।

বখতে নসর অন্যান্য বন্দীদের সাথে হযরত দানিয়া (আ.)কেও বন্দী করে নিয়ে গেল। তিনি স্বীয় কওমকে বললেন, এ দিনেরই ভয় আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম। আমার কথা না শুনে আজ তোমরাও বিপদে পতিত হয়েছ এবং আমাকেও বিপদে ফেলেছ। তারা তাদের ভুলের জন্য নিজেদেরকে তিরস্কার করতে লাগল এবং লজ্জিত হল। আল্লাহর কাছে দুআ করার জন্য তারা নবীকে অনুরোধ করল। আল্লাহর নবীগণ অত্যন্ত কোমল হৃদয় ও উম্মতের জন্য অসীম ভালবাসার অধিকারী হয়ে থাকেন বিধায় তাদের কারণে নিজে বিপদে পতিত হওয়া সত্ত্বেও সৎপথে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতিতে তাদের জন্য দুআ করতে রাজি হলেন।

বখতে নসর তাদেরকে নিয়ে জেলখানায় বন্দি করেছিল। বখতে নসরের এ কাহিনী শোনানো আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বলতে চাচ্ছি যে, উম্মতের অসৎ কর্মের কারণে নবীকেও জেলে যেতে হয়েছে। অথচ তিনি ছিলেন অত্যন্ত পবিত্র, সম্মানিত ও মুত্তাকী। তাঁকে দেখে জেলের কর্মচারী কর্মকর্তা ও জেলার প্রভাবিত হয়েছে। হাজারো কয়েদী জেলের মধ্যে বসে

সংশোধিত হয়েছেন। কয়েক বছরের মধ্যে তারা আবার শক্তি সঞ্চয় করল। বাইতুল মুকাদ্দাসে পুনরায় তাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। তারা আবার মনোনীত জাতিতে পরিণত হল। মোট কথা, একবার তাদেরকে হয়তো মুসা (আ.) বিপদমুক্ত করেছেন, একবার হযরত দানিয়া (আ.) বিপদমুক্ত করেছেন।

জাহেলী যুগের সংক্ষিপ্ত চিত্র

আরব জাতিও বনি ইসরাইলের মত মহাবিপদে পতিত হয়ে পড়েছিল। অজ্ঞতায় তারা পণ্ডিত ছিল। সবকিছু জানত, চিনত শুধু আল্লাহকে চিনত না। সকল কিছুর পূজা করত শুধু আল্লাহর ইবাদত থেকে বঞ্চিত ছিল। কাবাঘরের আশপাশে তিনশত ষাটটি মূর্তি তৈরি করে রেখেছিল। কাবাঘরের তাওয়াফ করতে গিয়ে এ মূর্তিগুলোর পূজা করত। কাবাঘরের ভেতরে দুটি বড় বড় মূর্তি তৈরি করে রেখেছিল। কাবাঘরে প্রবেশ করলে এ মূর্তিগুলোর পূজা করত। প্রত্যেকের ঘরে ঘরে মূর্তি রক্ষিত ছিল। ঘরে থাকাকালীন এগুলোর পূজা করত। সফরে গেলে পকেটে করে মূর্তি নিয়ে যেত। পথে যদি খোদা পাওয়া না যায় তাহলে পূজা কেমনে হবে? তাই পকেটে করে মূর্তি নিয়ে গিয়ে তার পূজা করত। কোথাও বসলে সুন্দর কোন পাথর যদি চোখে পড়ত তাহলে পকেটের মূর্তিটি ফেলে দিয়ে নতুন সে পাথরটি সংগ্রহ করে তার পূজা করত।

মোট কথা, প্রত্যেক খান্দানের, প্রত্যেক ব্যক্তির খোদা ছিল আলাদা আলাদা। ঘরের খোদা ছিল আলাদা, সফরের খোদা ছিল আলাদা। পূজারীর চেয়ে খোদার সংখ্যা ছিল বেশি। পূজারী তো কয়েক লক্ষ ছিল কিন্তু কোটি খোদা তারা বানিয়ে রেখেছিল।

তাদের এ অবস্থা তো ছিল অজ্ঞতার ভিত্তিতে। তাদের দুশ্চরিত্রতাও ছিল সর্বকালের ভয়ঙ্কর। যিনা ব্যভিচার ও চুরি ডাকাতি ছিল তাদের নিত্যদিনের অভ্যাস। নানা ধরনের বিবাহের প্রচলন তৈরি করে রেখেছিল। লালসা চরিতার্থের বহু পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল। কোন নারীর স্বামী যদি কুৎসিত চেহারার হত তাহলে আইনসম্মতভাবেই সে নারী অন্য কোন শ্রীমান পুরুষের সান্নিধ্যে যেতে পারত। এ পদ্ধতির নামও তারা বিবাহই

রেখেছিল। স্বামী কালো– এ অজুহাতে বহু নারী সুন্দর পুরুষের শয্যাসঙ্গী হতো। ব্যভিচারী আলাদা ছিল। আবার বিবাহের নাম করে এ ধরনের প্রকাশ্য ব্যভিচার চলত। মদ ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। বাচ্চা জন্ম নেয়ার সাথে সাথে তাদের মুখে মদ দেয়া হত। সামান্য সামান্য বিষয় নিয়ে ঝগড়া বিগ্রহের সৃষ্টি হত। এরপর তাকে কেন্দ্র করে গোত্রে গোত্রে, খান্দানে খান্দানে যুদ্ধ বেধে যেত। মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তি উপদেশ ও অসিয়ত করে যেত যুদ্ধ বন্ধ না করতে। এক একটি যুদ্ধ পঞ্চাশ বছর, একশ' বছর পর্যন্ত চলত। নির্দয়তা ও নির্মমতায় এদের তুলনা অন্যটি নেই।

সন্তান মানুষের সবচেয়ে প্রিয় হয়ে থাকে। কিন্তু তারা কন্যা সন্তানকে নিজ হাতে জীবন্ত দাফন করত। শ্বশুর হওয়া এবং অন্য পুরুষ তার ঘরে আসাকে তারা লজ্জাজনক মনে করত। কারো যদি আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল না থাকত এবং দুইয়ের অধিক ছেলে সন্তান থাকত, দু'জন রেখে বাকী জোয়ান জোয়ান ছেলেদেরকে পিতা জবাই করে দিত। বলত, এতগুলোকে খাওয়াবার সামর্থ আমার নেই। অন্যরাও তা মেনে নিত। তাদের এ নির্মমতার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনে আল্লাহ বলেন–

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ

তোমরা দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে ও তোমাদেরকে আমিই রিযিক দান করে থাকি।

নির্মমতায় তারা ছিল বিশ্বসেরা। যারা নিজেদের সন্তানকে হত্যা করতে পারে তারা অন্যের প্রতি কী করে দয়াশীল হবে? অন্যত্র থেকে আগত পথিকদের প্রতি কেমন করে দয়া প্রদর্শন করবে? সুতরাং ডাকাতি, মারামারি, খুনোখুনি, হিংসা-বিদ্বেষ ও নিরাপত্তাহীনতা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল। না তাদের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা ছিল, না তাদের বাদশাহ বা আমীর নির্ধারিত ছিল। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি তাদেরকে ঘৃণ্য দৃষ্টিতে দেখত। কেউ বলত উটের রাখাল, কেউ বলত ভেড়ার খামারী। কেউ বলত আস্ত কুঁড়ে বসবাসকারী। এই ছিল সে জাতির উপাধি।

সুতরাং আরব জাতিকে পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জাতি হিসেবে গণ্য করা হত। তাদের আখলাকও খারাপ ছিল, বাহ্যিক আমলও খারাপ ছিল। তাওহিদের কোন অস্তিত্ব তাদের মধ্যে ছিল না। আপাদমস্তক শিরকে নিমজ্জিত ছিল। শৃঙ্খলা বলতে কিছুই তাদের মধ্যে ছিল না। সার্বক্ষণিক মসিবত ছিল তাদের সঙ্গী। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি তাদের উপর হামলা করত। কখনো রূম, কখনো পারস্য তাদের উপর আক্রমণ করেছে। এর যে কোন একটির গোলামী তাদের করতে হত। এছাড়া তাদের কোন উপায় ছিল না। প্রকৃতপক্ষে দিনে কিংবা রাতে কখনোই তাদের কোন শান্তি ছিল না। মনেও কোন সুখ বা আরাম ছিল না। সম্মিলিতভাবে তারা এক দিশাহারা জাতি ছিল। সুতরাং পার্থিব দিক দিয়েও তারা আপাদমস্তক মসিবতে নিমজ্জিত ছিল আর পরকালীন দিক দিয়েও তারা সম্পূর্ণ পথহারা জাতি ছিল।

নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য

আরব জাতি যখন জাহিলিয়াতের চরম অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তখনই আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেখানে প্রেরণ করলেন। সেই অন্ধকারে ফারান পর্বতের চূড়া হতে নবুওয়াতের সূর্য উদিত হল। সে সূর্যের রশ্মি শুধু হেজাযেই নয়, তার আশপাশসহ পুরো গজতের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি আগমন করেই জাতির সমস্যাবলী সমাধান কল্পে পদ্ধতি গ্রহণ করলেন। তাঁকে পৃথিবীতে প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর ভাষ্যে আমরা দুটি বিষয় দেখতে পাই। একটি হল–

بعثت معلما

আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।

অর্থাৎ ইলমের তালিমের মাধ্যমে আমি তোমাদের অজ্ঞতাকে দূর করে দেব। দ্বিতীয় কারণ বর্ণিত হয়েছে–

بعثت لا تم مكارم الاخلاق

তোমাদের চারিত্রিক পূর্ণতা প্রদানের লক্ষ্যে আমি প্রেরিত হয়েছি।

অর্থাৎ তোমাদের সামনে পবিত্র চরিত্রের নমুনা উপস্থাপন করব এবং তোমাদেরকে সর্বোন্নত চরিত্রের অধিকারী করে সার্বিক পরিপূর্ণ জাতিতে পরিণত করব।

তিনি যে দুটি উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন এ দুটির মধ্যেই জাতির চিকিৎসা নিহিত ছিল। সকল প্রকার মসিবত ও সমস্যার মূলে দুটি জিনিস ছিল। একটি হল তাদের মূর্খতা, আরেকটি হল দুশ্চরিত্রতা।

পশ্চাৎপদ আরব জাতির উত্থান কিভাবে হল

পৃথিবীর কোন জাতি যখন ধ্বংস হয়ে যায় তখন তাদের দু'ধরনের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। ইলম শেষ হয়ে গিয়ে সেখানে মূর্খতা জন্ম নেয়। আর চারিত্রিক পবিত্রতা শেষ হয়ে গিয়ে সেখানে দুশ্চরিত্রতা সৃষ্টি হয়। যখন এ দুটি উপাদান অর্থাৎ মূর্খতা ও জুলুম কোন জাতির মধ্যে প্রবেশ করে তখন সে জাতি কখনো উন্নতি করতে পারে না। আর যখন কোন জাতির মধ্যে ইলম ও ন্যায়পরায়ণতা প্রবেশ করে তাহলে সে জাতি কখনো পিছিয়ে থাকতে পারে না।

সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করে পশ্চাৎপদ জাতিকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়ার মানসে ইলম ও আখলাক শিক্ষা দেয়ার ঘোষণা করলেন। এজন্যই সর্বপ্রথম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যে আয়াত নাযিল হয়েছিল তা ছিল এই–

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ○ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ○ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ○ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ○ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ○

পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ কর, তোমার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। [আলাক : ১-৫]

সুতরাং ইসলামের সর্বপ্রথম নির্দেশ ছিল 'পড়'। এর পর কলমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা লেখার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ পড়া ও লেখা– এই দুই জিনিসের নির্দেশ করা হয়েছে। এ দুটোই কোন জাতির উন্নতির বুনিয়াদ।

আয়াতে পড়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কোন্ ইলম পড়ব? একটি হল দুনিয়াবী ইলম, যার দ্বারা মানুষ রুটি বানানো, ঘর বানানো, পোশাক বানানো প্রভৃতি জিনিস শিখে থাকে। এগুলো হলো জীবনোপকরণ। এগুলোকে ইলম বলা হয় না। এগুলোকে 'তাজরিবাহ' বলা হয়। নবীগণ এগুলো শেখানোর জন্য আগমন করেন না। এগুলো মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। দুনিয়াতে কোন নবীর আগমন না ঘটলেও মানুষ ঘর তৈরি করা, রুটি বানানো, পোশাক বানানো প্রভৃতি করতে পারত। এগুলো শেখানোর জন্য নবীগণ আগমন করেন না। এসবের নাম ইলম নয়। এগুলোর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, তবে তার জন্য নবীর আবশ্যকতা নেই।

স্বভাবগত জ্ঞান দ্বারা মানুষের উৎকর্ষতা সাধিত হয় না

পার্থিব জীবনোপকরণের জ্ঞান মানুষের স্বভাবগত জ্ঞান। শুধু মানুষের নয়, সকল প্রাণীর এ জ্ঞান রয়েছে। কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি, জলজ প্রাণী সকলেরই খাদ্য, বাসস্থান ও অন্যান্য জীবনোপকরণের জ্ঞান রয়েছে। স্বভাবগতভাবেই এ জ্ঞান তারা অর্জন করে থাকে। পাখিরা নিজেদের তৈরি বাসায় থাকে। তাদের মনে আল্লাহ ইলহাম পাঠান– বসে থাকলে খাদ্যের সংস্থান হবে না, মেহনত কর, রুজি মিলবে। ডেরায় শুয়ে থাকা বাঘের মনে আল্লাহর ইলহাম নাযিল হয়– পরিশ্রম কর, আল্লাহ রিযিকের ব্যবস্থা করবেন। কোন ছাগল কিংবা হরিণ মিলিয়ে দেবেন। এভাবে প্রত্যেক প্রাণীকে আল্লাহ আহার বিহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন।

মানুষও যদি মেহনতের মাধ্যমে পানাহার বাসস্থান ও অন্যান্য উপকরণের ব্যবস্থা করে তাহলে সে বেশির বেশি প্রাণীদের হক আদায় করে। একে ইলম বলা যায় না। পার্থিব জীবনোপকরণের জ্ঞানের নাম যদি ইলম হত

তাহলে পাখিও তো আলেম। হিংস্র প্রাণীরাও তো আলেম। পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী আলেম হয়ে যেত। কারণ তাদের সকলের এ জ্ঞান রয়েছে।

মানুষ যদি পার্থিব সাফল্যের ভিত্তিতে নিজেকে আশরাফুল মাখলুকাত ও আলেম ভাবে তাহলে সে ভুল করবে। এ জ্ঞান তো প্রাণীদেরও রয়েছে। মৌমাছি কতই না সুন্দর ঘর বানায়। মৌচাকের চারদিকে তারা ছিদ্র তৈরি করে। আপনি নানা প্রকার হাতিয়ার ও উপকরণ দিয়ে বহু কষ্টে হয়তো সে রকম বানাতে পারবেন। নিজের বাসস্থান বানাতে আপনার বহু শ্রম ব্যয় হয়। অথচ মৌমাছি শুধু মুখ দিয়ে তার ঐ অপূর্ব মৌচাক তৈরি করে। এতে তাদের কোন বেগ পেতে হয় না। প্রতিটি ছিদ্র একই মাপের। এরপর তার ভেতরের ব্যবস্থাও আরো সুন্দর। কোন কোন অংশে মধু ভরা থাকে। এ যেন জাতির খাদ্যভাণ্ডার। কোন কোন অংশে সন্তানরা লালিত পালিত হয়। কোন কোন অংশে মা-বাবা থাকে। তাদের আবার একজন নেতা থাকে। সকল মৌমাছি তার আনুগত্য করে। সে যেখানে বসে, সকলে সেখানে বসে মৌচাক গড়ে। মোট কথা, তাদের মধ্যে শাসন ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা রয়েছে। নেতা নির্বাচন ও তার আনুগত্য রয়েছে। কাজের বণ্টন ব্যবস্থা রয়েছে। মানুষও যদি এমনিভাবে নিজের জাতির শৃঙ্খলা বিধান করে, উন্নত বাসস্থান নির্মাণ করে, কর্মবণ্টনের মাধ্যমে পানাহারের সকল ব্যবস্থা করে তাহলেও তাদের সে কাজ মৌমাছিদের কাজের চেয়ে বেশি কিছু নয়। এর নাম ইলমও নয়, উৎকর্ষতাও নয়। এগুলো তো অভিজ্ঞতালব্ধ স্বভাবসুলভ কিছু কাজ। যা সকল মানুষ ও প্রাণী করতে পারে। সারকথা হল এই, স্বভাবলব্ধ জ্ঞান নিজ নিজ স্তর অনুযায়ী প্রাণীদের মধ্যেও রয়েছে। যদি মানুষও তেমন জ্ঞানের অধিকারী হয় তাহলে তা এমন কোন উৎকর্ষতা নয় যে, তার ভিত্তিতে মানুষ নিজেকে আশরাফুল মাখলুকাত দাবী করতে পারে।

প্রাণীদেরও চিকিৎসা-জ্ঞান রয়েছে

আপনি হয়তো বলবেন, আমরা অসুস্থ হলে আমাদের কাছে চিকিৎসা জ্ঞান আছে। আমরা ওষুধ পথ্য ব্যবহার করে সুস্থ হতে পারি। এটা শুধু মানুষই

করতে পারে, অন্য প্রাণী করতে পারে না। এজন্য আমরা আশরাফুল মাখলুকাত।

আমি বলি, প্রাণীদের মধ্যেও নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী চিকিৎসা-জ্ঞান রয়েছে। প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও তারা রোগের চিকিৎসা ও প্রতিকার করে থাকে।

এ বিষয়ে আমার একটি ঘটনা মনে পড়ছে। আমি একবার রাজপোতানে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার কিছু প্রিয়ভাজন ব্যক্তি চাকরি করত। হিন্দুদের শাসন ছিল। বানর তাদের কাছে দেবতাতুল্য বিধায় তা মারা নিষেধ ছিল। বানরগুলো আমাদের খুব ক্ষতি করত। ঘরের দরজা একটু খোলা থাকলেই কাপড়-চোপড়, থালাবাটি নিয়ে যেত। আর এ পাঁজিগুলো এমনই বিরক্তিকর জানোয়ার, নিয়ে যে ফেলে দেবে এমন নয়; মন্দিরের সামনে বসে দেখিয়ে দেখিয়ে সেগুলো ছিঁড়ে নষ্ট করবে। কষ্ট দেয়ার ক্ষমতা ছিল সেগুলোর আশ্চর্য ধরনের। চরম বিরক্তি লাগত, গা জ্বলে যেত। যেন ইচ্ছা করেই ক্ষেপিয়ে তুলতে চাইত। মারতে নিষেধাজ্ঞা ছিল বলে মারতেও পারছিলাম না। চুপে চুপে দশ বিশটা বানর অবশ্য মেরেছিলাম। কিন্তু ছিল তো হাজার হাজার। আমরা চাচ্ছিলাম, এক দেড়শ' বানর যাতে মারতে পারি তার একটা ব্যবস্থা করতে। তা করতে পারলে হয়তো ওদের কিছুটা শিক্ষা হত, আমাদেরকে একটু কম জ্বালাতন করত। এরপর আমরা কিছু বিষ কিনে আটার সাথে মিশিয়ে রুটি তৈরি করালাম। রুটিগুলো ছাদে ছড়িয়ে রাখলাম। আমাদের আশা ছিল, বানরগুলো এসেই খেতে শুরু করবে, আর মারা পড়বে। প্রতিশোধ নিতে পেরে আমরা খুব খুশি হব। কিন্তু বানরগুলো খুবই চালাক। খুবই সেয়ানা। কয়েকটি বানর এসে রুটিগুলো দেখল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখে ওরা আশ্চর্য হল। একটি আরেকটির দিকে মুখের দিকে তাকায় আবার রুটির দিকে তাকায়। যেন একটি অপরটিকে জিজ্ঞেস করছে ব্যাপার কী? এমন তো হওয়ার কথা নয়। দুই চার মিনিট পরে তিন চারটি বানর চলে গেল। আমরা বুঝলাম, আমাদের পদ্ধতি ফেল হয়ে গেছে। সেগুলো গিয়ে তাদের সম্প্রদায় বা গোত্রের কাছে হয়তো খবর দিয়েছে। মোটাসোটা পনের বিশটি বানর এসে রুটির পাশে বসে পড়েছে। এগুলোও এসে পরস্পরের মুখের দিকে ও রুটির দিকে তাকাতে লাগল। রুটিতে কেউ হাত দিল না।

আমরা বুঝলাম, এরা ব্যাপারটা ধরে ফেলেছে। এর কিছুক্ষণ পরে আমরা দেখলাম, এক দেড়শ' বানরের একটি বড় দল এসেছে। এ দলের মধ্যে কয়েকটি বেশ মোটাসোটা বানর ছিল। যেন দলপতি। সেগুলো এসে রুটির আশপাশে বসে পড়ল। যেন গোল মিটিংয়ে বসে গবেষণা হচ্ছিল, রুটি কেন পড়ে রয়েছে। বিষয়টি কী? সাধারণত এমনভাবে রুটি পড়ে থাকে না। এরপর একটি বানর এগিয়ে একটি রুটি ছিঁড়ে ঘ্রাণ নিল। তারপর আরেকটি এগিয়ে গিয়ে একই কাজ করল। একই কাজ চার পাঁচটি বানর করল। এরপর তারা ইশারায় কিছু একটা বলল হয়তো, সবগুলো সেখান থেকে ভেগে গেল। আমরা নিশ্চিত হলাম, আমরা ব্যর্থ হয়েছি। রুটিগুলো কী করা যায় ভাবছিলাম। মাটি চাপা দেয়া ছাড়া কিছু তো করার নেই।

এরপর মিনিট দশেক সময় অতিবাহিত হওয়ার পর দুই আড়াইশ' বানরের একটি দল দৌড়ে চলে এল। সকলের হাতে হরহরে পাতার একটি করে ডাল। সবাই এসে রুটির পাশে বসে রুটিগুলো টুকরো করল। যতগুলো বানর ছিল আনুমানিক ততগুলো টুকরো করল। রুটি ছিল মোট পঞ্চাশটি। প্রত্যেকে যেন পেতে পারে সে ব্যবস্থা করল। 'বানরের বণ্টন' বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। প্রত্যেকে এক এক টুকরো করে খেল। এর হাতে রাখা পাতা মুখে পুরে চিবাল। তারপর চলে গেল। কমবখ্তগুলো না টললো, না মরল, না বেহুঁশ হল।

সুতরাং মানুষ একাই শুধু ডাক্তার নয়, তাদের মধ্যেও ডাক্তার রয়েছে। আপনার ঔষধজ্ঞান আছে তো, প্রাণীদেরও আছে। ডাক্তার হওয়া বা ডাক্তারী জ্ঞান অর্জন করা এটা শরীর ঠিক রাখার ইলম। শরীর সুস্থ রাখার কাজ প্রাণীরাও করে থাকে। এটা তো বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নয় যে এর ভিত্তিতে মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বলা হবে।

একটি সন্দেহের জবাব

আপনি যদি দাবী করেন আমরা পোশাক শিল্পে উন্নতি সাধন করেছি। বহু উন্নত কাপড়ে বহু আকর্ষণীয় ডিজাইনে আমরা পোশাক তৈরি করছি। আমরা অনেক অনেক সূক্ষ্ম সুতা দিয়ে কাপড় তৈরি করছি। সুতরাং এ জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাদেরকে আশরাফ বলা চলে। আমি বলব, আপনার এ

ধারণাও ভুল। আপনি বন্যপ্রাণী, পশুপাখি, কীট-পতঙ্গের দিকে তাকান। আপনি দেখতে পাবেন, আপনার পোশাক জগতের চেয়ে জীবকুলের পোশাক বর্ণে, ডিজাইনে ও স্থায়ীত্বে অনেক উন্নত। বাঘের শরীরের দিকে তাকান। কী অপূর্ব চামড়া আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। যেন উজ্জ্বল বর্ণের এক কম্বল পরে আছে। আপনার পোশাক তো দু'চারদিন পরলেই ময়লা হয়ে যায়। বাঘের চামড়া ময়লা হয় না। বছরের পর বছর শরীরে রয়েছে, একটু বিবর্ণ হচ্ছে না। পাখি ও কীট-পতঙ্গের দিকে তাকান। বর্ণ ও ডিজাইনের সমাহার। মাকড়সার জালের দিকে তাকান, কী অপূর্ব কারিগরি। যেন সাদা একটি তাঁবু তৈরি করে তাতে বসে আছে। অতি সূক্ষ্ম সুতা তার। আমাদের কোন কাপড়ের সুতাই তার সাথে তুল্য নয়। এ জাল কী করে সে বোনে? কোন মেশিন তার কাছে নেই। শুধু মুখ আর হাত ব্যবহার করে বোনে। এর বুনন কত নিখুঁত। আপনি এর চেয়ে ভাল বুনতে সক্ষম হবেন না। আপনি নানাবিধ মেশিনপত্র দিয়ে যা পারেন, সে তা বিনা মেশিনে অনায়াসে করতে পারে। সুতরাং স্বভাবগত এমন কোন বিষয় নেই যা প্রাণীকুলের মধ্যে পাওয়া যায় না।

আমার আলোচনার উদ্দেশ্য হল স্বভাবগত যেসব বিষয় রয়েছে সেসব বিষয়ের ইলম নিয়ে নবীগণ আগমন করেননি। পানাহার, বসবাসসহ এ জাতীয় আরো যেসব বিষয় রয়েছে তার জ্ঞান সামর্থ্য অনুযায়ী প্রাণীকুলের রয়েছে। এগুলোর জ্ঞান এমন কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য বহন করে না যা নিয়ে মানুষ গর্ব করতে পারে।

রাসূলগণ আনীত ইলম কোনটি

জৈবিক চাহিদা পূরণের ইলম নিয়ে নবীগণ আগমন করেন না। তাঁদের কাজ হল রূহের সংশোধন। বান্দাকে সঠিক পথে নিয়ে আসা এবং পথহারাদেরকে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করা। তাদের মধ্যে ইলম ও আখলাকে রব্বানী সৃষ্টি করা, সরল অর্থে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব আনয়ন করা। অর্থাৎ মানুষকে মানুষরূপে গড়ে তোলার জন্যই নবীগণ আগমন করেন। এ জন্য সেই ইলমের প্রয়োজন যা দিয়ে রূহ ও কলব সংশোধন হয়। শারীরিক বিষয়াবলীর জন্য যে জ্ঞান প্রয়োজন তা প্রাণীদেরও রয়েছে।

এর জন্য নবীর প্রয়োজনীয়তা নেই। নবীগণের ইলমের উৎস হলেন আল্লাহ। আল্লাহর পক্ষ হতে আগত ইলমের ভিত্তিতে রূহের মধ্যে নূরানিয়াত সৃষ্টি হয়। আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর ইলম, তাঁর আহকামের ইলম ও তাঁর শরীয়তের ইলম অর্জিত হয়। এটাই সবচেয়ে বড় ইলম, যার দ্বারা মানুষ 'মানুষ' হয়ে ওঠে। এ ইলম নিয়েই নবীগণ আগমন করেন। যে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ

পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।

এটা কুরআনের প্রথম আয়াত। এর অর্থ, ঐ ইলম অর্জন কর যাতে সর্বাগ্রে রবের নাম আসে, রবের পরিচয় লাভ হয়। গাছপালা, প্রাণীকূল, পাহাড়-নদী কিংবা রূপ-সৌন্দর্যের জ্ঞান অর্জন করে নেয়া বড় কোন বিষয় নয়। নিজের প্রভুর পরিচয় অর্জন করতে পারাই মুখ্য। তাঁর সত্তা কেমন, তাঁর গুণাবলী কেমন, তাঁর শান কেমন, তাঁর আহকাম কেমন, তাঁর দেয়া বিধান কী– এসব জানাই আবশ্যকীয় বিষয়। এগুলোর জ্ঞান প্রাণীদের দেয়া হয়নি, মানুষকে দেয়া হয়েছে। এ জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ মানুষকে তাঁর খলিফা সাব্যস্ত করেছেন। তারা আল্লাহর ইলমের ধারক, বিবেক বুদ্ধিতে তারা উন্নত। এ ইলম দ্বারা বিবেকও সংশোধিত হয়। এ ইলমের অধিকারী করে নবীগণকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং নবীগণ এসে মানুষকে মানুষরূপে গড়ে তোলেন। তাদের মধ্যে ইলম ও আখলাক সৃষ্টি করে মনুষ্যত্বকে প্রস্ফুটিত করেন।

আরব জাতির মধ্যে ইলমে রব্বানীর প্রভাব

দুশ্চরিত্রতা ও অজ্ঞতায় নিমজ্জিত আরব জাতিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আহ্বান জানালেন তখন তারা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ইলম অর্জন করতে শুরু করল। কুরআনে কারিম তাদের অন্তরে প্রবেশ করল এবং তাদের আখলাককে উন্নত করল। মাত্র তের বছরের মধ্যে তাদের অবস্থা এমন দাঁড়াল যে বড় বড় সালতানাতের ভিত উল্টে দিল। দুনিয়ায় বিপ্লব ছড়িয়ে দিল। তাদের উত্থান ও কর্তৃত্ব সমগ্র দুনিয়ায় ছড়িয়ে

পড়ল। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে অর্ধ জগতের মধ্যে তাদের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হল। শুধু এই কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত আখলাক ও ইলমের বদৌলতে এটা সম্ভব হয়েছে। যারা একটি পয়সার জন্য জীবন দিত, অন্যের মাল লুট করত, ডাকাতি করত তাদের অন্তরকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে পরিশুদ্ধ করলেন, দুনিয়ার ধনভাণ্ডার তাদের পদতলে আসার পরেও তা নিজে রাখার বদলে অন্যকে বিলিয়ে দিতেন। তাদের অন্তর ধনী হয়ে গিয়েছিল। সম্পদকে তারা খাদেম মনে করত। নিজেকে সম্পদের খাদেম মনে করত না। এমন প্রাচুর্যেরই অধিকারী হয়েছিল তাদের আত্মা।

হাদীসে এসেছে, একবার হযরত আলী (রা.) বাইতুল মাল দেখতে গেলেন। দেখলেন, সোনা রূপার স্তূপ জমা হয়ে আছে। বললেন–

يادنيا غرنى غيرى

> হে পৃথিবী! আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোকা দাও। আমি তোমার ধোকায় বিভ্রান্ত হব না। আমি তোমাকে কামনা করি না।

এই বলে সেগুলো গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। লক্ষ লক্ষ টাকার সে সম্পদ রাতভর বণ্টন করা হল।

এ তো ছিল বাইতুল মালের সম্পদের কথা। নিজস্ব সম্পদের ব্যাপারেও এমন ঘটনা অসংখ্য রয়েছে। সম্ভবত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা.)-এর ঘটনা। তিনি লাখপতি সাহাবী ছিলেন। আমির সাহাবাগণের মধ্যে তিনি গণ্য হন। একদিন তিনি উদাস ও চিন্তিত অবস্থায় ঘরে এলেন। তাঁকে চিন্তাযুক্ত দেখে তার স্ত্রী কারণ জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, ভাণ্ডারে অনেক সম্পদ জমা হয়ে আছে। নিজের কাছে বোঝা মনে হচ্ছে। বুঝতে পারছি না কী করব! এজন্যই মন খারাপ। তাঁর স্ত্রীও ছিলেন সাহাবিয়া। বললেন, এতে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দিন। তিনি যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। সাথে সাথে মাল বণ্টন করার নির্দেশ দিলেন। রাতভর মদীনার গলিতে গলিতে টাকা বণ্টন হতে লাগল। গরীব, বিধবা, ইয়াতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের মধ্যে সকাল পর্যন্ত টাকা

বিতরণ চলল। হিসাব করে দেখা গেল, রাতের মধ্যে ছয় লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। স্ত্রীকে ধন্যবাদ জানালেন। বললেন, খুব সুন্দর একটি পথ বাতলে দিয়েছ। নিজেকে এখন খুব হালকা মনে হচ্ছে।

এরাই ছিল সেই মানুষ যারা একটি টাকার জন্য জীবন দিতে ও জীবন নিতে প্রস্তুত ছিল। আজ তাদের মধ্যে এমন স্বচ্ছলতা এসেছে যে, এক ব্যক্তি এক রাতের মধ্যে ছয় লক্ষ টাকা দান করে দেয় এবং তা করতে পেরে খুশি হয়। এই ধনাঢ্যতা কোত্থেকে এল? চরিত্রের এই মহানুভবতা কোত্থেকে এল? এ ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সান্নিধ্যের প্রভাব। তাঁর তালিম ও কুরআনী তালিমের প্রভাব, যা আত্মা হয়ে সাহাবাদের ভেতর প্রবেশ করেছিল।

এ তো ছিল পুরুষদের অবস্থা। মুখ দেখেই পুরুষদের মধ্যে বদান্যতা সৃষ্টি হয়। নারীদের মধ্যে সম্পদের মোহ একটু বেশি থাকে। সম্পদ, অলংকার এসব তাদেরকে খুব আকৃষ্ট করে। জন্মের পর থেকে তারা নানা অলংকারে ভূষিত থাকে বলে তাদের মধ্যে এসবের মায়া তৈরি হয়।

কোন এক মহাজনের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে। মহাজন তার স্ত্রীকে মশলা পেষার শিলপাটাটি তার কাছে নিয়ে আসতে বললে, স্ত্রী বলল– আমি এটা কিভাবে তুলব? আমার শরীরে কি অত শক্তি আছে?

মহাজন চিন্তায় পড়ে গেলেন। ভাবলেন, আমি কৃষক মানুষ। কিছুটা বোঝাবিড়া বইতে পারার মত সামর্থ্য আমার স্ত্রীর থাকা উচিত। এমন নাজুক নারীর সাথে আমার ঘর-সংসার কেমনে চলবে। দুই সের ওজনের একটি পাটা সে তুলতে পারে না। কিন্তু সে মহাজনও বেশ হুশিয়ার ছিল। সন্ধ্যায় এসে চুপি চুপি পাটাটি নিয়ে গেল। তার উপরে স্বর্ণের প্রলেপ লাগিয়ে তার সাথে শেকল জুড়ে দিয়ে মালার মত করে বানিয়ে আনল। স্ত্রীকে এসে বলল, তোমার জন্য একটি অলংকার এনেছি। অলংকারটি অনেক বড়। ভেঙ্গে অন্য কিছু করার মত অবস্থাও নেই। এরপর সেটি দেখিয়ে বলল, তুমি কি এটা পরবে?

স্ত্রী বলল, অবশ্যই পরব। এরপর সে তা গলায় পরে হাঁটতে লাগল। কাজ কাম করছিল। যেন কোন অসুবিধাই হচ্ছিল না।

মহাজন বলল, অলংকার ভাল হয়েছে তো? বোঝা মনে হচ্ছে না তো?

স্ত্রী বলল, না, কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

মহাজন বলল, আরে হতভাগা! এটা হল সেই পাটা যা তুমি উঠাতে পারছিলে না। আজ তার সাথে আরো আধা সের ওজন বেশি নিয়ে তুমি গলায় দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ। তা শুধু এ কারণে যে, এতে স্বর্ণের নাম যুক্ত হয়েছে।

যাই হোক, স্বর্ণ-রৌপ্যের মোহে নারীরা নিমজ্জিত থাকে। পুরুষদেরকেও তারা প্রভাবিত করে। কিন্তু হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সান্নিধ্যের ফয়েযে নারীদের অন্তরও এমন সমৃদ্ধশালী হয়েছিল যে, তা স্বর্ণ-রৌপ্যের বহু ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছিল।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর ভাগ্নে হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর মক্কার হাকিম নিযুক্ত করা হয়েছিল। একটি ধনভাণ্ডারে স্বর্ণ-রৌপ্য, আশরাফি ও অন্যান্য মুদ্রা ভরে পূর্ণ করে হাদিয়াস্বরূপ তা খালা আয়েশা (রা.)-এর কাছে প্রেরণ করলেন। আয়েশা (রা.) দাসীকে বললেন, এত সম্পদ দিয়ে আমি কী করব? গরীবদের মাঝে বিতরণ করে দাও। সারা দিন দান করার পর তা শেষ করা গেল। লক্ষ টাকা স্বর্ণ-রৌপ্য ছিল, সব বিতরণ করা হল। সন্ধ্যায় দাসী বলল, উম্মুল মুমিনীন! তিন দিন যাবত আপনি অনাহারী, কিছু টাকা নিজের জন্য রাখতেন!

তিনি বললেন, আরে বেয়াকুব! আগে কেন বলনি, দু'চার টাকা রেখে দিতাম। সব শেষ করে বললে!

কেমন ছিল তাঁদের অবস্থা? তিন দিন অনাহারী থাকা সত্ত্বেও নিজের জন্য কিছু রাখার কথা তাঁদের স্মরণ থাকে না। কেমন পূর্ণতা এসেছিল তাঁদের আত্মায়! নারীদের অন্তর যখন এমন হয়ে গিয়েছিল– অনুমান করুন, পুরুষদের অবস্থা কেমন ছিল।

আখলাকের পবিত্রতার ভিত্তিতে পবিত্র কাজ সম্পাদিত হয়

আম্বিয়া (আ.)গণ বিশেষ করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর সমস্যাবলীর সমাধান কল্পে তাশরিফ এনেছেন। আর সেজন্য তিনি দুটি পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। একটি তালিম, অপরটি তারবিয়াত। তালিমের মাধ্যমে তাদেরকে ইলম শিক্ষা দিয়েছেন। যাতে করে লোকজনের মধ্যে ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি হয়, অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায়। অন্ধকারে কোন জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে না, মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছতে পারে না। এজন্যই তিনি ইলমের দ্যুতি ছড়িয়েছেন। দ্বিতীয় বিষয় ছিল তারবিয়াত তথা আমলের শক্তি। আর তা আখলাকের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়ে থাকে। তিনি তাদের আখলাক শুদ্ধ করেছেন। কাজের যে যোগ্যতা কলবের মধ্যে থাকে তা যতক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমল শুদ্ধ হতে পারে না। প্রত্যেক আমলের জন্য কলবের মধ্যে একটি যোগ্যতা থাকে। যদি সে যোগ্য না থাকত তবে কাজটি প্রকাশ পেত না। যেমন- দান-খয়রাত করা বা গরীবদের কিছু দেয়া। এ কাজটি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকাশ পাবে না যতক্ষণ অন্তরের মধ্যে খাসাওয়াত বা বদান্যতা তৈরি না হবে। অন্তরে বীরত্ব না থাকলে যুদ্ধ বা কারো উপর হামলা করার কাজ প্রকাশ পাবে না। খারাপ কিছু করতে গেলে মানুষ লজ্জিত হয়ে ফিরে থাকে। অন্তরের ভেতর লজ্জা না থাকলে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা যায় না।

আখলাকের উদাহরণ বীজের মত। বীজ যেমন তার গাছও তেমন হবে, ফলও তেমন হবে। তেমনিভাবে আখলাকের মতই ব্যক্তির আমল হয়ে থাকে। আমলের ফলাফলও তদ্রূপ হয়ে থাকে। ইসলামের পূর্বে যেহেতু আখলাক খারাপ ছিল তাই তাদের আমল ও অবস্থাও খারাপ ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করে তাদের আখলাক পরিশুদ্ধ করে তুললেন। পরিশুদ্ধ আখলাক হতে পরিশুদ্ধ কাজ প্রকাশ পেতে শুরু করল। পবিত্র আমলের ভিত্তিতে পবিত্র ফলাফল সামনে আসতে শুরু করল।

সাধ্যমত প্রচেষ্টা করা আবশ্যক

আখলাক ঠিক না হলে আমল ঠিক হয় না। কিন্তু যদি আখলাক ঠিক হয় কিন্তু ইলম না থাকে তাহলে আমলের পথ দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং ইলম, আখলাক ও চলার শক্তি সবকিছুই প্রয়োজন। ইলম অর্জিত হয় তালিমের মাধ্যমে আর আখলাক ও অন্তরের শক্তি আসে তারবিয়াতের মাধ্যমে।

যদি কোন জাতির মধ্যে ইলম না থাকে, আখলাকের তারবিয়াত না থাকে, তাজকিয়ায়ে নফস বা আত্মশুদ্ধি না থাকে তাহলে মানুষ আল্লাহ পর্যন্ত কিভাবে পৌছবে? সে ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে করণীয় হল, নিজেদের সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এর সাথে সাথে আল্লাহর হেফাযত কামনা করতে হবে। আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে। তাহলে আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যাবে। আল্লাহর উপর ভরসা না করলে সাহায্য আসবে না। নিজের সাধ্যমত প্রচেষ্টা করে আল্লাহর কাছে আরয করতে হবে– 'হে আল্লাহ! আমার সাধ্যমত যতটুকু করণীয় ছিল আমি তা করেছি। এরপর আপনার হাতে দায়িত্ব সমর্পণ করলাম।' এরপর আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য শুরু হবে।

এ প্রসঙ্গে হযরত শায়খ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রহ.)-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। শায়খ ফরিদ উদ্দিন (রহ.) শরীয়তের বিধানমত একটি ফতোয়া দিয়েছিলেন যা সে সময়ের বাদশাহর মনমত হয়নি। এ কারণে বাদশাহ তাঁকে জেলে পুরে রেখেছিল। জেলের মধ্যে তাঁর অভ্যাস ছিল, জুমার দিন সকাল থেকে জুমার প্রস্তুতি নিতেন। সকালে উঠে সাপ্তাহিক পরিচ্ছন্নতা সেরে গোসল করতেন। আযান হওয়ার পর জামা কাপড় পরিধান করে জুমার নামাযের জন্য এগিয়ে যেতেন। গেট পর্যন্ত গিয়ে দেখতেন গেট তালাবদ্ধ। তিনি ফিরে এসে তাঁর কক্ষে বসে জোহরের নামায আদায় করতেন। এটা তাঁর প্রতি জুমার নিয়মিত অভ্যাস ছিল। প্রতি জুমায় তাঁকে এ কাজ করতে দেখে লোকজন কারণ জানতে চাইলে বললেন, আমি জানি আমি তালাবদ্ধ এবং সে তালা খোলার সাধ্য আমার নেই। কিন্তু জুমা আদায় করার জন্য যতটুকু কাজ করার সাধ্য আমার রয়েছে, ততটুকু কাজ তো আমি করতে পারি। যেটা আমার সাধ্যের বাইরে

তা আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে দেই। বলি, হে আল্লাহ! জেলের দরজা পর্যন্ত আসার সাধ্য তো আমার ছিল, আমি তা করেছি। এর পরেরটা আমার সাধ্যের বাইরে। আমার ইচ্ছা হল আমি আপনার নির্দেশ পালন করব। আপনার হুকুমের উপর আমি সন্তুষ্ট।

সুতরাং এমন পদ্ধতিই হওয়া আবশ্যক। যতটুকু নিজের সাধ্যের মধ্যে রয়েছে ততটুকু করতে হবে। এর পরেরগুলো আল্লাহর হাতে সমর্পণ করতে হবে।

হযরত শায়খুল হিন্দ বলতেন, আল্লাহ তাআলা যদি আমাকে এই নির্দেশ দেন– 'হে মাহমুদ হাসান! তুমি আকাশে চলে এসো।' এটা স্পষ্ট যে মানুষ আকাশে পৌঁছতে পারে না। কিন্তু আমি এ কথা বলব না, আমি পৌঁছতে পারব না। আমি বলব, আল্লাহ! আমি আসছি। আর আকাশে পৌঁছার জন্য আমি পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টিতে গিয়ে আরোহণ করব। এতে যদি আমার দশ মাস সফর করা লাগে, করব। সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু চূড়ায় যে উঁচু গাছটি রয়েছে সেখানে আরোহণ করে বলব, এ পর্যন্ত আমার সামর্থ্যে ছিল, এর বাইরে আমার সাধ্যে নেই। এখন আপনি আমাকে আসমানে পৌঁছে দিন।

দীন ও দুনিয়ার কাজের মধ্যে এই পদ্ধতিই আবশ্যক। যতটুকু মানুষের সামর্থ্যে কুলায় ততটুকু সে করবে, বাকিটা আল্লাহর উপর হাওয়ালা করে দেবে।

নিজেকে নিজের জিম্মাদার মনে করে সকল কাজ নিজে করে নেয়ার মানসিকতা পরিত্যাজ্য। সকল ক্ষেত্রে মানুষের কর্মশক্তি কার্যকর নয়। যতটুকু সম্ভব করে নিতে হবে। নামাযের হুকুম হয়েছে নামায পড়তে হবে। মনে করুন, আপনার মসজিদ পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ্য নেই। তাহলে দরজা পর্যন্ত যান। আর সামনে যেতে না পারার অক্ষমতার কথা আল্লাহর কাছে প্রকাশ করুন– আল্লাহ! সামনে অগ্রসর হওয়ার সাধ্য আমার নেই। আপনার সামর্থ্য যতটুকু ছিল আপনি তা কাজে লাগিয়েছেন। যদি খাটের উপর বসে বলে দেন, আমি মসজিদে যেতে পারি না, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে এ শিক্ষাই দিয়েছেন। যতটুকু তাদের সামর্থ্যের মধ্যে ছিল, তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টায় তা করতেন। জীবন দিতে পর্যন্ত পিছপা হতেন না।

মোট কথা, জাতি যখন দীনি ও দুনিয়াবী কোন সমস্যার সম্মুখীন হবে তখন সর্বাগ্রে কুরআনের তালিমের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। এ সমস্যার কুরআন কী সমাধান দিয়েছে। যারা কুরআন জানে, বুঝে তাদের কাছে সমস্যা উপস্থাপন করে কুরআনের বিধান জেনে নিতে হবে। কুরআনে সমাধান না পাওয়া গেলে হাদীসে কিংবা সাহাবা, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈনদের জীবনে খুঁজতে হবে। যদি অন্তরের অস্থিরতা হয়, ইবাদতের পথ গ্রহণ করতে হবে। যদি দুনিয়াবী বিষয় হয়, সঠিক সামাজিকতার পথ খুঁজে নিতে হবে। যদি রূহানী সমস্যা হয়, আখলাককে পরিশুদ্ধির পথ গ্রহণ করতে হবে। এগুলোর প্রত্যেকটির জন্যই মেহনত করতে হবে। ঘরে বসে বসে পাওয়া যাবে না।

অমুসলিমদের আপত্তি

ইসলামের উপর অমুসলিমদের আপত্তি ছিল যে, এটা খুব ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ একটি জীবন বিধান। হযরত সালমান ফারসী (রা.)কে মক্কার এক মুশরিক বিদ্রূপ করে বলেছিল, তোমাদের নবী তোমাদেরকে সবকিছু শিক্ষা দেয়। এমনকি পায়খানা প্রস্রাব করাও শেখায়? বিদ্রূপ করেই সে এ কথা বলেছিল, দীন তো বড় বড় বিষয় নিয়ে হয়ে থাকে। এসব ছোটখাট বিষয়ও তোমাদের দীনের মধ্যে রয়েছে।

হযরত সালমান ফারসী (রা.) দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, এতে আশ্চর্যের কী আছে? আমাদের নবী আমাদেরকে সবকিছু শিক্ষা দিয়েছেন, এমনকি ইস্তিঞ্জার আদবও শিক্ষা দিয়েছেন। যা খুবই তুচ্ছ জিনিস। তথাপি তিনি আমাদেরকে তার তালিম দিয়েছেন।

نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل
القبلة بغائط ولا ببول

ইস্তিঞ্জা করার সময় হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করে বসতে নিষেধ করেছেন।

ونهانا ان نستنجى باقل من ثلثة احجار

পবিত্রতা অর্জনের জন্য তিনটির কম ঢিলা নিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

পবিত্রতা অর্জনের জন্য কমপক্ষে তিনটি ঢিলা ব্যবহার করা সুন্নত। যে এলাকায় ঢিলা নেই সেখানে ব্যবহার করার জন্য যা পাওয়া যায় তাই ব্যবহার করবে।

মোট কথা, দীন ইসলামের উপর আপত্তির বিষয় ছিল যে, তা অত্যন্ত ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ। সবকিছুর তালিম তাতে দেয়া হয়েছে। এমন এক পূর্ণাঙ্গ দীনের অধিকারী হয়ে অক্ষমতা প্রকাশ কর যে, আমরা কিভাবে পথ চলব? অথচ সকল পথ বলে দেয়া আছে। কারণ একটাই, না তালিম পায়, না ইলমের দিকে মনোযোগী হয়।

মুসলমানরাই ইসলামের সর্বনাশের জন্য দায়ী

পৃথিবীর কোন ধর্মই টিকে থাকতে পারে না, যদি তার তালিম টিকে না থাকে। যে ধর্মের তালিম শেষ হয়ে যায় সে ধর্মও বিলীন হয়ে যায়। এটা আল্লাহর ফজল যে, তিনি ইসলামকে চিরস্থায়ী ধর্ম করেছেন। কেয়ামত পর্যন্ত এ ধর্ম টিকে থাকবে। কিন্তু আমরা একে ধ্বংস করার সকল ব্যবস্থাই করেছি। কারণ এর তালিম আমরা পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছি। এর মানে হল আমরা নিজ হাতে ইসলামকে শেষ করতে চাচ্ছি। তবে এটা ভিন্ন বিষয় যে, ইলম ও আখলাকের হেফাযতকারী একটি দল সব সময়ই থাকবে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لا تزال طائفة من امتى منصورين على الحق لا

يضرهم من خاذلهم ولا من خالفهم حتى يا تى امر الله

আমার উম্মতের মধ্যে সব সময় এমন একটি দল থাকবে যারা আমি যা বলছি তাই বলবে, আমি যা করছি তাই করবে এবং তাদের আকিদা হবে আমার আকিদার মত।

সুতরাং কেয়ামত পর্যন্ত হক পথের পথিক একটি দল অবশ্যই থাকবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এও বলেছেন, বিভিন্ন দল তৈরি হবে, নানা প্রকার বিরোধের সৃষ্টি হবে। কিন্তু সাথে সাথে হকপন্থী একটি দলও থাকবে। দীন কখনো মিটে যাবে না। সুতরাং আমাদের দায়িত্ব হবে সেই হকপন্থী দলের অনুগামী হওয়া। তাদের সাথে থেকে আমাদেরকেও কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ-এর তালিম হাসিল করা উচিত। যাতে করে মুসলিম জাতি নিজস্ব গতি-প্রকৃতির উপর বেড়ে উঠতে পারে।

উন্নতির সোপান

দুনিয়ার প্রতিটি জাতির একটি নিজস্ব গতি-প্রকৃতি রয়েছে। ইহুদী, নাসারা, মুশরিক, মুসলিম– প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র বলয় ও প্রকৃতি রয়েছে। এরা যখনই উন্নতি করতে চাইবে তখনই নিজস্ব বলয়ের মধ্যে থেকে উন্নতি করতে হবে। অন্যের অনুকরণে উন্নয়ন সাধন সম্ভব নয়। কেননা স্বভাবগতভাবেই তার প্রকৃতি তেমন নয়। প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব ভিত্তির উপর অট্টালিকা তোলা উচিত। অন্যের ভিত্তির উপর উঠালে কাল সে আপনাকে তাড়িয়ে দিতে পারে। তেমনিভাবে নিজের জাতির ইমারতও নিজস্ব বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তির উপর গড়তে হবে। আর তা ইলম ছাড়া জানা সম্ভব নয়।

পৃথিবীর সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ধর্ম ইসলাম। জীবনের প্রতিটি শাখায় ইসলাম পরিপূর্ণ তালিম দিয়েছে। পানাহার ও বিশ্রামের পদ্ধতি শিখিয়েছে, বসবাসের পদ্ধতি শিখিয়েছে, যুদ্ধ ও সন্ধির পদ্ধতি বলে দিয়েছে, রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি বলে দিয়েছে, জাতীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এসব কেবল তখনই সামনে আসবে যখন মানুষ

ইলম শিখবে। হাদীসের হাজারো অধ্যায় রয়েছে, ফিকাহ'র হাজারো অধ্যায় রয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে জীবনের নানা দিকের আলোচনা রয়েছে। ইবাদত, লেনদেন ও শাসন ব্যবস্থার আলাদা আলাদা অধ্যায় রয়েছে। মামলা মোকদ্দমা ফয়সালা করার অধ্যায় আলাদা, যুদ্ধ জিহাদের অধ্যায় আলাদা, খেলার অধ্যায় আলাদা। যে অধ্যায়কেই আপনি খুলবেন, তাতে বিস্তারিত হুকুম পাওয়া যাবে। এ পূর্ণাঙ্গতা তখনই পাওয়া যাবে যখন মানুষ তার তালিম পাবে, তারবিয়াত হাসিল করবে।

তালিম ও তারবিয়াত লাভের সহজ পদ্ধতি

আলেমগণের মাধ্যমেই তালিম লাভ করা সম্ভব। তার একটি পদ্ধতি হল, যদি আপনার কাছাকাছি আলেম থাকে তো ভাল, না থাকলে অন্য কোথাও থেকে দাওয়াত দিয়ে এনে তার থেকে তালিম হাসিল করবেন। এছাড়া নিজেদের কিছু ছেলেকে অন্যত্র পাঠিয়ে দীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করা হলে তারা এসে অন্যদেরকে তালিম দেবে। এ দুই পদ্ধতির কোন একটি গ্রহণ করতে হবে।

আমি তো বলি, প্রতি ঘর বা খান্দানে যদি পাঁচটি ছেলে থাকে তবে অন্তত তাদের একজনকে দীনি তালিমের জন্য ওয়াকফ করা উচিত। ঘরে একজনও যদি দীন জানা ব্যক্তি থাকে তবে সে সকলকে সংশোধন করবে। কিন্তু যদি ঘরের পর ঘর ভুল পথে পরিচালিত হয় তাহলে সংশোধনের পথ মুশকিল হয়ে যায়। প্রত্যেক ব্যক্তির আলেম হওয়া আবশ্যক নয়; তবে 'জরুরিয়াতে দীন' তথা দীনের একান্ত আবশ্যকীয় বিষয়গুলোর ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয। দৈনন্দিনের দীনি আমল, নামায, রোযা, হজ, যাকাত এগুলো ফরয। এগুলোর ইলম অর্জনও সবার জন্য ফরয। এমনিভাবে তাওহিদের পরিচয়, ঈমান ও ইসলামের পরিচয়, নেকী ও গুনাহর পরিচয়, আখলাকের পরিচয়– এগুলোর সারসংক্ষেপও প্রত্যেকের জানা ফরয।

জাতীয় সমস্যাবলীর সংক্ষিপ্ত সমাধান

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের আগমনের কারণ সম্পর্কে দুটি বিষয় উল্লেখ করেছেন– ইলমের তালিম দেয়া ও আখলাক শিক্ষা দেয়া। উম্মতেরও দায়িত্ব এ কাজ দুটি করা। ইলম শিক্ষা দেয়ার জন্য মাদরাসা থাকতে হবে এবং আখলাক শিক্ষা দেয়ার জন্য তারবিয়াতের ব্যবস্থা থাকতে হবে। মাদরাসার মাধ্যমে ইলম ছড়াবে এবং তারবিয়াত শিক্ষা কেন্দ্র (খানকা) থেকে আখলাক ঠিক হবে।

সুতরাং পুরো জাতির জন্য আবশ্যক হল জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট মক্তব প্রতিষ্ঠা করা, যার দ্বারা দীনি জ্ঞান অর্জিত হবে। আর তাতে দীনের একান্ত আবশ্যকীয় বিষয়াবলী শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। ছয় মাস লাগুক, এক বছর লাগুক কিংবা দুই বছর লাগুক– শিক্ষা দিতেই হবে। এর বিস্তারিত ইলম শেখার জন্য বড় মাদরাসায় পাঠাতে হবে। সমগ্র এলাকা থেকে কিংবা গ্রাম থেকে এক দু'জন গেলেই যথেষ্ট। তারা এসে বাকীদের সংশোধন করবে। এ ছাড়া জাতীয় দীনি সমস্যাবলীর সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। এটা একটি সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা। বিস্তারিত ব্যবস্থার মধ্যে অনেক কিছু এসে যাবে। সমস্যার ধরন কেমন, তার সমাধান কিভাবে হবে? সমস্যার ধরন মাফিক সমাধান হবে। এ এক দীর্ঘ বিষয়। তা কোন একজন মুয়াল্লিম মুরব্বির সামনে উপস্থাপন করা যেতে পারে। তিনি অবস্থা বুঝে সমাধান দিবেন। সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি হল, তালিম দ্বারা ইলম আসবে আর তারবিয়াত দ্বারা আখলাক শুদ্ধ হবে। এতেই জাতি পাল্টে যাবে, বহু সমস্যার সমাধান তালিম দ্বারা হয়ে যায়। বহু সমস্যার সমাধান নেকী, তাকওয়া ও উত্তম আখলাকের মাধ্যমে হয়ে যায়।

শুরুতেই আমি বলেছিলাম, আম্বিয়া (আ.)গণ নিজ নিজ কওমের সমস্যাবলী সমাধানের জন্য আগমন করে থাকেন, আর সাইয়েদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নিজ কওমের ও নিজ উম্মতের সমস্যাবলী সমাধানের জন্যই আগমন করেছেন। আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে দুটি বিষয় বলেছেন। তালিম ও তারবিয়াত। এতে বুঝা গেল, সমস্যাবলীর সমাধান এ দুটি জিনিসের মধ্যেই রয়েছে। শতাব্দীর পর শতব্দী ধরে সমস্যায় জর্জরিত একটি জাতিকে এ পদ্ধতিতেই তিনি মুক্তি দিয়েছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবর্তমানেও একই পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধান হয়েছে। উম্মতের উপর যখনই কোন মসিবত অর্পিত হয়েছে, তখনই আলেমদের কেউ না কেউ দাঁড়িয়ে গিয়েছেন। ইলম ও আখলাক তাঁদেরকে পথ প্রদর্শন করেছে এবং তাঁরা এগিয়ে গেছেন। এভাবেই জাতির সমস্যার সমাধান হয়েছে। আজও সেভাবেই সমাধান হবে।

এ মুহূর্তে স্মৃতিতে যা ছিল তাই আলোচনা করলাম। এ দুই হাদীসকে সামনে রেখে আপনারা চিন্তা করবেন, ইনশাআল্লাহ এর মধ্য থেকে সমস্যার সমাধান বেরিয়ে আসবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল সমস্যার সমাধান করুন, আমাদের চলার পথ দুরস্ত করুন, ইলম ও আমলের তাওফিক দান করুন এবং আমাদের আখলাক পরিশুদ্ধ করুন। আমীন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

বয়ান : ৬

পবিত্র মানব জীবন

যদি ঈমানী জীবন না হয়, শুধু বিবেক বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলে বিবাহ ও ব্যভিচার উভয়কে সমান মনে হবে। শুধু বুদ্ধি বিবেক দ্বারা পরিচালিত হলে এ দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হবে না। মানুষের স্বভাব শুধু নফসের সন্তুষ্টি কামনা করে। বিবেক বুদ্ধি যখন মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করবে তখন জাতীয় স্বার্থ বিবেচ্য হবে। যাকে আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলব। আর গণতন্ত্রে যা হয় তা হল সকলের মতামত নিয়ে সকলকে খুশি করতে হবে। আর ঈমানী জিন্দেগী যখন আসবে তখন সকল কিছুর উর্ধ্বে আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রশ্ন আসবে যে, আল্লাহ এতে সন্তুষ্ট কি না।





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ o

জীবন একটি পবিত্র আমানত

বুযুর্গানে মুহতারাম!

এখন আমি যে আয়াতটি তেলাওয়াত করলাম তাতে আল্লাহ্ তাআলা মানুষের সৌভাগ্য ও উন্নতির এক বুনিয়াদী মূলনীতি ইরশাদ করেছেন। যার কিছু ব্যাখ্যা আপনাদের সামনে আলোচনা করতে চাচ্ছি। প্রথমে আয়াতের তরজমা শুনুন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন– 'যে মুমিন পুরুষ ও নারী সৎকর্ম করবে আমি তাকে অত্যন্ত পবিত্র একটি জীবন দান করব। যেটি হবে পরিচ্ছন্ন ও উন্নততর। আর তার সে কর্মের জন্য আমি তাকে বহু সওয়াব ও বিনিময় দান করব।'

আয়াতে সৎকর্মশীলদের জন্য দুটি ওয়াদা করা হয়েছে। একটি হল পবিত্র জীবন, আরেকটি হল প্রতিদান। একে এভাবে বুঝুন, কিছু দিনের জন্য আমাদেরকে যে জীবন দান করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তা একটি আমানত। এ আমানতকে যদি রক্ষা করতে চাই তাহলে ঈমানদারীর সাথে তাকে তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। কেননা এ জীবনের আমরা নিজেরা মালিক নই। এ জীবনকে আমরা সৃষ্টি করিনি বিধায় একে আমরা ধ্বংস করারও অধিকার রাখি না। এ জীবন দানকারীও আল্লাহ্ তাআলা এবং হরণকারীও আল্লাহ্ তাআলা। সুতরাং নেয়া এবং দেয়া যাঁর হাতে তিনিই কেবল মালিক সাব্যস্ত হতে পারেন। আমাদের অনিচ্ছায় আমরা জীবন পেয়েছি। আবার আমাদের ইচ্ছা কোন পরোয়া না করেই তা ছিনিয়ে নেয় হবে।

জীবনের মূল উপাদান

আমাদের জীবনের একটি মূল উপাদান রয়েছে এবং একটি রূপ রয়েছে। এ উভয় জিনিসকে বুঝতে হবে। জীবনের নানা রূপ নিয়ে সামনে আলোচনা আসবে। জীবনের রূপে পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু মূল উপাদান একই থাকে। যেমন- কাদা মাটির খামিরা একই থাকে কিন্তু তা দিয়ে নানা রকমের তৈজসপত্র তৈরি হয়। তেমনিভাবে আমাদের উন্নতি ও অবনতির মাধ্যম যে জীবন সে জীবনেরও একটি মূল উপাদান ও বহু রূপ রয়েছে।

আর এ মূল উপাদান দুই চারটি জিনিস। তার মধ্যে সর্বপ্রথম হল পানাহার। এটাই জীবনের ভিত্তি। পানাহার না করলে তাকে মৃত বলা হয়। এরপর হল পোশাক পরিচ্ছদ। তার পরে রয়েছে বাসস্থান। এর পর হল মিলেমিশে বসবাস করা যাকে সামাজিকতা বলা হয়। এই চারটি জিনিস হল বুনিয়াদী মৌলিক বিষয়। এর মাধ্যমেই আমাদের জীবন গঠিত।

পানাহারের জন্য আমাদের চাষাবাদ করতে হয়। পশুপালন করতে হয়। মোট কথা, দীর্ঘ এক কর্মযজ্ঞ শেষ করে আমাদের কিছু খাবার জোটে। খাবারের জন্যই বাজার তৈরি হয়। টাকা-পয়সা উপার্জন ও খরচ করতে হয়। পানাহার হল মূল জিনিস। তাকে কেন্দ্র করে বাজার তৈরি হয়, টাকা উপার্জন করতে হয়। সুতরাং জমিন, বাজার, টাকা পয়সা, খাওয়া, পান করা, বসবাস করা– এ সবই জীবনের অনুসঙ্গ।

এমনিভাবে আপনি নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন, পারস্পরিক লেনদেন করেন। এর দ্বারাও উদ্দেশ্য জীবনের অনুসঙ্গ সহজে অর্জন করা। এমনিভাবে পানাহার ও বসবাসের প্রয়োজনেই আসমান সৃষ্টি হয়েছে, যা দ্বারা বৃষ্টি বর্ষিত হয়। সূর্য সৃষ্টি হয়েছে, যা দিয়ে তাপ উৎপন্ন হয়। বাতাস সৃষ্টি হয়েছে, যা জীবনকে টিকিয়ে রাখে। সুতরাং এ বিশাল কারখানা আমাদের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজন মিটাতে তৈরি করা হয়েছে। সমগ্র জগত আমাদের জন্য খেদমত করে যাচ্ছে।

মানব জীবনের প্রথম ধাপ : জৈবিকতা

মানব জীবনের প্রথম ধাপ হল জৈবিক চাহিদা পূরণ। শিশু জন্ম নিয়েই পানাহারের জন্য কান্নাকাটি করে। যা তার মুখে দুধ দেয়ার পর কান্না থেমে যায়। বোঝা গেল, তার কান্নাকাটি ছিল খাদ্যের জন্য। বাচ্চা না কাঁদলে মা বুঝতে পারত না। বাচ্চা না কাঁদলে মায়ের স্তনে দুধের জোশ তৈরি হত না। বাচ্চার কান্না একটি ফরিয়াদ। এ ফরিয়াদ শুনে মায়ের অন্তরে মমতা ও ভালবাসা উথলে ওঠে। তার স্তনের দুধের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সুতরাং জন্ম নিয়ে সে প্রথমে না কাপড় চায়, না ঘর চায়– শুধু খাদ্য অন্বেষণ করে। এরপর ঠাণ্ডা গরম তাকে কষ্ট দেয়। আবার সে কাঁদে। মা তাকে কাপড় পরায়। অতিরিক্ত কাপড় দেয়া হলে ঘেমে যায়, আবার

কাঁদতে শুরু করে। মায়ের মনে এলহাম হয়, গরম তাকে কষ্ট দিচ্ছে। কাপড় সরিয়ে পাখা নিয়ে বাতাস করতে বসে যায়। সুতরাং প্রথমে প্রয়োজন পড়েছে খাবারের, দ্বিতীয়তে পোশাকের এবং তৃতীয়তে ঠাণ্ডা-গরম ও রোদ থেকে বাঁচার জন্য নিরাপদ আবাসস্থলের। বাচ্চা আরেকটু বড় হয়ে কিছুটা হুঁশ জ্ঞান হলে তার মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়। তখন সে নিজের জন্য ছোট বাচ্চাদেরকে খুঁজে বেড়ায়। কোন বাচ্চাকে আপনি বড়দের সান্নিধ্যে বসতে দেখবেন না। আলেম উলামাদের মজলিস খুঁজে সেখানে গিয়ে বসতে দেখবেন না। বরং নিজের সমবয়সীদের সাথে খেলতে থাকবে। কবি বলেছেন–

ع- کند ہم جنس باہم جنس پرواز

সবকিছু তার স্বজাতীয় জিনিসের প্রতি আসক্ত হয়। যুবকরা যুবকদের প্রতি ও বৃদ্ধরা বৃদ্ধদের প্রতি ঝুকবে। বোঝা গেল, মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সামাজিক বন্ধন রয়েছে। তারা প্রাণীদের মত গুহা ও নীড়ে থাকতে পারে না। জনবসতি তৈরি করে তাতে থাকে। নগর জীবন গড়ে তোলে। এতে করে ভালবাসা ও পারস্পরিক বন্ধন তৈরি হয়। মানুষ তথা 'ইনসান' শব্দটি এসেছে 'উনুস' থেকে। যার অর্থ ভালবাসা ও বন্ধুত্ব। কবি বলেন–

وما سمی الإنسان الا لا نسه :: وما القلب الا لأنه يتقلب

বন্ধুত্ব ও ভালবাসার কারণে মানুষের নাম 'ইনসান' রাখা হয়েছে এবং সদা পরিবর্তনশীল বলে অন্তরের নাম 'কলব' রাখা হয়েছে।

শিশুকে যদি আপনি একা রাখেন তাহলে সে কাঁদবে। কেউ তার কাছে বসে তার সাথে কথা বললে ঠাণ্ডা থাকবে। বোঝা গেল তার মধ্যে বন্ধুত্বের অনুভূতি রয়েছে। নিঃসঙ্গ বোধ করছিল। সঙ্গী পাওয়ার পর শান্ত হয়েছে। এই চারটি জিনিস জীবনের মৌলিক বিষয়। এগুলো মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এ জীবনের নাম আমরা 'জৈবিক জীবন' রাখতে পারি। জীব বা প্রাণীদের চাহিদা কেবলই পানাহার। চতুষ্পদ প্রাণীদের আপনি দেখেছেন। গরু, মহিষ– এদেরকে আপনি দেখবেন সার্বক্ষণিক

খাওয়ায় ব্যস্ত। এ ছাড়া কোন কাজ নেই। চব্বিশ ঘণ্টায় প্রাণীদের কাজ শুধুই খাওয়া। সারা রাতও এরা খাওয়াতেই ব্যস্ত থাকে। একটু যদি চোখ লেগেও যায়, জেগে ওঠার সাথে সাথে আবার খেতে শুরু করে। সুতরাং প্রাণীদের স্বভাবগত চাহিদা হল পানাহার এবং শীতের সময় গরম ও গরমের সময় ঠাণ্ডার অন্বেষণ। এতে বোঝা গেল, মানুষের যে জীবনে পানাহার ও বসবাস উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সে জীবন জৈবিক জীবন।

আপনি যত ভাল পানাহার করেন না কেন, যত উন্নত বিল্ডিং তৈরি করেন না কেন, তা হবে জীবের চাহিদা। সাপ নিজের জন্য গর্ত তৈরি করে। বাঘ নিজের ডেরা ও পাখি নীড় তৈরি করে। পিঁপড়া ছিদ্র খুঁজে নেয়। মানুষ বিল্ডিং তৈরি করে। বিল্ডিং যত উন্নতই হোক, তা জৈবিকতার সীমাকে অতিক্রম করবে না।

মানব জীবনের দ্বিতীয় ধাপ : বুদ্ধি ও বিবেক

মানব শিশুর বয়স দশ এগার বছর হওয়ার পর তার মধ্যে বিবেক বুদ্ধি তৈরি হতে শুরু করে। এ পর্যন্ত তার জীবন স্বভাবের নিয়ন্ত্রণে ছিল। মানবীয় স্বভাব যা চাইত সে তা করত। অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধি তৈরি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমরা স্বভাবের গোলাম ছিলাম। দার্শনিকগণ লেখেন, স্বভাব বিবেকহীন হয়ে থাকে। তার মধ্যে আবেগ কাজ করে, বিবেক বুদ্ধি তাতে থাকে না।

সুতরাং তবিয়ত বা স্বভাব যেন এক মূর্খ শাসক। সে নির্দেশ দেয়, ক্ষুধা লেগেছে, খাও। আমরা খেতে শুরু করি। পানি পান করতে চাচ্ছে, আমরা বললাম ঠিক আছে। ঘর বানাতে চাইলে আমরা নির্মাণ শুরু করে দিই। সুতরাং এক বিবেকহীন শাসকের শাসনের আওতায় আমরা জীবন যাপন করছিলাম। কেননা এগুলো স্বভাবের চাহিদা ছিল। চৌদ্দ পনের বছর বয়সে মানুষের বিবেক আসতে শুরু করল। তার মধ্যে বুঝ এল।

বিবেক-বুদ্ধি সৃষ্টি হওয়ার পর জীবনের মৌলিক বিষয়ের মধ্যে পরিবর্তন আসতে থাকবে। এর আগে স্বভাবের তাড়নায় খাচ্ছিল, এখন বিবেক বুদ্ধি তাতে সূক্ষ্মতা তৈরি করে দিয়েছে। অর্থাৎ পানাহার ঠিকই করবে কিন্তু তাতে নান্দনিকতা থাকবে। পরিধান করার ক্ষেত্রে একটু উন্নতভাবে

পরিধান করবে। আবাসস্থলকে পরিপাটি করে রাখবে। স্বভাব যখন বিবেকের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে তখন সকল কিছুতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হবে। বাড়ি নির্মাণ করতে গেলে তাতে সুন্দর ডিজাইন আসবে, উন্নত ইঞ্জিনিয়ারিং যুক্ত হবে। খাবারের ক্ষেত্রে পাত্রের সুদর্শনতা চলে আসবে, খাদ্যের রঙে দৃষ্টি নন্দনতা চলে আসবে। আজকাল নানা প্রকারের খাদ্য তৈরি হচ্ছে। এগুলো বুদ্ধির চাহিদা। স্বভাব খাদ্যের চাহিদা তৈরি করে। বুদ্ধি তাতে নানা অনুসঙ্গ তৈরি করে– আকৃতি সুন্দর হতে হবে, গন্ধ মনঃপূত হতে হবে। ডিজাইন চমৎকার হতে হবে। আপনি কেক বানাবেন, তাতে মূল জিনিস একই থাকবে কিন্তু আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন করবেন। কোনটি পাখির আকৃতি, কোনটি ফুলের আকৃতি। তাতে রঙ দিচ্ছেন। মুক্তা বসাচ্ছেন। যাতে দেখেও চোখ জুড়ায়। যদি এসব কিছু না থাকত তবে পেটের ক্ষুধা নিবৃত হত। আপনি শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একটি মোটা কম্বল গায়ে জড়িয়ে নিলেই স্বভাবের চাহিদা পূরণ হয়। কিন্তু বুদ্ধি আপনাকে কম্বলের রঙ সুন্দর হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। তন্তু মোলায়েম হওয়া কামনা করে, আভিজাত্য ফুটিয়ে তুলতে দামী হওয়া কামনা করে। আজকাল পৃথিবীতে ডিজাইনের যে জয়জয়কার তা বুদ্ধির তাড়নাতেই হয়েছে। বাড়ি নির্মাণ করতে গেলে মূল বাড়িতে নানা রকমের ডিজাইন এসে যাচ্ছে। দেয়াল, ছাদ, প্লাস্টার– সর্বত্রই নানা ডিজাইন ও অনুসঙ্গ যুক্ত হচ্ছে। কাপড় তৈরি করতে বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার হচ্ছে। তুলা তো রয়েছেই, এর সাথে গাছের ছাল-বাকল, পশুর পশম, কীট-পতঙ্গের আঁশসহ হাজারো উপাদান ব্যবহার হচ্ছে। এখন কাঁচ দিয়ে কাপড় তৈরির চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা চলছে। জঙ্গলের জীবজন্তু ও পাখপাখালীর রঙ ও ডিজাইনে পোশাক তৈরি হচ্ছে। পানীয় কেনার জন্য আপনি দোকানে গেলে দেখতে পাবেন নানা রঙের ও স্বাদের পানীয় রয়েছে। উদরপূর্তি ও ক্ষুধা নিবারণই শুধু মানুষ চাচ্ছে না– চোখ, হাত, জিহ্বা সকলকে তৃপ্ত করতে চাচ্ছে। সকল প্রকারের স্বাদ একীভূত করে তৃপ্ত হতে চাচ্ছে। এসব জিনিস মানুষের মধ্যে রয়েছে, প্রাণীদের মধ্যে রাখা হয়নি। খেয়ে পেটভরা এবং হজম, এতটুকুই প্রাণীদের কাজ। হযরত আদম (আ.)-এর যুগে গাভী যেমন খেয়ে উদরপূর্তি করত আজ দশ হাজার বছর পরও তেমনিভাবে খায়। এর মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সৌন্দর্য বোধ কেবল মানুষের

মধ্যেই রয়েছে। জিন ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে এ বোধ নেই। মানুষের মধ্যে আছে বলেই তারা বাসস্থান, বস্ত্র ও খাদ্যের উন্নত থেকে উন্নততর বিষয় আবিষ্কার করেছে।

মুঘল আমলে একবার ইরানের শাহজাদা ভারতে বেড়াতে এলেন। শাহজাদার জন্য নতুন ধরনের কোন খাদ্য তৈরি করতে শাহী বাবুর্চিকে নির্দেশ দেয়া হল। সে নাশতার জন্য একটি জিনিস তৈরি করে উন্নত একটি ট্রেতে করে নিয়ে এল। খাদ্য পরিবেশনের জন্য যখন ট্রের ঢাকনা খোলা হল, দেখা গেল সদ্য কাটা একটি মহিষের মাথা তাতে রাখা আছে এবং তাজা রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। শাহজাদা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল, এ কেমন বেয়াদবী! বাদশাহর সামনে মনিষের মাথা নিয়ে এসেছে!

বাবুর্চি নিজের বাদশাহকে উদ্দেশ্য করে বলল, মনে হচ্ছে শাহজাদা ভাল কোন জিনিস কখনো খায়নি।

এ কথা শুনে শাহজাদা বুঝলেন, এটা উন্নত কোন খাবার। মহিষের মাথা আকৃতির উক্ত খাবার ছিল এক বিশেষ স্বাদের মিষ্টান্ন, দাঁত ছিল আরেক স্বাদের মিষ্টি, চামড়া ছিল অন্য আরেক স্বাদের মিষ্টি। শাহজাদা খেয়ে আশ্চর্য হলেন, অদ্ভুত স্বাদ!

বাবুর্চি প্রমাণ করতে চাচ্ছিল, ভারতে যে খাদ্য তৈরি হয় তোমাদের ফেরেশতারাও তেমন খাবার কখনো খায়নি। এ ছিল সৌন্দর্য বোধের প্রকাশ। শুধু মিষ্টি এনে দিলেই শাহজাদা খেয়ে নিতেন। এতশত করার কী দরকার ছিল? সৌন্দর্য শিল্পের মাহাত্ম্য প্রদর্শনের জন্যই এটা করা হয়েছে।

খাদ্য পরিবেশনের সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য আজকাল স্বতন্ত্র কোম্পানী পৃথিবীতে তৈরি হয়েছে। যাদের কাজ হল টেবিলে সুন্দর করে খাদ্য পরিবেশন করা। শুধু টেবিল সাজানোর পারিশ্রমিক স্বরূপ তাদেরকে হাজার হাজার টাকা দেয়া হয়।

মানুষের তবিয়ত পানাহার কামনা করে আর মানুষের বুদ্ধি তাতে সৌন্দর্য সৃষ্টি কামনা করে। মানুষের স্বভাব কামনা করে সমপর্যায়ের সঙ্গী, যার সাথে ভালবাসা ও হৃদ্যতার সাথে কথা বলা যায়। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি বিবেক কামনা করে– কথা বলার সঙ্গীর কণ্ঠস্বর যেন শ্রুতিমধুর হয়, কথা যেন মিষ্টি হয়, ওঠাবসার ধরনও যেন উন্নত হয়।

মানব জীবনে বিবেকের শাসন

বিবেক যখন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করবে তখন আমরা তাকে মানবিক জীবন বলব। ইতোপূর্বে যে জীবন স্বভাবের নিয়ন্ত্রণে ছিল, আজ বিবেক বুদ্ধি তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। মূর্খ শাসকের শাসন থেকে জ্ঞানী শাসকের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। যার মধ্যে জ্ঞান আছে, চিন্তা আছে, বুঝা আছে।

এর সাথে আরো একটি জিনিস সংযুক্ত হয়। তা হল স্বার্থ। শিশুদের দিকে তাকালে দেখতে পাব, তারা নিজের খাবারের ব্যাপারে গুরুত্ব দিচ্ছে। তার ভাইবোন খাবে কি খাবে না, তাতে তার কী। প্রাণীদের মধ্যেও এ স্বভাবই বিদ্যমান। আপনি একটি কুকুরকে ডেকে হাড্ডি দিন, অন্য কুকুর পেল কি পেল না তাতে তার কিছু এসে যায় না। শুধু তাই নয়, অন্য কুকুর এলে তাকে তাড়া করবে। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রয়োজনে মহল্লার সকল কুকুরের সাথে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত। এমনিভাবে অন্যান্য প্রাণীও নিজের খাদ্য যাতে অন্যের কাছে না যায় সে জন্য লড়াই করে। এটা প্রাণীর চাহিদা। কেননা প্রাণীর স্বভাবে স্বার্থপরতাই মুখ্য। নিজের মঙ্গল চায়, অন্যের মঙ্গল নয়। কিন্তু বিবেক বুদ্ধি যখন এসে যায় তখন সে চায় যে, আমি ও আমার ভাইবোন সবাই ভালভাবে খাব। সুতরাং বিবেক বুদ্ধি এসে সম্মিলিত জীবন ব্যবস্থা শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং বিবেক বুদ্ধি দুটি জিনিসকে সংযুক্ত করেছে; একটি হল সৌন্দর্যবোধ, আরেকটি হল সম্মিলিত জীবন ব্যবস্থা। মানুষের মধ্যে এ দুটি অনুভূতি যখন আসবে তখন বুঝতে হবে, সে মানবিক জীবনের গণ্ডির মধ্যে চলে এসেছে। এ ক্ষেত্রেও মৌলিক বিষয় কিন্তু সেই একই রকমের রয়েছে। পূর্বে ছিল ব্যক্তি স্বার্থ, বুদ্ধির আওতায় আসার পর তা সম্মিলিত স্বার্থে রূপ নিয়েছে।

এভাবে মানুষ তার সামাজিক জীবন, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাষাবাদ সম্পাদন করে থাকে। বিবেক মানুষের মাঝে সৌন্দর্যবোধ ও জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করে। মৌলিক বিষয় একই থাকে তবে তার রূপ বদলে যায়। অর্থাৎ মুখ্য বিষয় হল জৈবিক চাহিদা পূরণ। স্বভাব চায় শুধু নিজস্ব চাহিদা পূরণ করতে আর বিবেক চায় পুরো মানব জাতির স্বার্থ পূরণ করবে। কথায় বলে– একা একা না হাসতে ভাল লাগে, না কাঁদতে ভাল লাগে।

মানব জীবনের তৃতীয় ধাপ : ঈমানের শাসন

এবার মানবিক জীবনকে আরেকটু এগিয়ে নিন। মানুষের স্বভাব তো শুধু পানাহার তথা নফসের সন্তুষ্টি চাচ্ছিল। বিবেক বুদ্ধি এসে তাতে জাতীয় স্বার্থ সংযুক্ত করেছে। অর্থাৎ আমি একা শুধু খাব না, আমার ভাইবোন ও অন্যান্য মানুষও খাবে। কারো মধ্যে যদি এগুলোর সাথে আরো একটি বিষয় সংযুক্ত হয় যে, আমার একার কিংবা আমার ভাইবোনের সন্তুষ্টিতেই কেবল আমি সন্তুষ্ট হব না; বরং আমার আল্লাহকেও সন্তুষ্ট করব। তা হলে এখান থেকেই ঈমানী জীবন শুরু হবে। যেগুলো এতক্ষণ পর্যন্ত স্বভাব ও বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণে ছিল তা ঈমানের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

বিবেক বুদ্ধি মানুষকে জাতীয় স্বার্থ ও সুবিধার পথ নির্দেশ করত কিন্তু যখন ঈমানের আলো তাতে সংযুক্ত হয় তখন তার চিন্তা-ভাবনা পাল্টে গেল। খাবার খেতে বসলে সে চিন্তা করে, খানা এমনভাবে খাব যাতে আমার আল্লাহও রাজি হয়ে যান। পোশাক পরার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টির বিষয়টি তার সামনে এসে যায়। যা আল্লাহর পছন্দনীয় নয় তা সে পরিত্যাগ করে। হাদীসে বলা হয়েছে, পুরুষের জন্য রেশমী কাপড় হারাম। রেশমী কাপড় পরার দ্বারা নফস ও ভাইবোন খুশি হবে। কারণ তা খুব সুন্দর ও উন্নত পোশাক। কিন্তু আল্লাহ খুশি হবেন না। নফস ও বিবেক রাজি হলেও আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন না বিধায় তা পরিত্যাজ্য। সুতরাং ঈমানের শাসনে এসে মানুষ চিন্তা করে, কোন পোশাক জায়েয, কোন পোশাক নাজায়েয, কোনটি হালাল কোনটা হারাম।

হাদীসে এসেছে পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম। কেউ যদি স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করে তবে তা অবশ্যই হারাম। বলা হয়েছে, এগুলো জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। অবশ্য স্বর্ণের বোতাম ব্যবহারের অনুমতি শরীয়ত দিয়েছে। তাও এভাবে যে তা পোশাকের অংশ হিসেবে থাকবে। যেমন- পোশাকের মধ্যে জরির কাজ করা হয়ে থাকে। সুতরাং বোতামকে পোশাকের অংশ মনে করা হয়েছে। আর সে বোতামও হতে হবে দুই তিন মাশা পরিমাণ। এর চেয়ে বেশি হলে তা জায়েয হবে না। তারপর ফোকাহায়ে কেরাম বলেছেন, স্বর্ণের বোতামকে এমনভাবে পোশাকের সাথে সংযুক্ত করতে হবে যাতে সে বোতাম শরীরে স্পর্শ না করে। অর্থাৎ পেছনে কাপড় থাকতে হবে। এতগুলো শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দেয়া

হয়েছে। সুতরাং মানুষ যখন ঈমানী জীবন, ঈমানের শাসন মেনে নেবে তখন একটি বোতামও সামনে আসবে। চিন্তা করবে, কিভাবে জায়েয হবে, কিভাবে হবে না। কতটুকু পরব, কতটুকু পরব না।

এমনিভাবে খাবার খাওয়ার সময়ও সে ভাববে, খাবারটি হালাল না হারাম। যদি হারাম হয়, তাহলে সে বিষ থেকে যেমন দূরে সরে থাকে, তেমনিভাবে দূরে সরে থাকবে। কেননা বিষ শারীরিক মৃত্যুর কারণ আর হারাম খাদ্য রূহানী মৃত্যুর কারণ।

এর কারণ হল প্রত্যেক প্রকারের খাবারের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ডাক্তারগণ খারাপ বৈশিষ্ট্যময় খাবার খেতে নিষেধ করেন। রূহানী চিকিৎসক হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও খারাপ জিনিস থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রত্যেক প্রকারের গোশতেরই একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। শূকরের স্বভাবের মধ্যে নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা বিদ্যমান। এরা নাপাকী খায়। সমগোত্রের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা এদের মজ্জাগত ব্যাপার। সুতরাং এগুলো খাওয়া হলে এমন নোংরামী ও ঘৃণ্য স্বভাব মানুষের মধ্যে চলে আসবে। হিংস্র প্রাণীর গোশত ও বাঘ-ভাল্লুকের গোশতও হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা সেগুলোর গোশতের মধ্যে জীবনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সুতরাং এগুলো যারা খায় তারা উন্নত থেকে উন্নততর জানোয়ার হয়ে যাবে এবং মনুষ্যত্ব শেষ হয়ে যাবে। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করে দিয়েছেন। তিনি এমন সব প্রাণী খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন যাদের মধ্যে সমতা বিদ্যমান। এগুলো আহার করা দ্বারা মানুষের মধ্যেও ন্যায়পরায়ণতা সৃষ্টি হয়। কোন প্রাণীর বৈশিষ্ট্য কেমন তা আল্লাহই ভাল জানেন। কোনটি হালাল এবং কোনটি হারাম তা তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ

মৃত প্রাণীর রক্ত, শূকরের গোশত এবং গাইরুল্লাহর নামে জবাইকৃত প্রাণীর গোশত তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে।

সুতরাং মানুষ যখন ঈমানী হুকুমতের আওতায় চলে আসবে তখন তার পানাহার, বাড়িঘর, পোশাক-পরিচ্ছদ– সবকিছুতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি মুখ্য হবে।

এমনিভাবে স্বীয় বংশধারা তৈরির ব্যাপারেও লক্ষ রাখতে হবে, ব্যভিচার পরিহার করে বিবাহের পথ গ্রহণ করবে। যদি ঈমানী জীবন না হয়, শুধু বিবেক বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলে বিবাহ ও ব্যভিচার উভয়কে সমান মনে হবে। শুধু বুদ্ধি বিবেক দ্বারা পরিচালিত হলে এ দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হবে না। মানুষের স্বভাব শুধু নফসের সন্তুষ্টি কামনা করে। বিবেক বুদ্ধি যখন মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করবে তখন জাতীয় স্বার্থ বিবেচ্য হবে। যাকে আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলব। আর গণতন্ত্রে যা হয় তা হল সকলের মতামত নিয়ে সকলকে খুশি করতে হবে। আর ঈমানী জিন্দেগী যখন আসবে তখন সকল কিছুর ঊর্ধ্বে আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রশ্ন আসবে যে, আল্লাহ এতে সন্তুষ্ট কি না। জাতি সন্তুষ্ট হল কি হল না তা বিবেচ্য হবে না। সকল মানুষও যদি নারাজ হয়ে যায় তবুও সে সবকিছুর ঊর্ধ্বে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেবে। সুতরাং ঈমানী জিন্দেগীর মধ্যে ঐসকল জিনিস এসে যাবে যা এ পর্যন্ত ব্যবহার হয়ে আসছিল। শুধু তার আকৃতি বদলে গেছে। আল্লাহর সন্তুষ্টির বিষয়টি মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, বাম হাতে পানাহার করলে শয়তান তাতে অংশগ্রহণ করবে। আর শয়তানের অংশগ্রহণের প্রভাব নফসের উপর পড়বে। যদি ডান হাতে খাদ্যদ্রব্য লাগানো থাকে এবং বাম হাতে গ্লাস নিতে বাধ্য হয় তাহলে অন্তত ডান হাতের কোন অংশ গ্লাসে সংযুক্ত করে নেবে। এতে ডান হাতে পান করা প্রমাণিত হবে। ডান হাতে পানাহার করা নবীগণের স্বভাব আর বাম হাতে পানাহার করা শয়তানের স্বভাব।

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن .

সকল ভাল কাজে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ডান হাত পছন্দনীয় ছিল।

জামা পরিধান করার সময় প্রথমে ডান হাত ডান আস্তিনে প্রবেশ করাতেন। পাজামা পরিধান করার সময় প্রথমে ডান পা প্রবেশ করাতেন। মাথা

আঁচড়ালে প্রথমে ডান পাশ আঁচড়াতেন, দাঁত মাজলে প্রথমে ডান দিক মাজতেন। ডান দিক দিয়ে শুরু করা আম্বিয়া (আ.)গণের পছন্দনীয় বিষয়। সকল কিছুর পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা নবীগণের পছন্দ, আর অপরিচ্ছন্নতা ও নাপাকী শয়তানের পছন্দ।

ঈমানী জীবন যাপন করলে আহারের হালাল হারামের বিষয়টি সামনে আসবে। কারণ দীনি তাওফিকের সম্পর্ক হালাল খাদ্যের সাথে। হারাম লোকমা যখন পেটে পড়ে তখন দীনি কাজের উদ্যম নষ্ট হয়ে যায়। আর যদি হালাল খাদ্য পড়ে তাহলে দীনের উপর আমল ও ভালবাসার উদ্যম বেড়ে যায়। কারণ দীন হল একটি পরিচ্ছন্ন বিষয়। যদি কোন ব্যক্তির স্বভাব খুব পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয় তার সামনে কোন খারাপ জিনিস রাখা হলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর যদি কারো স্বভাব নোংরা হয় তাহলে যত নোংরা জিনিস তার সামনে আনা হবে সে তত খুশি হবে।

বাদশাহ তানাশাহ ছিল খুবই নাজুক স্বভাবের এক ব্যক্তি। এখন তো 'নাজুক মন' বুঝাতে 'তানাশাহ' শব্দটিই উর্দু ভাষায় ব্যবহার হচ্ছে। তার স্বভাব খুবই পরিচ্ছন্ন ছিল। সে যখন পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের হামলার শিকার হয়ে বন্দি হল তখন তার ব্যাপারে মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্ত হল। সে তখন বলল, তোমরা যখন আমাকে মারবেই তখন তার জন্য খুব ব্যতিব্যস্ত হতে হবে না। কোন এক মেথরকে ময়লা হাতে নিয়ে আমার সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে বল। এতেই আমি শেষ হয়ে যাব। এরপর তার সামনে নাপাকি নিয়ে আসা হল। ব্যস, দম বন্ধ হয়ে মারা গেল। সহ্য করতে পারল না। মোট কথা, সাফ ও পরিচ্ছন্ন স্বভাব যার রয়েছে সে পরিচ্ছন্ন জিনিসে খুশি হয়। পায়খানায় যাদের জন্ম তাদেরকে যদি বাইরে এনে ছেড়ে দেয়া হয়, তারা মারা পড়বে। কারণ নাপাকীই তাদের স্বভাবের চাহিদা। প্রত্যেক জিনিসই তার স্বভাবের চাহিদা মাফিক বিষয় নিয়ে টিকে থাকে। এ কারণেই ঈমানী স্বভাব যার রয়েছে সে হারাম লোকমা, এমনকি সন্দেহপূর্ণ লোকমাও কখনো সহ্য করতে পারে না।

আমাদের বুযুর্গদের মধ্যে একজন বুযুর্গ ছিলেন হযরত মাওলানা মুজাফফর হুসাইন কান্দুলভী (রহ.)। তার তাকওয়া ও পবিত্রতা প্রসিদ্ধ। তিনি বলতেন, অজ্ঞানতাবশত কখনো যদি সন্দেহযুক্ত কোন খাবার আমার পেটে চলে যায়, তাহলে আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেন। সাথে সাথে বমি এসে

যায়। অসীম তাকওয়া ও পবিত্রতা বাড়তে বাড়তে আল্লাহর সাথে এমন সম্পর্কই হয়ে যায়। তবে শর্ত হল, ব্যক্তির মুত্তাকি হওয়ার অনুশীলন থাকতে হবে। যখন তাকওয়া নসিব হয়ে যায় তখন আল্লাহ তাকে হেফাযত করেন।

হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করতেন। তিনি একবার আজমগড় গিয়েছিলেন। স্টেশন থেকে চার মাইল দূরের ছোট এক গ্রামে ছিলেন। বিকেলেই সেখানকার কাজ হয়ে গিয়েছিল। ট্রেন ছিল রাত এগারটায়। লোকজন বলল, শীতের মৌসুম, অন্ধকার রাত তারপর আবহাওয়াও ভাল নয়। রাতের অপেক্ষা না করে দিনের আলো থাকতেই স্টেশনে পৌঁছে যাওয়া ভাল হবে। অন্যথায় কষ্ট হবে। তারা তাঁকে স্টেশনে পৌঁছে দিল। স্টেশনটি খুব ছোট ছিল। একটি অফিস রুম ও একটি গুদামঘর ছাড়া অন্য কোন রুম ছিল না। গুদামঘরেও বিভিন্ন মালামাল রাখা ছিল। স্টেশন মাস্টার ছিল হিন্দু, তবে ভাল লোক ছিল। সে গুদামঘরের কিছু মালামাল সরিয়ে জায়নামায বিছানোর মত জায়গা করে দিল। হযরত থানবী (রহ.) বলেন, মাগরিবের সময় হলে আমি ফরয সুন্নত পড়ে নফলের নিয়ত করেছি। স্টেশন মাস্টার এ সময় একটি বাতি নিয়ে এল। সাথে সাথে আমার মনে হল, সরকার গুদাম ঘরের জন্য অবশ্যই বাতির ব্যবস্থা রাখেনি। তার আনীত বাতিটি ট্রেনেরই হবে, যা আমার জন্য আনা হয়েছে। আমি যেন আত্মসাৎকারী সাব্যস্ত হলাম। এ বাতি ব্যবহার করার অধিকার আমার নেই। নামাযের মধ্যে আমার খুব অস্থিরতা শুরু হয়ে গেল। মনে মনে বললাম, আল্লাহ! আপনি সব সময় সন্দেহযুক্ত বিষয় হতে আমাকে রক্ষা করেছেন। এখন একটি সন্দেহযুক্ত জিনিস এসেছে যা ব্যবহার করার অধিকার আমার নেই। এ থেকে আপনিই আমাকে বাঁচাতে পারেন। থানবী (রহ.) বলেন, বহু কষ্টে আমি দুই রাকাত নামায শেষ করলাম। দেখলাম, স্টেশন মাস্টার বাতিটি রাখেননি, হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি সালাম ফেরাবার পর সে এগিয়ে এসে বলল, আমি এ বাতিটি নিয়ে এসেছি। এটি স্টেশনের নয়, আমার নিজের। ঘর থেকে নিয়ে এসেছি, যাতে অন্ধকারে আপনার কষ্ট না হয়।

থানবী (রহ.) বলেন, আল্লাহ তাআলা তার মনে উদয় করে দিয়েছে যে, স্টেশনের বাতি ব্যবহার করার অধিকার আমার নেই। এজন্য সে ঘরে

গিয়ে নিজের বাতি নিয়ে এসেছে। সুতরাং স্বভাবের মধ্যে যদি নিরাপত্তা এসে যায় তখন কাফেরদের মাধ্যমেও আল্লাহ পথ প্রদর্শন করান। তবে শর্ত হল, দীনি জযবা ও চারিত্রিক শক্তি তার মধ্যে থাকতে হবে। মোট কথা, মুত্তাকী যখন তাকওয়ার পথ গ্রহণ করবে তখন আল্লাহ তাআলা সন্দেহপূর্ণ বিষয় থেকে রক্ষা করবেন। তবে এটা তখনই হয়ে থাকে যখন বাতেনী তাকওয়ার অভ্যাস থাকে।

তাকওয়া দুই ধরনের হয়ে থাকে। জাহেরী তাকওয়া ও বাতেনী তাকওয়া। জাহেরী তাকওয়া হল খারাপ কাজ না করা, নাজায়েয কাজ না করা, প্রত্যেক কাজ জায়েযের সীমার মধ্যে থেকে করা। আর বাতেনী তাকওয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি বিষয়। সবাই তা পারে না। উচ্চ স্তরের মুত্তাকী হওয়ার পরই কেবল তা সম্ভব। বাতেনী তাকওয়া হল অন্তরের চিন্তার বিশুদ্ধতা ও কল্পনার মধ্যেও খারাবীর অনুপ্রবেশ না ঘটা। ফকিহগণ লেখেন, কোন ব্যক্তি যদি সুন্দর রঙের কোন শরবত পান করার সময় এই চিন্তা করে, আমি মদ পান করছি, তাহলে সে গুনাহগার হবে। শরবতও তার কাছে মাকরূহ তাহরিমী হয়ে যাবে। যদিও মুখে মদ পান করেনি, কিন্তু খেয়ালের দ্বারা পান করেছে।

এমনিভাবে ফকিহগণ আরো লেখেন, কেউ তার স্ত্রীর সান্নিধ্যে আসার পর যদি অন্য কোন বেগানা নারীর কল্পনা করে স্ত্রীকে স্পর্শ করে তাহলে সে বাতেনীভাবে যিনাকারীর মধ্যে গণ্য হবে। সুতরাং অন্তরের চিন্তাও অন্যায়ভাবে হতে পারবে না। অন্যায়ভাবে খারাপ চিন্তা হতে খারাপ কাজের সূচনা হবে। খারাপ জযবা অন্তরে উদয় হলে আমলও নাপাক হয়ে যাবে। একেই বাতেনী তাকওয়া বলে। অর্থাৎ কলবের চিন্তা-চেতনা ও জযবা পরিশুদ্ধ ও পবিত্র হওয়া।

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ○

যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের উপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনা শক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে। [আল-আরাফ : ২০১]

চিন্তা ও বিবেচনা শক্তি জাগ্রত হওয়ার পরই তারা তওবা করতে উদ্বুদ্ধ হয়। কারণ চিন্তার মাধ্যমেই তো কর্মের সৃষ্টি হয়। যদি চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, যা ইচ্ছা তাই করার অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে মানুষ বহু খারাপ কাজে রত হয়ে যাবে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি মাসআলা খেয়াল করুন। বলা হয়েছে, বেগানা নারীর অযু করা অবশিষ্ট পানি দ্বারা বেগানা পুরুষের অযু করা মাকরূহ। কারণ, তার খেয়াল আসবে যে, অমুক নারীর অবশিষ্ট পানি এগুলো। এ চিন্তা যদি সামনে অগ্রসর হতে থাকে, তাহলে অনেক খারাপ কিছু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হাদীস বলা হয়েছে–

التقوى ههنا واشاد الى صدره صلى الله عليه وسلم .

তাকওয়া হল এখানে, এই বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বুকের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

যখন কলবের মধ্যে তাকওয়া এসে যাবে তখন আমলের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হবে। অন্তরে যদি তাকওয়া না থাকে তাহলে তার কাজেও তাকওয়া খুঁজে পাওয়া যাবে না। যাই হোক, ঈমানী জিন্দেগী যখন আসবে, তখন খেয়ালকেও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। খেয়ালের মধ্যেও এমন জিনিস আসতে পারবে না যাতে আল্লাহ নারাজ হন। কারণ আল্লাহ আপনার হাত পা যেমন দেখেন আপনার অন্তরকেও তেমন দেখেন।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

আল্লাহ তাআলা অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক অবগত রয়েছেন।

হাদীস শরীফে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

ان الله لا ينظر الى صوركم واعما لكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم

আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের আকার আকৃতি ও আমলসমূহ
দেখেন না, তিনি তোমাদের কলব ও নিয়তকে দেখেন।

পৃথিবীর বাদশাহদের বিধান কেবল শরীরের উপর কার্যকর কিন্তু আল্লাহ্র বিধান অন্তরের মধ্যেও কার্যকর। দুনিয়ার শাসকরা খারাপ কাজ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখতে পারে। চোর চুরি করলে তাকে জেলে দিতে পারে কিংবা ডাকাত ডাকাতি করলে জেলে পুরে রাখতে পারে কিন্তু কলব তো পরিবর্তন করতে পারে না। তা কেবল আল্লাহ্র বিধানের মাধ্যমেই পরিবর্তন হবে। দুনিয়ার শাসন ব্যবস্থা কাজ থেকে বিরত রাখে আর আল্লাহ্র শাসন ব্যবস্থা খারাপ কাজের প্রতি ঘৃণা অন্তরে সৃষ্টি করে দেয়।

আমার আলোচনার উদ্দেশ্য এই, খাওয়া, পান করা, নিদ্রা-জাগরণ, ওঠা-বসা, ঘর-বাড়ি নির্মাণ করা– এসব কিছুকে যখন স্বভাব নিয়ন্ত্রণ করত তখন তা জৈবিক জীবন হয়ে গিয়েছিল। বিবেক বুদ্ধি যখন এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করল তখন তা মানবিক জীবন হয়ে উঠল। আর আল্লাহ্র ওহী যখন এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করল তখন তা ঈমানী জীবন হয়ে গেল। বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত মানবিক জীবনের যে মৌলিক বিষয় ছিল ঈমানী জীবন তাকে সংশোধিত ও উন্নত করে তুলেছে। ইসলামী শরীয়ত আপনাকে পানাহার, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার প্রভৃতি থেকে ফিরিয়ে রাখে না; বরং এসব কিছু যথার্থরূপে সংশোধিত করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির মাধ্যমরূপে গড়ে তোলে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। শুধু নামায রোযাই শিক্ষা দেয় না; বরং তার সম্পর্ক সালতানাতের সিংহাসন পর্যন্ত। মানব জীবনে যা কিছু রয়েছে তার সব কিছুর সাথেই ইসলাম সম্পর্কিত।

বদর যুদ্ধের সময় হযরত আলী (রা.) আবু জাহেলকে ভূলুণ্ঠিত করে তার বুকের উপর উঠে যখন তরবারী চালাতে যাচ্ছেন তখন আবু জাহেল তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করে। সাথে সাথে হযরত আলী (রা.) তাকে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে যান। আবু জাহেল বলল, হে আলী! আমি তোমাকে জ্ঞানী বলেই জানতাম। আজ তুমি তোমার শত্রুকে কাবু করে ফেলেছিলে। আর শত্রুও এমন, যে তোমার নিজের শুধু নয়, তোমার পয়গাম্বর ও দীনেরও শত্রু। আজ তাকে ভূলুণ্ঠিত করেও ছেড়ে দিলে! এর চেয়ে বোকামী আর কী হতে পারে!

হযরত আলী (রা.) উত্তরে বললেন, আমি আল্লাহর জন্য তোমার সাথে যুদ্ধ করতে এসেছি, নফসের তাগাদায় আসিনি। তুমি যখন আমার মুখে থুথু নিক্ষেপ করলে তখন আমার মনে ঘৃণার উদ্রেক হল। আমি যদি তোমাকে হত্যা করতাম, তা হত নফসের তাগাদায়। আর আমার ইবাদত বরবাদ হয়ে যেত। আমি আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করছি আর তুমি হলে আল্লাহর দুশমন। তুমি আল্লাহর দীনকে ধ্বংস করতে চাও বলেই তোমার সাথে আমাদের যুদ্ধ। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমি যুদ্ধ করছি, নিজের নফসের চাহিদায় নয়।

মানুষ যে কাজ করে থাকে সকলেই সে কাজ করে। কাফের পানাহার করে, মুমিনও পানাহার করে। তারা লড়াই করে, সন্ধি করে– মুমিনও তাই করে। পার্থক্য কী? মুমিন তার সকল কাজ আল্লাহর জন্য করে থাকে, আর কাফের নিজের নফসকে খুশি করার জন্য করে। মুমিনের থেকে নফসানিয়াত খতম হয়ে যায়, তার সকল কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন আল্লাহ। সুতরাং কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না, পার্থক্য থাকে নিয়তে এবং আত্মায়। একজনের গতি জমিনের দিকে আরেকজনের গতি আকাশের দিকে।

সুতরাং ঈমানী জিন্দেগী শুধু গতি পরিবর্তন করে দেয়, আমলের মধ্যে পরিবর্তন করে না। নফস বিশুদ্ধ হওয়াকে ঈমানী জিন্দেগী বলে। অতএব, আমরা যদি শুধু পানাহার ও সাজসজ্জা নিয়ে ব্যস্ত থাকি তাহলে আমরা জীবজন্তুর চেয়ে বেশি কিছু হব না। যদি আমরা জাতির সেবা বা জাতীয় কল্যাণে কোন কিছু করি তাহলে বেশির বেশি আমরা মানুষ হয়ে উঠব, কিন্তু মুমিন হব না। আর যখন মুমিন হব তখন সবকিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করব।

হযরত ইবরাহিম (আ.)কে আল্লাহ যখন বললেন–

إِذْقَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ

যখন তার প্রভু তাকে বললেন, হে ইবরাহিম! তুমি মুসলমান হয়ে যাও।

এর মানে এই নয় যে, ইতোপূর্বে তিনি কাফের ছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)।

মুসলমান হওয়ার অর্থ হল, আত্মসমর্পণ কর। অর্থাৎ নিজেকে আমার কাছে সমর্পণ করে দাও। যাই কর, নিজের নফসের সন্তুষ্টির জন্য করো না।

قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

তিনি বললেন, আমি বিশ্বপালকের কাছে সমর্পিত হলাম।

এরপর আল্লাহ তাআলা বললেন, তবে ঘোষণা কর–

قُلْ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

হে ইবরাহিম! তুমি বলে দাও, আমার নামায, আমার হজ, আমার জীবন, আমার মৃত্যু– সবকিছুই আল্লাহর জন্য, যাঁর কোন শরীক নেই। আর এজন্যই আমি নির্দেশিত হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম। [আনআম : ১৬৩]

মুসলমান হওয়ার মানে হল, খাওয়া, পান করা, জীবন, মৃত্যু আল্লাহর জন্য হয়ে যাওয়া। সুতরাং ঈমান এসে অন্য কোন জীবন শিক্ষা দেয় না, সেই মানব জীবনকেই পরিশুদ্ধ করে দেয়।

মানব জীবনের চতুর্থ ধাপ : আধ্যাত্মিক জীবন

ঈমানী জিন্দেগীতে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে তাঁর নির্দেশিত বিধানাবলীর উপর আমল করা হয়ে থাকে। যত হুকুম আহকাম রয়েছে তা পালন করার নাম ঈমান ও ইসলাম। হুকুম আহকাম পালন করতে করতে এক পর্যায়ে এমন হয়ে যায় যে, নির্দেশদাতার মানসিকতার আনুগত্য করতে শুরু করে এবং বিধানাবলী যা রয়েছে তার চেয়ে বহু উর্ধ্ব পর্যায়ের আমল করতে থাকে। একে বলা হয় মারেফাত বা আধ্যাত্মিকতা।

যেমন- আপনার কোন প্রিয় ব্যক্তি আপনার কাছে ফুল চাইল। আপনি বাগান থেকে ফুল তুলে তাকে দিলেন। এ হল কানুন বা বিধানের আনুগত্য। আপনি যদি পুরো ফুলের বাগানটিই তাকে দিয়ে দেন, তবে তা হবে বিধানের বহু উর্ধ্বে আমল করা। আল্লাহ বলেছেন, যখন আহার

করবে তখন তা থেকে সামান্য অংশ আল্লাহর নামেও দান কর। এক্ষেত্রে মানসিকতার আনুগত্য হবে এমন– পুরো খামার দান করে দিয়ে নিজে রোযা রাখা।

মানুষ এমন কাজ তখনই করতে পারবে যখন নির্দেশদাতা তার সামনে উপস্থিত থাকবে। নির্দেশদাতা সামনে উপস্থিত থাকলে তখন আর নির্দেশের অপেক্ষা করার প্রয়োজন পড়ে না। তার দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা বুঝে আমল করে। তার চেহারা দেখেই বুঝতে পারে– কী চায়, কী চায় না।

বাদশাহ আওরঙ্গজেবের ঘটনাবলীর মধ্যে একটি ঘটনা উল্লেখ আছে। তার কমান্ডার ইন চার্জ একবার সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করতে শুরু করল এবং সৈনিকদের মধ্যে ঘোষণা দিয়ে দিল যে, দুকান-এ যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। কেউ একজন কমান্ডারের কাছে জানতে চাইল, এটা কি বাদশাহ নির্দেশ দিয়েছেন? কমান্ডার বলল, না, তিনি নির্দেশ দেননি। তবে বাদশাহ একবার সিংহাসনে বসা ছিলেন আর আমি পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এ সময় মজলিসে যখন দুকান-এর আলোচনা উঠল তখন বাদশাহ খুব রাগি দৃষ্টিতে দুকান-এর দিকে তাকাল। আমি বুঝে গেলাম, দুকান-এর ব্যাপারে তার অন্তরে যুদ্ধের চিন্তা এসেছে। নির্দেশ যদিও আসেনি, কিন্তু আমি বাদশাহর মানসিকতা বুঝি।

কমান্ডার যদি আওরঙ্গজেবের সামনে না থেকে দূরে কোথাও থাকত তাহলে নির্দেশ পাওয়ার অপেক্ষা করত। কিন্তু যেহেতু সামনে দাঁড়িয়ে ছিল তাই দৃষ্টি দেখেই বুঝে গেছেন। সুতরাং মানসিকতা বুঝতে পারার মানে হল তার পরিচয় লাভ করা। একেই মারেফাত ও ইরফান বলা হয়। ইলম ও বিশ্বাসের মাধ্যমে আল্লাহর যে পরিচয় লাভ হয় তা হয়ে থাকে অদৃশ্য। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সামনে দেখে যখন ইবাদত করা হয় তখন আর বিধানের অপেক্ষার প্রয়োজন পড়ে না। দৃষ্টি ও অবয়ব উদ্দেশ্য বলে দেয়। একে মারেফাত বা আধ্যাত্মিকতার জীবন বলে।

নবী ও ওলীগণ, যাদের আল্লাহর মারেফাত অর্জিত হয়ে থাকে। তারা নির্দেশ আসার পূর্বেই আল্লাহ কী চান তা বুঝতে পারেন। বহু আল্লাহওয়ালা

ও কামেল ওলী এমন আছেন যারা তাদের অন্তরে উদিত বিষয় দ্বারা আল্লাহর ইচ্ছা ও মানসিকতা বুঝতে পারেন। তা শরীয়তের বিধান হয় না বলে তার তাবলীগ করেন না কিন্তু নিজেরা তা যথাযথ করেন।

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী, যিনি দারুল উলুম দেওবন্দের সকলেরই শায়খ ছিলেন। তিনি মক্কায় হিজরত করে যাওয়ার পর সারা জীবনে কালো রঙের জুতা পরেননি। লোকেরা জানতে চাইলো, শরীয়তে কি তা জায়েয নেই? তিনি বললেন, জায়েয আছে। নিজে না পরার কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, বাইতুল্লাহর গিলাফ কালো রঙের। এ রঙ পায়ে ব্যবহার করা আমার কাছে বেয়াদবী বলে মনে হয়। এ ছিল মানসিকতা থেকে প্রাপ্ত আল্লাহর প্রতি আগ্রহের ফল। আগ্রহের ভিত্তিতে এমন বহু কাজ মানুষ করে থাকে যা বিধান নয়, কিন্তু তার আগ্রহ তাকে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। একে মারেফাতী জীবন বলে।

সুতরাং কামেল ওলীগণের জীবন মারেফাতী জীবন হয়ে থাকে। তারা শুধু জায়েযের সীমার মধ্যেই থাকেন না; বরং জায়েযের ভেতরেও দেখেন আল্লাহর মানসিকতা কী? যদি কম খাওয়া দেখতে পায় তবে কম খায়। যদি না খাওয়া দেখতে পায় তবে উপোস থাকে।

হযরত সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য ওলীগণ, যাঁরা দারিদ্র ও ক্ষুধার্ত থাকা পছন্দ করতেন। শরীয়ত তাঁদেরকে সে নির্দেশ দেয়নি। তথাপি বহু ওলী সে পথ গ্রহণ করেছেন। যেমন- হযরত শায়খ আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী (রহ.)। তিনি এক সপ্তাহব্যাপী অনাহারী থাকতেন। শরীয়তের নির্দেশে তিনি এমন করতেন না, তাঁর প্রতি আল্লাহর ইচ্ছা এই ছিল যে, সাধনার কষ্ট যত বেড়ে যাবে তার মর্যাদা তত উঁচু হবে।

হযরত শাহ আবুল মায়ালী (রহ.) অনাহারী থাকাকে খুব পছন্দ করতেন। একাধারে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত অনাহারী থাকতেন। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এমন করতেন, অভাবের তাড়নায় নয়। তাঁদের মত ব্যক্তিদের সম্পদের অভাব থাকতে পারে না। দৌলত তাঁদের পায়ে গড়াগড়ি খায়।

একবার তাঁর পীর আবুল মায়ালী (রহ.)-এর ঘরে এলেন। তখন তিনি বাড়িতে ছিলেন না। বাড়ির লোকজন পেরেশান হয়ে গেলেন। ঘরে কোন খাবার নেই, অথচ ঘরের মুরব্বীর পীর এসেছেন। কিভাবে তাঁর

মেহমানদারী করবে এই চিন্তায় তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে রইলেন। পীর সাহেব ব্যাপারটি অনুভব করতে পেরে এক টাকার গম আনিয়ে একটি তাবিজ লিখে তাতে রেখে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ বরকত দিবেন। পীর সাহেব তাদের বাড়িতে এক সপ্তাহ অপেক্ষা করে চলে গেলেন। সবাই মিলে এ এক সপ্তাহ নিয়মিত আহার করার পরও গম শেষ হল না। দুই সপ্তাহ পর হযরত শাহ আবুল মায়ানী (রহ.) বাড়ি ফিরে এসে দেখলেন, নিয়মিত দুই বেলা রুটি খাওয়া হচ্ছে। ঘরে কোন সম্পদ থাকার কথা নয়, কীভাবে এল? তিনি বাড়ির লোকদের কাছে জানতে চাইলে তারা ঘটনা জানালেন। তিনি বললেন, তোমরা খুব বেয়াদবী করেছ। আমার পীরের তাবিজ গমের মধ্যে রেখে দিয়েছ। নিয়ে আস, আমি তা মাথায় রাখব। তাবিজ এনে দিলে তিনি তা পাগড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলেন। এরপর গম শেষ হয়ে গেল। পুনরায় দারিদ্র্য ও অনাহার শুরু হল। শরীয়তের এ বিধান কোথায় যে, সপ্তাহ সপ্তাহ অনাহার থাকবে? কিন্তু বিধান প্রণেতার মানসিকতা তিনি উপলব্ধি করে নিয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, আল্লাহ দারিদ্র্য ও অনাহারী জীবন তাঁর থেকে কামনা করছেন, যাতে মর্যাদা উন্নত, রুহানিয়াত বৃদ্ধি পায়।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবনীতে দেখা যায়, কখনো কখনো দুই মাস যাবত তাঁর ঘর থেকে রান্নার ধোঁয়া উড়ত না। এক টুকরো খেজুর আর পানির উপর নির্ভর করে তৃপ্ত হতেন। কুরআনের কোথাও তো এ নির্দেশ নেই যে, আপনি দুই মাস যাবত উপোস করবেন। কিন্তু বিধানের চেয়েও ঊর্ধ্বে সে বিধান প্রণেতার ইচ্ছা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তরে ভাস্বর ছিল যে, নবীগণের পবিত্র জীবনের দাবী হল তাঁরা পানাহার ও দুনিয়ার স্বাদ গ্রহণের প্রতি সামান্যতমও ধাবিত হবেন না। তাঁদের মনোযোগ থাকবে আল্লাহর সত্তার দিকে, ইলম ও মারেফাতের দিকে। সুতরাং বিধান প্রণেতার মানসিকতা অবগত হয়ে আমল করাকে মারেফাত বা ইরফানী জিন্দেগী বলে। কিন্তু এই ইরফানী জীবন বা আধ্যাত্মিক জীবনের মৌলিক বিষয় কিন্তু সেগুলোই যা ছিল জৈবিক জীবনে। সেই খাদ্য, পানীয়, আবাস– সব কিছুই। পার্থক্য কেবল এই, এখন এর নিয়ন্ত্রক হয়েছে আল্লাহর মানসিকতা ও ইচ্ছা।

১. জৈবিক জীবনে স্বভাব তাকে নিয়ন্ত্রণ করত। যে ছিল এক মূর্খ শাসকের মত। যার আওতায় মানুষ প্রাণীদের মত শুধু পানাহার করত।

২. মানবিক জীবনে এসে বুদ্ধি তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। এবার খাবার গ্রহণের সময় সে চিন্তা-চেতনা ও বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটায়।

৩. ঈমানী জীবন এসে ওহী তার নিয়ন্ত্রক হয়। পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা তাতে সৃষ্টি হয়।

৪. আধ্যাত্মিক জীবনে আল্লাহর মানসিকতা ও ইচ্ছা ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। এ সময় মানুষের জীবন অত্যন্ত উন্নত হয়ে ওঠে। যেমন- নবীগণ, কামেল ওলীগণ ও উলামায়ে রব্বানীগণের জীবন। যে জীবনে নফসানিয়াতের কোন গন্ধও নেই। লিল্লাহিয়াতের আবেগ কাজ করে। বন্ধুত্ব ও শত্রুতা সবই আল্লাহর জন্য হয়ে থাকে। হাদীসে এসেছে–

من اعطى لله ومنع لله واحب فى الله وابغض لله فقد استكمل الايمان .

যে ব্যক্তি কাউকে কিছু দিলে তা আল্লাহর জন্য দেয় এবং কাউকে কিছু দেয়া থেকে বিরত থাকলে আল্লাহর জন্যই বিরত থাকে। যার ভালবাসাও আল্লাহর জন্য এবং শত্রুতাও আল্লাহর জন্য। সে তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করল।

সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বাড়ি ঘর পর্যন্ত দান করে দিয়েছেন। শরীয়তের বিধান থেকে অগ্রসর হয়ে সবকিছু ওয়াকফ করে দিয়েছেন। তা না হলে ওয়াজিব সদকা আদায় করলেই হক আদায় হয়ে যেত। তারা ছিলেন ইরফানী জিন্দেগী বা আধ্যাত্মিক জীবন যাপনকারী। এ জীবনের অধিকারীগণ সব সময় আল্লাহর সামনে উপস্থিত থাকেন, আল্লাহকে দেখেন।

ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك .

এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি এ স্তরে পৌঁছতে না পার তাহলে অন্তত

এমনভাবে কর যেন তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন। [আল-হাদীস]

মানব জীবনের পঞ্চম ধাপ : ফানাফিল্লাহ

মানুষের জীবন যখন এমন হয়ে যায় যে, সকল কাজ সে আল্লাহকে দেখে দেখে করে, তখন সে শুধু এতেই সন্তুষ্ট হতে পারে না, আরো অগ্রসর হতে চায়। তার আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়– মুসাফাহা করব, মুআনাকা করব, বুকে বুক মেলাবো, আল্লাহর সাথে মিলে যাব। এসব আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে তৈরি হতে থাকে। হাদীসে এসেছে–

لا يزال يتقرب عبدى بالنوافل حتى كنت سمعه اللتى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده اللتى يبطش بها.

বান্দা নফল ইবাদত করতে করতে আমার এমন নৈকট্যশীল হয়ে যায় যে, আমি তার কান হয়ে যাই, যার দ্বারা সে শোনে; আমি তার চোখ হয়ে যাই, যার দ্বারা সে দেখে; আমি তার হাত হয়ে যাই, যার দ্বারা সে ধরে।

অর্থাৎ বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার থাকে কিন্তু তাতে আমার শক্তি কার্যকর থাকে। এটা যেন এমন, নিজের নফসকে বিলীন করে দিয়ে নিজেকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করে দিয়েছে, আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে দিয়েছে এবং আল্লাহ তাআলার সত্তা ও তাজাল্লির ভেতর ডুবে গিয়েছে। যাকে কোন এক কবি এভাবে বলেছেন–

من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جاں شدی

تا کس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری

আমি তুমি হয়ে গিয়েছি আর তুমি আমি হয়ে গিয়েছ। আমি দেহ হয়ে গিয়েছি, তুমি জীবন হয়ে গিয়েছ। এরপর আর কেউ বলতে পারবে না যে, তুমি ও আমি ভিন্ন কেউ।

এ জীবনকে আমরা 'আহদানী জিন্দেগী' বা একীভূত জীবন বলব। কারণ আল্লাহর সাথে বান্দা একীভূত একতার সৃষ্টির হয়ে গিয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, বান্দা আল্লাহর মধ্যে ডুবে গিয়ে তার অংশ হয়ে গিয়েছে। বরং অর্থ হল এই, সে নিজের নফসের চাহিদাকে খতম করে দিয়ে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের আবেগ তৈরি করে দিয়েছে। তিনি যা করেন আমি তাই করব, তিনি যা চান আমি তাই চাইব।

এক ব্যক্তি কোন এক বুযুর্গের কাছে জানতে চাইল, কী অবস্থায় আছেন?

বুযুর্গ ব্যক্তি বললেন, যাঁর ইচ্ছায় উভয় জাহানে কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় তাঁর অবস্থা কেমন হতে পারে বুঝে নাও।

ঐ ব্যক্তি জানতে চাইল, আপনি কি এ পর্যায়ে রয়েছেন?

বুযুর্গ ব্যক্তি বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! আমি এ স্তরে রয়েছি। এরপর ঐ ব্যক্তি জানতে চাইল, তা কিভাবে সম্ভব হল?

বললেন, উভয় জাহানের কর্মকাণ্ড আল্লাহর ইচ্ছামত পরিচালিত হয় আর আমি আমার ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার ভেতরে বিলীন করে দিয়েছি। তিনি যা চান আমিও তাই চাই। কেউ জন্ম নিলে বলি আলহামদুলিল্লাহ, এটাই উত্তম। যদি কেউ মারা যায় তাহলেও বলি আলহামদুলিল্লাহ, এটাই যথার্থ ছিল। আল্লাহর রায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার আমি কে? তিনি কাউকে মারতে চাইলে আমি কেন তাকে জীবিত রাখার কথা বলব? এভাবেই সমগ্র জগত আমার ইচ্ছামত চলতে শুরু করল।

আমবালা জেলায় শাহ দৌলা নামে এক বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে তিনি খুব দৃঢ় ছিলেন। একবার তাঁর গ্রামে প্রবল বৃষ্টি হয়ে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হল। ওদিকে নদীতেও তুমুল তুফান শুরু হয়ে গেল। নদী ও গ্রামের মধ্যে একটি বাঁধ ছিল বিধায় নদীর প্রবল স্রোত ও তুফান গ্রামকে গ্রাস করতে পারছিল না। কিন্তু এক পর্যায়ে যখন বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হল তখন গ্রামবাসী উদ্বিগ্ন হয়ে দুআ করার জন্য শাহ দৌলা (রহ.)-এর কাছে ছুটে এল। তিনি কোদাল নিয়ে তাদের সাথে বাঁধের কাছে গেলেন। তিনি গিয়ে বাঁধ কাটতে শুরু করে দিলেন। গ্রামবাসী চিৎকার শুরু করল– হযরত! কী করছেন? পুরো গ্রাম তো ডুবে যাবে!

তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন– 'জিধার মাওলা, ওধার শাহ দৌলা– যে দিকে মাওলা, সেদিকে শাহ দৌলা।' আমি কি আল্লাহর বিরুদ্ধে মোকাবেলা করতে আসতে পারি?

পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে–

وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ

আল্লাহ যা কামনা করেন তোমরা তাই কামনা কর। তাঁর বিপরীত তোমরা কিছু কামনা কর না। [তাকবীর : ২৯]

আল্লাহর ইচ্ছা ও পছন্দকে নিজের পছন্দ সাব্যস্ত করা এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বিলীন করে দেয়ার স্তর যার সৌভাগ্য হবে তার ব্যাপারে আমরা বলবো, সে আদোনী জিন্দেগীর অধিকারী হয়েছে বা ফানাফিল্লাহ হয়েছে।

এখানেও জীবনের মৌলিক বিষয় সেই একই– পানাহার, বসবাস, পোশাক-পরিচ্ছদ। কিন্তু সেগুলো এই স্তরে এসে বিধানের ঊর্ধ্বে গিয়ে আল্লাহর ইচ্ছার আনুগত্যে ডুবে থাকা ও তাঁর সন্তুষ্টিতে ফানা হয়ে যাওয়ায় রূপ নিয়েছে।

এ স্তরের ভিত্তিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছিল–

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

আপনি যখন নিক্ষেপ করেছিলেন তখন মূলত আপনি নিক্ষেপ করেননি, আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন।

বদর যুদ্ধের সময় হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের দিকে কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন। সে কংকর যাদের শরীরে লেগেছিল তাদের শরীর, মাথা, বুক ভেদ করে চলে গিয়েছিল। কংকরের মধ্যে এমন শক্তি থাকে না। কিন্তু হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে আল্লাহর জযবা বিদ্যমান ছিল বিধায় তাঁর শক্তিতে এমন প্রভাব তৈরি হয়েছিল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ছিলেন কাজের মাধ্যম এবং খোদায়ী শক্তি কাজ করছিল। পূর্বোক্ত আয়াতে এ প্রসঙ্গই উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যত্র আল্লাহ ইরশাদ করেন–

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى ○

আমার রাসূল তার কাছে আগত প্রত্যাদেশ ব্যতীত মনগড়া কিছুই বলেন না। [নাযম : ৩-৪]

এর দ্বারা উদ্দেশ্য, মুখ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিন্তু কালাম আল্লাহর। কুরআন ব্যতীত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে যেসব কথা বলেছেন তাও এর আওতাভুক্ত। অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ○

হে নবী! যারা আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেন, তারা আপনার হাতে নয়, আল্লাহর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন।

يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ

আল্লাহর হাত সকলের হাতের ঊর্ধ্বে। [ফাতাহ : ১০]

এসব আয়াতে নবীর হাতকে নিজের হাত বলা হয়েছে। নবীর কালামকে নিজের কালাম বলা হয়েছে। নবীর ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছা বলা হয়েছে। এসব বলা হয়েছে 'অহদাত' তথা একীভূত হওয়ার ভিত্তিতে। জীবন এ স্তরে পৌঁছে গেলে অহদানী জিন্দেগী অর্জিত হয়।

শেষ কথা

আমি পাঁচ ধরনের জীবনের কথা আলোচনা করেছি। জৈবিক জীবন, মানবিক জীবন, ঈমানী জীবন, আধ্যাত্মিক জীবন ও একীভূত জীবন। কিন্তু এই পাঁচ স্তরের মধ্যে প্রথম দুটি স্তর ব্যাপক ও সার্বজনীন এবং শেষ দুটি

ফলাফলের পর্যায়ভুক্ত। মধ্যখানের স্তরটি, যাকে আমি ঈমানী জীবন বলেছি, সেটিই মূল উদ্দেশ্য। জীবনের জন্য জৈবিকতাও আবশ্যক কিন্তু তা মূল উদ্দেশ্য নয়। মূল উদ্দেশ্য হল সকল কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া, যাকে আমরা ঈমানী জিন্দেগী বলেছি। এটাই শরীয়ত এবং শরীয়তের অনুসরণ। জৈবিক জীবন ও মানবিক জীবন না হলে শরীয়তের বিধানের আনুগত্য সম্ভব হয় না। ঈমানী জিন্দেগীকে কুরআন হায়াতে তাইয়্যেবা বলেছে। ইরশাদ হয়েছে– 'যে নারী ও পুরুষ ঈমান গ্রহণ করবে এবং সৎকর্ম করবে আমি তাকে হায়াতে তাইয়্যেবা দান করব।' অর্থাৎ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জীবন দান করব। আর তা হল হালাল খাদ্য খাওয়ার আগ্রহ তার মধ্যে চলে আসবে এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকবে। কোন শহরের সকলে যদি হারাম জিনিসকে বিসর্জন করে সঠিক পথে চলে আসে তাহলে পারস্পরিক ভালবাসা ও আচরণের সৃষ্টি হবে। ইসলামী শরীয়তের আনুগত্যেই মূলত নিরাপত্তা রয়েছে। সুতরাং কোন দেশের নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও প্রশান্তি, যা মূল বুনিয়াদী বিষয় তা আদর্শের আনুগত্যে নিহিত রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হায়াতে তাইয়েবা দান করুন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শের আনুগত্য নসিব করুন। আমীন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

বয়ান : ৭

ইলমের দর্শন

ইলম একটি পবিত্র জিনিস। তাকে পবিত্র পাত্রেই রাখতে হবে। যে পাত্রের মধ্যে গাইরুল্লাহ ও দুনিয়ার অন্বেষণ রয়েছে, সে পাত্রে ইলম রাখা যেন স্বর্ণের পাতে নাপাকী রাখা। সুতরাং ভালবাসা হবে শুধু এক আল্লাহর জন্য। দুনিয়া ব্যবহারের জিনিস। ভালবাসার জিনিস নয়। যত ইচ্ছা দুনিয়াকে ব্যবহার কর কিন্তু ভালবাসা হতে হবে শুধু এক আল্লাহরই সাথে। ইলমের সম্মান অর্জিত হওয়ার পর কোন গাইরে ইলমকে অন্বেষণ করা এমন যে, একজন আলেম চাচ্ছে আমি জাহেল হয়ে যাব, এই ভাল। এটা কি কোন বুদ্ধিমানের কথা হতে পারে?





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

বুযুর্গানে মুহতারাম!

উলামা, ফুযালা ও তোলাবাদের এই মজলিসে আমার মত স্বল্প পুঁজির অধিকারী ব্যক্তি আলোচনা করব, এতে আমার প্রকৃতপক্ষেই লজ্জা অনুভূত হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ! এখানে এমন ফুযালাগণও রয়েছেন সম্মানের দিক দিয়ে যাদেরকে আমার শিক্ষকের মর্যাদায় গণ্য করি। সুতরাং এ ধরনের মজলিসে আলোচনা রাখাকে কিছু অসৌজন্য মনে হচ্ছে এবং লজ্জাও অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু আলোচনা করার নির্দেশও আমাকে বাধ্য করছে। তাই আমার আলোচনা যেমনই হোক, তা ছাত্রদের জন্য হবে। যদিও ইলমের দিক দিয়ে আপনারা আমার চেয়ে এগিয়ে, আপনাদের ইলম এখনো তাজা রয়েছে। তবুও আপনারা এখনও তালিবে ইলম এবং আমিও তাই। এজন্যই আমার আলোচনার মূল লক্ষ্য হবেন তালিবে ইলমগণ। সম্মনিত শিক্ষকগণ তার ঊর্ধ্বে থাকবেন।

আলোচনার বিষয় কী হবে? মজলিসের স্থানই বলে দিচ্ছে আলোচনার বিষয়বস্তু কী হবে। এটা ইলমের মারকাজ। এজন্য ইলম ও তালিমের বিষয়ে কিছু কথা বলতে চাচ্ছি।

ইলমের অন্বেষণ স্বভাবজাত

প্রথম কথা হল মানুষের মধ্যে ইলমের আগ্রহ ও জযবা স্বভাবজাত, অর্থাৎ এ আগ্রহ সৃষ্টি করাতে হয় না। মানুষ স্বভাবগতভাবেই একে অনুসন্ধানযোগ্য মনে করে। সর্বদা তার মন চায় আমার ইলম বাড়তে থাকুক। ইলমের আধিক্য দ্বারা কখনো সে ক্লান্ত হয় না। সব সময় আপনার মন চায় ভাল ভাল জিনিস আপনার চোখের সামন দিয়ে অতিবাহিত হোক এবং আপনি তা দেখেন। এটা জ্ঞানের অনুসন্ধান নয় তো কী? মন চায় সুন্দর থেকে সুন্দর সুন্দর কথা কানে আসতে থাকুক। এটা ইলমের অনুসন্ধান নয় তো কী? কারো পত্রিকা দেখতে মন চায়, কারো বইপত্র পড়তে মন চায়। সকালে উঠে প্রত্যেকেই চেষ্টা করে পত্রিকায় কী লিখেছে তাই দেখতে। এগুলো ইলমের অনুসন্ধান।

বাজারে কারো সাথে ঝগড়া বাধলে চারদিকে লোক জড় হয়ে যায়। এরা ঝগড়ায় অংশ নিতে নয়; কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে তার জ্ঞান হাসিল করতে

চায়। যাই হোক, ইলম হল স্বভাবজাত। আর স্বভাবজাত জিনিসের জন্য দলিল প্রমাণ আবশ্যক হয় না। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, এগুলো স্বভাবজাত। কারো ক্ষুধা লাগলে তা দলিল প্রমাণের মাধ্যমে লাগে না। আপনি দলিল প্রমাণ দিয়ে কারো ক্ষুধা লাগাতে পারবেন না। ক্ষুধা লাগার পর শত দলিল প্রমাণ দিয়েও আপনি তা নিবৃত করতে পারবেন না। পিপাসা দলিল প্রমাণের মাধ্যমে লাগানো যায় না, স্বভাবগতভাবে লাগে।

ইলমের অনুসন্ধান মানুষের স্বভাবজাত। এজন্য আল্লাহ তাআলা মাথা হতে পা পর্যন্ত দেহকে ইলমের অনুসন্ধানী করেছেন। মানুষের প্রতি কোষে কোষে জ্ঞান বিদ্যমান। পুরো চামড়ায় অনুভূতি রয়েছে। স্পর্শ ক্ষমতা রয়েছে। যা শক্ত-নরম, গরম-ঠাণ্ডা প্রভৃতির জ্ঞান অর্জন করে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমগ্র দেহই যেন শিক্ষার্থী। চোখ আকৃতি ও দৃশ্যের জ্ঞান অর্জন করে। কান আওয়াজের ইলম অর্জন করে, নাক সুগন্ধী দুর্গন্ধের জ্ঞান অর্জন করে। জিহ্বা স্বাদের জ্ঞান অর্জন করে। সুতরাং বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান ও বোধ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। আর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব সময় জ্ঞান অর্জনের চেষ্টায় বিভোর থাকে। দৃষ্টিমান ব্যক্তি কখনো না দেখা কামনা করবে না। শ্রুতিশক্তির অধিকারী না শুনতে চাইবে না। দেখা, শোনা, স্বাদ নেয়া, ঘ্রাণ নেয়া ও অনুভব করার অন্বেষণ সর্বসময় থাকেই। প্রতি মুহূর্তে ইলমের অন্বেষণে মানুষ রত থাকে।

ইলম অর্জনের মাধ্যম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

ইলম অর্জন করার জন্য আল্লাহ মানুষের মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন–

مِنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর। [নামল : ৭৮]

মায়ের পেট থেকে মানুষ জ্ঞান নিয়ে আসে না। যোগ্যতা নিয়ে আসে না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে অনুভব ও বুঝ গ্রহণ করে ধীরে ধীরে যোগ্যতা বাড়তে থাকে। কার্যক্ষম হয়। এক পর্যায়ে গিয়ে মানুষ পূর্ণ জ্ঞানী হয়ে যায়। যাই হোক, মানুষ বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকে। এ জ্ঞান লাভের অঙ্গসমূহের বেশির ভাগ চেহারার মধ্যে বিদ্যমান। চোখ, কান, নাক এসব বড় মাধ্যমগুলো চেহারাতেই রয়েছে। শুধু অনুভূতি ক্ষমতা সারা দেহে ছড়ানো। আর তা খুব বেশি উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। উল্লেখযোগ্য অঙ্গ দুই তিনটি। এগুলোই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাহল দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বুঝশক্তি। এজন্যই কুরআনে বেশির ভাগ সময় এ ক্ষমতাসমূহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا، وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُولٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ

আমি বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য তৈরি করে রেখেছি। তাদের অন্তঃকরণ রয়েছে অথচ তারা বোঝে না। তাদের দৃষ্টিশক্তি রয়েছে অথচ তারা দেখে না, তাদের শ্রবণেন্দ্রীয় রয়েছে অথচ তারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম। তারাই গাফেল।

এখানে তিনটি অঙ্গের কথা উল্লেখ করা হয়েছে– চোখ, কান, অন্তর। এ তিনটি অঙ্গই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমলের অঙ্গ অপেক্ষা ইলমের অঙ্গ ফযিলতপূর্ণ

চোখ, কান ও নাক হল ইলমের অঙ্গ। অর্থাৎ এগুলো দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান অর্জিত হয়। হাত পা হল কর্মের অঙ্গ। ইলমের অঙ্গকে শরীরের ঊর্ধ্বাংশে অর্থাৎ মুখমণ্ডলে রাখা হয়েছে। এতে ইলমের ফযিলত প্রমাণিত হয়। চোখ, নাক, কান প্রত্যেকেই আলেম। মুখমণ্ডল যেন এক আলেমের

আবাসভূমি। এজন্যই চেহারা সম্মানের জিনিস। চেহারার উপর চুমু খাওয়া হয়, চেহারায় মারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার সম্মানের কারণেই। ইলম সম্মানের জিনিস বলেই ইলমের অঙ্গগুলো শরীরের উপরে রাখা হয়েছে। চোখের ক্ষমতা পায়ে নেই কিংবা শ্রবণ ক্ষমতা হাতের আঙ্গুলে নেই।

ইলমের অঙ্গসমূহ যেন আলেম শ্রেণী এবং অন্যান্য অঙ্গসমূহ যেন মজুর শ্রেণী। হাত পায়ের সম্পর্ক ইলমের সাথে নয়, কাজের সাথে। পরকালে যখন কোন আযাব দেয়া হবে তখন বলা হবে, এগুলো তোমাদের হাতের উপার্জন। সুতরাং হাত পা যেন মজুর শ্রেণীর অঙ্গ, আলেম শ্রেণীর অঙ্গ নয়। তবে মজুর হলেও তার মধ্যে কিছুটা ইলম তো থাকে। হাত পায়ের মধ্যেও তেমন কিছুটা রয়েছে। যেমন অনুভূতির জ্ঞান। কিন্তু সেটা এমন কোন বিশেষ জ্ঞান নয় যাকে স্বতন্ত্র জ্ঞান বলে আখ্যায়িত করা যায়। সুতরাং উল্লেখযোগ্য ও উন্নততর জ্ঞান হল তাই যার আলেম করা হয়েছে চেহারার মধ্যে অবস্থিত অঙ্গসমূহকে। তাই বলতে পারি, আলেম শ্রেণীকে উপরে রাখা হয়েছে এবং মজুর শ্রেণীকে নিচে রাখা হয়েছে। এতে ইলমের অধিকারীদের জন্য ইঙ্গিত রয়েছে। তারা যেন বুঝে, আমাদেরকে । দেয়া হয়েছে তা অত্যন্ত সম্মানিত জিনিস, অত্যন্ত ইজ্জতের বিষয়।

ইলমের মর্যাদা রক্ষা করা

আল্লাহ তাআলা ইলমের সম্মান দিয়েছেন বিধায় আমাদেরও কর্তব্য তার সম্মান করা। ইলমের আমরা যত ইজ্জত করব আলেমের তত ইজ্জত বাড়বে। ব্যক্তি নিজের ইলমের অসম্মান করলে আলেমের অসম্মান সৃষ্টি হয়ে যাবে। যদি একজন আলেম তার ইলমের সম্মান না করে তাহলে অন্যের কী দায় পড়েছে তার ইলমের সম্মান করার? প্রথমে নিজের মর্যাদা রক্ষা করা আবশ্যক। ব্যক্তি যখন নিজের মর্যাদা অনুভব করবে তখন দুনিয়া তার সম্মানে নীত হতে বাধ্য। আর যদি সে নিজেই নিজের ইলমের বেইজ্জতি করে তাহলে অন্য কেউ তার ইজ্জত করার থাকবে না। ইমাম মালেক (রহ.)কে বাদশাহ হারুনুর রশীদ তার দুই ছেলে আমিনুর রশীদ ও মামুনুর রশীদকে মুয়াত্তা পড়ানোর জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তিনি অনুরোধে সাড়া দিলে হারুনুর রশীদ জানতে চেয়েছিলেন, কবে আসবেন?

উত্তরে তিনি বললেন, দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ানো ইলমের কাজ নয়। ইলম অনুসন্ধানকারীর কাজ হল ইলমের পেছনে ঘোরা। সাথে সাথে তিনি এও বললেন– এ ইলম তোমার দেশ থেকে প্রকাশ পেয়েছে, তুমিই যদি তার সম্মান না কর তাহলে দুনিয়ার কেউ তাকে সম্মান করবে না।

সুতরাং আলেমের প্রথম কর্তব্য হল তার ইলমের সম্মান বজায় রাখা। ইলমের সম্মান অমুখাপেক্ষিতায়। আলেম অসম্মান বয়ে আনে। এতে সে নিজেও অপদস্থ হয়। তার মধ্যে শুধু আখেরাতের তলব থাকবে, দুনিয়ার নয়।

দুনিয়া অন্বেষণকারীর দুনিয়াও মেলে না : দীন অন্বেষণকারীর উভয় মিলে

দুনিয়া অন্বেষণ দ্বারা অর্জিত হয় না; রবং অমুখাপেক্ষিতা দ্বারা অর্জিত হয়। এটা বুঝের ব্যাপার। লোকজন বুঝে নিয়েছে, দুনিয়ার যত অন্বেষী হওয়া যাবে দুনিয়া ততই ধরা দেবে। আপনি যদি দুনিয়ার অন্বেষী হয়ে যান তাহলে তার সামনে আপনি নীচ হয়ে গেলেন। দুনিয়া অর্জিত হবে ঠিকই কিন্তু আপনাকে অপদস্থ করে তবেই অর্জিত হবে। দুনিয়ার কাছে মাথা নত না করার মধ্যেই ইজ্জত নিহিত। তখনও দুনিয়া আসবে, তবে আপনাকে অসম্মান করে নয়। নিজে অসম্মানিত হয়ে আসবে।

اتت الدنيا وهى راغمة

দুনিয়া অপদস্থ হয়ে পদতলে লুটিয়ে পড়েছে।

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর একটি ঘটনা মনে পড়ল। শেখ এলাহী বখশ মারাঠী ছিলেন লাখপতি ব্যবসায়ী এবং হযরতের খুব অনুরাগী। তিনি খুব বড় ধরনের উপহার নিয়ে হযরতের সাথে সাক্ষাত করতে এলেন। দুই ব্যাগ ভর্তি আশরাফী ও হাজারো টাকার মালামাল নিয়ে এলেন। কিন্তু তিনি মনে মনে এই চিন্তা করতে করতে এলেন যে, আজ তাকে এমন হাদিয়া দেব যা এ পর্যন্ত কেউ তাঁকে দেয়নি। নিজের হাদিয়ার উপর তার এক ধরনের অহংবোধ ছিল।

مگر پیش اہل دل، نگہ دارید دل ☆ تانہ باشد از گماں بہ خجل،

আল্লাহর ওলীদের সামনে যাওয়ার সময় অন্তরকে নিয়ন্ত্রণে রেখে যাওয়া উচিত। আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে অনুভব ক্ষমতা দিয়েছেন। তারা তা দিয়ে অন্যের মনের অবস্থা বুঝতে পারেন। তারা তার চিকিৎসাও করতে জানেন। হযরত নানুতবী (রহ.) বুঝতে পারলেন, তার মনে অহংকার কাজ করছে।

হযরত নানুতবী (রহ.) ক্ষৌরকর্ম সম্পাদন করছিলেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া এলাহী বখশ সাহেব বসতেও পারছিলেন না। হাতের ভারী ব্যাগ দুটির জন্য তার হাত কাঁপছিল। হযরত নানুতবী (রহ.) তাকে দেখেছেন ঠিকই কিন্তু তিনি তার চিকিৎসা করতে চাচ্ছিলেন বলে না দেখার মত করে নিচের দিকে তাকিয়ে ক্ষৌরকার্য করে যাচ্ছিলেন। হযরত যখন ডান দিকে মুখ ফেরালেন এলাহী বখশ সাহেব তাঁর দৃষ্টিতে পড়ার জন্য বাম দিক থেকে ডান দিকে দৌড়ে এলেন। হযরত একমনে তাঁর কাজ করতে থাকলেন। তিনি আবার বাম দিকে মুখ করলে এলাহী বখশ সাহেব সেদিকে ছুটে এলেন। ইচ্ছা করেই হযরত নানুতবী (রহ.) তাকে এভাবে ঘোরালেন। ক্ষৌরকার্য শেষ করে তিনি তার দিকে তাকালেন। সাধারণ কথাবার্তা বললেন। ভালমন্দ জানতে চাইলেন। এরপর এলাহী বখশ সাহেব বসলেন এবং হাদিয়া পেশ করলেন।

নানুতবী (রহ.) বললেন, এগুলোর আমার প্রয়োজন নেই।

এলাহী বখশ সাহেব বললেন, আপনার প্রয়োজন না থাকলেও আমার দেয়া প্রয়োজন। আপনার যদি প্রয়োজন না থাকে কিংবা গ্রহণ করতে না চান তাহলে ছাত্রদের বণ্টন করে দেন।

হযরত বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! আমার মাসিক সাড়ে সাত টাকা উপার্জন দিয়ে আমার ঘরের সব প্রয়োজন মিটে যায়। যদি কখনো পঞ্চাশ পয়সা বেঁচে যায় তখন আমি পেরেশানীতে থাকি কোথায় রাখব, কিভাবে হেফাযত করব, কাকে দেব। আমার প্রয়োজন নেই, আপনি নিয়ে যান।

তিনি বললেন, হযরত! ছাত্রদেরকে বণ্টন করে দেন।

হযরত বললেন, আমার এত অবসর কোথায় যে ছাত্রদেরকে বণ্টন করে

দেব? আপনি নিজেই গিয়ে বণ্টন করে দেন। মোটকথা, তিনি নানাভাবে কবুল করাতে চাইলেন কিন্তু হযরত কবুল করলেন না।

এলাহী বখশ মারাঠী সাহেব সেখান থেকে উঠে গেলেন। মসজিদের সিঁড়িতে হযরতের জুতা ছিল। তিনি সে জুতার উপরে টাকাগুলো রেখে চলে গেলেন।

হযরত নানুতবী (রহ.) যখন উঠে জুতা খুঁজতে গেলেন তখন তা খুঁজে পেলেন না। হাফেজ আনোয়ারুল হক সাহেব হযরতের খাদেম ছিলেন। তিনি জুতা খুঁজে পেয়ে বললেন, হযরত! জুতা তো এখানে টাকায় ডুবে রয়েছে।

হযরত বললেন, লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! এরপর তিনি এসে জুতা থেকে যেভাবে মাটি ঝাড়ে সেভাবে টাকা ঝাড়লেন। এরপর তা পরে রওয়ানা হয়ে গেলেন। টাকাগুলো মসজিদের সিঁড়িতে পড়ে রইল। হাফেজ আনোয়ারুল হক সাহেব সাথে সাথে ছিলেন। কিছু দূর গিয়ে তিনি টাকাগুলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে মুচকি হাসলেন। নানুতবী (রহ.) হাফেজ সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দেখলেন, আমরাও দুনিয়া কামাই করি, আর দুনিয়াদাররাও করে। পার্থক্য এতটুকু, দুনিয়া আমাদের জুতার মধ্যে এসে লুটিয়ে পড়ে, আমরা তাকে পদাঘাত করি। আর দুনিয়াদার দুনিয়ার জুতায় গিয়ে লুটিয়ে পড়ে। আর সে তাকে পদাঘাত করে। আমরা ও দুনিয়াদাররা উভয়ে পার্থিব সম্পদ উপার্জন করি। পার্থক্য কেবল ইজ্জত ও বেইজ্জতির মধ্যে, অমুখাপেক্ষিতা ও মুখাপেক্ষিতার মধ্যে।

দুনিয়াবিমুখতা ও তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে দুনিয়া অর্জিত হয়

কেউ যদি দুনিয়া পেতে চায় তাহলে তার দুনিয়ার অন্বেষণকারী না হয়ে দুনিয়া বর্জনকারী হওয়া উচিত। তা হলেই দুনিয়া ধরা দেবে। দুনিয়াকে যারা চায়, বড় মুশকিলে দুনিয়া তাদের ধরা দেয়। তাদেরকে আরো অপদস্থ করতে চায়। মানুষ দুনিয়াবিমুখ হলে তার কাছে দুনিয়া অপদস্থ হয়ে আসে। ইলমের মত দৌলত লাভ হওয়ার পরেও যদি মানুষ দুনিয়ার প্রতি ঝুকে পড়ে, ভাবে– আগামীকাল কী উপার্জন করব? কোথেকে

আসবে? কী অবস্থা হবে? তাহলে সে তার ইলমকে চরম অপদস্থ করবে। আল্লাহ তাআলা মানুষের দুটি কাজের একটি নিজের জিম্মায় নিয়েছেন আরেকটির জিম্মাদার আপনাকে করেছেন। ইরশাদ করেছেন–

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، لَانَسْئَلُكَ رِزْقًا ط نَحْنُ نَرْزُقُكَ ط وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى

আপনি আপনার পরিবারের লোকজনকে নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোন রিযিক চাই না। আমিই আপনাকে রিযিক দেই এবং আল্লাহভীরুতার পরিণাম শুভ হয়। [ত্বহা : ১৩২]

আল্লাহর হাতে নিজেকে সমর্পণ করলে আল্লাহ আপনাকে কারো মুখাপেক্ষি রাখবেন না। ইজ্জত সম্মানও দান করবেন। 'রিযক'-এর মধ্যে সবকিছু এসে যায়। আল্লাহ একটিকে নিজের জিম্মায় নিয়েছেন আরেকটি আপনার জিম্মায় ছেড়ে দিয়েছেন। আপনি আপনার জিম্মাদারীর জিনিস ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর জিম্মায় যা ছিল তা নিজের জিম্মায় নিয়ে নিয়েছেন। আপনার রুটিরুজির চিন্তা, ইজ্জত সম্মানের চিন্তা আপনাকে বিভোর রাখছে। অথচ এটা ছিল আল্লাহর দায়িত্ব। আল্লাহর দায়িত্ব আপনি আঞ্জাম দিতে পারবেন না। ফলাফল এই দাঁড়ালো– এটাও হল না, ওটাও হল না। এমনিভাবে ইলম অন্বেষণের সাথে সাথে মানুষ যদি দুনিয়াও অন্বেষণ করতে চায়, তাহলে না ইলম পাওয়া যায়, না দুনিয়া পাওয়া যায়। আর যদি শুধু ইলমের অনুসন্ধানী হন তাহলে দুনিয়া পায়ে লুটিয়ে পড়বে। আপনার সামনে আপনার হাজারো বুযুর্গের দৃষ্টান্ত রয়েছে। দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসা কিভাবে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল? হাতে একটি টাকা ছিল না। আল্লাহর ওলীদের মনে জযবা তৈরি হল যে, দারুল উলুম প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মসজিদে বসে বসেই মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। আনার গাছের তলায় এক শিক্ষক ও এক ছাত্র বসেছিলেন। তাদের মাধ্যমে শুরু হয়ে আজ তা বাড়তে বাড়তে দেড় হাজার ছাত্র ও পঞ্চাশ ষাটজন শিক্ষকের মাদরাসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাদরাসা তৈরির সময়ে নীতিলামা প্রণীত হয়েছিল। তাতে শর্ত ছিল, মাদরাসার নিজস্ব কোন আয়ের উৎস থাকতে পারবে না এবং

সরকার থেকেও কখনো কোন সাহায্য সহযোগিতা নেয়া হবে না। যখন বার্ষিক খরচ সাড়ে ছয় সাত লক্ষ টাকা ছিল তখন একবার সরকারী একাউন্টেন্ড দারুল উলুমে এল। সে জানতে চাইল দারুল উলুমের মাসিক খরচ কত?

আমি বললাম, পঞ্চাশ হাজার টাকা।

জানতে চাইল, এখন কত টাকা জমা আছে?

সে সময় পনের হাজার টাকা জমা ছিল। আমি তাই বললাম।

সে বলল, এ মাসের খরচ কিভাবে চলবে?

বললাম, আমি জানি না কিভাবে চলবে, তবে এ কথা অবশ্যই বলতে পারি যে, চলবে।

সে বলল, এটা কেমন কথা? এটা তো নিয়মের কথা নয়।

আমি বললাম, এটা নিয়মের ঊর্ধ্বের কথা, নিয়মের কথা নয়।

সে আমার কথা বুঝতে পারল না।

আমি বললাম, একে আমরা তাওয়াক্কুল বলি।

সে বলল, তাওয়াক্কুল কী? কোন ব্যবসা, না কি কোন কৃষি?

আমি বললাম, তাওয়াক্কুল হল, আল্লাহ তাআলা কারো কারো অন্তরকে বাধ্য করে দেন যে, তুমি অমুক জায়গায় দান কর। সেখানে আমার কাজ হচ্ছে। তোমাকে দিতেই হবে। সে দেয়ার জন্য অস্থির হয়ে যাবে এবং এসে দিয়ে যাবে। আমাদের কী দরকার যে, আমরা তোষামোদ করতে যাব?

সুতরাং মাল ইজ্জতের সাথেও উপার্জন করা যায় এবং বেইজ্জতের সাথেও। একজন ফকির যখন আপনার কাছে ভিক্ষা চাইতে আসবে তখন আপনি তাকে হীন জানবেন যে, আমার থেকে মাল নেয়। একজন বাদশাহও জাতির থেকে মাল নেয় কিন্তু তাকে কেউ হীন মনে করে না। সেও তো চাঁদাই নেয়; তথাপি তাকে তুচ্ছ মনে করা হয় না। কারণ সে নেয় অমুখাপেক্ষিতার সাথে। স্বয়ং আম্বিয়া (আ.)গণ তাবলীগের কাজ ও ভাল কাজে উৎসাহের মাধ্যমে চাঁদা নিতেন ও খরচ করতেন কিন্তু তাতে তাদের

ইজ্জত ও সম্মানে সামান্য পরিমাণ কমতি হত না। অথচ বাহ্যত তাঁরা কওমের কাছে চাইতেন। চাওয়ায় চাওয়ায়ও পার্থক্য আছে। একজন অভাবীও বেইজ্জত হয়ে চায় আরেকজন অভাবমুক্তও নিজেকে উন্নত করে চায়। এ দুয়ের মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য হয়ে যায়।

রিযিকের জিম্মাদারী বান্দার নয় আল্লাহর

আল্লাহ তাআলা ইলমের ইজ্জত ও শারাফাত কায়েম রাখার জন্য চেহারাকে উলামাদের নিবাস নির্ধারণ করেছেন। যা দেহের সবচেয়ে উপরে রয়েছে। যাতে করে আহলে ইলমের সম্মান স্পষ্ট হয়। যারা ইলমের সাথে সম্পৃক্ত তারা সর্বোত্তম। মাথা নত করা তাদের কাজ নয়। তারা ইলমের অন্বেষণ করবে, ইলমের সাথে লেগে থাকবে আর আল্লাহর জিম্মাদারী হবে তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করা।

আমি দারুল উলুম দেওবন্দের উদাহরণ দিয়েছিলাম। আপনাদের এই মাদরাসাও তো তারই নজির (মাদরাসায়ে আরাবিয়া ইসলামিয়া, নিউ টাউন, করাচি)। মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্নুরী এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি কোন জায়গিরদারও নন, তার কাছে কোন জমিদারীও ছিল না। খালি হাতেই এখানে এসে বসলেন। থাকার কোন ঘর ছিল না। কিতাব রাখার কোন কামরা ছিল না। শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে পড়লেন। দুনিয়ার উপর ভরসা করলেন না।

اتت الدنيا وهى راغمة

ধূলি-ধূসরিত হয়ে দুনিয়া আসতে শুরু করল।

আজ লক্ষ লক্ষ টাকার ইমারত দাঁড়িয়ে আছে। কুতুবখানাও তৈরি হয়েছে। কোথাও গিয়ে তিনি কি ভিক্ষা চেয়েছেন? না, আল্লাহর কাছে ভিক্ষা চেয়েছেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের এদিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তারা বাধ্য হয়ে দিচ্ছেন এবং দিতে হবে।

মাওলানা গাঙ্গুহী (রহ.)-এর ব্যাপারে তদানীন্তন বৃটিশ সরকারের নিকট অভিযোগ করা হল যে, এই খানকা একটি সন্ত্রাসের কেন্দ্র এবং এই

মৌলভী এখানে বসে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে। হিন্দুস্থানে বৃটিশ সরকারের গদি উল্টে দিয়ে আফগানিস্তানের হুকুমতকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। অভিযোগ তদন্তের জন্য গোয়েন্দা বিভাগের একজন ইন্সপেক্টরকে প্রেরণ করা হল। অফিসার নিযুক্ত করা হয়েছিল হিন্দু, যাতে শত্রুতামূলক রিপোর্ট করতে পারে।

গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর এসে দেখল, খানকার প্রতিটি ইট থেকে আল্লাহ আল্লাহ ধ্বনি বের হচ্ছে। এদের চক্রান্তের কী দরকার? ধোঁকা প্রতারণার কী দরকার? এরা তো রাত দিন আল্লাহর বান্দা হওয়ার প্রচেষ্টায় বিভোর। সে আশ্চর্য হচ্ছিল– সংবাদদাতা এ রিপোর্ট কিভাবে করল যে, এরা চক্রান্ত কারী? কেননা এখানে চব্বিশ ঘণ্টা আল্লাহর যিকির ছাড়া অন্য কোন কাজ নেই। সে দেখছিল আর ভাবছিল। এক পর্যায়ে সে নিজেকে প্রকাশ করল। হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)-এর কাছে গিয়ে নিজের আগমনের উদ্দেশ্য জানাল। তিনি বললেন, ভাই! দেখে নাও, আমাদের এখানে গোপন কিছু নেই। কোন চক্রান্ত নেই, যা আছে তা তোমাদের সামনেই রয়েছে। এরপর অফিসার বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করল। তার মধ্যে শুধু একটি প্রশ্ন ছিল, আপনাদের জীবন যাপনের অর্থ সংস্থানের মাধ্যম কী?

তিনি বললেন, তাওয়াক্কুল।

অফিসার বলল, তাওয়াক্কুল কী জিনিস?

তিনি বললেন, তাওয়াক্কুল হল আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মনে প্রেরণা সৃষ্টি করে, তারা খেদমত করে। এভাবেই খানকার কাজ চলছে।

অফিসার ভেবে ভেবে হয়রান হয়ে যাচ্ছে, কোন কূল-কিনারা পাচ্ছে না। কোন জায়গির নেই। কোন ওয়াকফ নেই, কোন ব্যবসা নেই– এটা চলছে কেমনে? শুধু এই চিন্তা করে বসে আছে যে, লোকজনের মনে আসবে, তারপর দেবে। তারপর কাজ চলবে। লোকজনের মনে না আসলে তখন কী হবে? মোট কথা, তার বুঝে আসেনি যে, তাওয়াক্কুল কী জিনিস। এক সপ্তাহ পর সে যখন যাচ্ছিল তখন হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)-এর কাছে এল এবং অত্যন্ত বিনয়াবনত ও আশা নিয়ে তাঁর কাছে দুআ চাইল এবং দশ টাকা হাদিয়া স্বরূপ দিল।

হযরত বললেন, আপনি কেন কষ্ট করছেন?

সে বলল, আমার অন্তর আমাকে বাধ্য করছে, দয়া করে ফেরত দিবেন না। আপনি ফেরত দিলে আমার মন কষ্ট পাবে।

হযরত বললেন, শেষ পর্যন্ত আপনাকে কে উদ্বুদ্ধ করল?

সে বলল, কেউ না। শুধু মন বলছে।

হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) বললেন, এই হল সেই তাওয়াক্কুল যা কাল পর্যন্ত আপনার বুঝে আসছিল না।

সুতরাং তাওয়াক্কুল সবচেয়ে বড় জায়গির। তবে তার মূল হল মুখাপেক্ষিতা কেবল আল্লাহর প্রতি থাকবে, গায়রুল্লাহর প্রতি নয়। তবেই গায়রুল্লাহ নিজে নিজে এসে ঝুঁকে পড়বে।

ইলমের অমর্যাদা করার দ্বারা ইসলামের সৌভাগ্য ছিনিয়ে নেয়া হতে পারে

একজন তালিবে ইলমের মাথায় এ চিন্তা আসা যে, লেখাপড়া শেষ করে কী করব? খাদ্য কীভাবে জুটবে? টাকা কি করে উপার্জন করব? তাহলে তা হবে সর্বোচ্চ মুখাপেক্ষিতা ও চরম বেইজ্জতির কথা। যাদের আল্লাহ ইলম দিয়েছেন তারা যদি রুটিরুজির চিন্তা করে তাহলে তারা কুরআনের আয়াত–

أَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ أَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ

তোমরা কি উত্তম বস্তুর পরিবর্তে নিকৃষ্ট বস্তু নিতে চাও?

-এর পর্যায়ভুক্ত হবে। আমি তো বলি, আল্লাহ দুনিয়া প্রাপ্তির ওয়াদা করেছেন। যদি তিনি ওয়াদা নাও করতেন এবং দুনিয়া যদি কখনো নাও মিলত, শুধু ইলম মিলত তাহলে দুনিয়া ও তাতে যা কিছু রয়েছে তা প্রাপ্তি হত। অন্য কোন দৌলতের প্রয়োজন পড়ত না। আল্লাহ সর্বোচ্চ সম্মানিত জিনিস দেয়ার পরেও যে নিকৃষ্টতম জিনিস কামনা করে তার চেয়ে অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি আর কে হতে পারে? এ তো ইহুদীদের মত হয়ে গেল। আল্লাহ তাদের মান্না-সালওয়া দেয়ার পরেও তারা পেঁয়াজ-রসুন চেয়েছে। উত্তমের বদলে নিকৃষ্টতা চেয়েছে।

একজন আনুগত্যশীল বান্দা কিংবা তালিবে ইলমের উচিত, আল্লাহ তাকে যে সম্মান ও কামালিয়াত দিয়েছেন তার মর্যাদা রক্ষা করা। সুমহান ইলমের পরিবর্তে তুচ্ছ ও ঘৃণ্য বিষয়ের অন্বেষী হলে তা হবে ইলমের চরম অবমাননা। এতে ইসলামের সৌভাগ্য ছিনিয়ে নেওয়ারও ভয় থাকে। কারণ ইলম পবিত্র জিনিস। তাকে পবিত্র পাত্রেই রাখতে হবে। ইলমের সম্মান অর্জিত হওয়ার পর কোন গাইরে ইলমকে অন্বেষণ করা এমন যে, একজন আলেম চাচ্ছে, আমি জাহেল হয়ে যাব, এই ভাল। এটা কি বুদ্ধিমানের কথা হতে পারে? ভালবাসা হবে শুধু এক পবিত্র সত্তার সাথে। দুনিয়া ব্যবহার করার জিনিস, ভালবাসার জিনিস নয়। যত ইচ্ছা দুনিয়াকে ব্যবহার কর, কিন্তু ভালবাসা থাকবে শুধু এক আল্লাহর সাথে।

আমলের অঙ্গ দৌলতের অঙ্গ অপেক্ষা উত্তম

জ্ঞানের অঙ্গ চোখ, কান, নাক প্রভৃতিকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে শরীরের উপরিভাগে রাখা হয়েছে। এরপর আমলের অঙ্গ হাতকে রাখা হয়েছে। দৌলত ও সম্পদের অঙ্গ পেট ও কলিজা যাকে আমলের অঙ্গেরও নিচে স্থান দেওয়া হয়েছে। যাতে নাপাকী পরিপূর্ণ রয়েছে। সুতরাং মাল দৌলতকে আমলের চেয়ে নিকৃষ্টতম অবস্থানে রাখা হয়েছে এবং তারও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

দৌলতের অঙ্গের হাকীকত

চোখ, কান ও নাক হল উলামা পর্যায়ের। হাত পা মজুর শ্রেণীর মত আর পেটের অভ্যন্তরে যা রয়েছে তা ধনপতি সমতুল্য। ধনপতিকে অন্য কোন কারণে আল্লাহ সম্মান দিলে সেটা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু ধনপতি হিসেবে সে নাপাকির ক্ষেত্র। বড় কোন জিনিস নয়। আর এ নাপাকী হতে পবিত্র হওয়ার পথও আল্লাহ দেখিয়ে দিয়েছেন। যাকাত-সদকার মাধ্যমে পাক করতে হয়। পেটের মধ্যে সবকিছু ভরা রয়েছে কিন্তু নাপাকী বের হয়ে যায়। যদি তা বের না হয় তাহলে পেট খারাপ হয়ে যাবে। ধনপতির কাছে সকল সম্পদ যদি জমা থাকে, যতটুকু বের করা প্রয়োজন ততটুকু যদি বের না হয় তাহলে পেটও যাবে এবং মানুষও যাবে। পুরো কারখানা শেষ

হয়ে যাবে। এজন্যই মনে রাখতে হবে, নির্দিষ্ট সময় পর পর পেট থেকে নাপাকী বের করতে হবে। যদি তা না হয় তাহলে ধনপতি মজুরের মধ্যে সংঘাত বেঁধে যাবে। সকলেই এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং যাকাত পরিশোধ করে সবকিছুর স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হবে।

ইলম আল্লাহর গুণ এবং মাল উদরের গুণ

ইলম হল আল্লাহর গুণ এবং ধন-সম্পদ হল উদরের গুণ। আহলে ইলমে আল্লাহ তাঁর গুণে গুণান্বিত করে মর্যাদা দিয়েছেন ও সম্মানিত করেছেন। ইলম আল্লাহর গুণ হওয়ার কারণে তা স্থায়ী ও অবিনশ্বর। পক্ষান্তরে মাল খুবই ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। ইলম প্রাপ্ত হয়ে মালের প্রতি ঝুঁকে পড়া জ্ঞানীর কাজ হতে পারে না।

একটি হল ইলম যা মানুষকে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে পরিচালিত করে। আরেকটি হল সম্পদ যা শয়তানের দিকে পরিচালিত করে। ইলম ও হিকমত মানুষকে তাকওয়ার পথে পরিচালিত করে। কারণ ইলম আসলে তার মধ্যে আল্লাহভীরুতা চলে আসে। ইলম আছে অথচ আল্লাহর ভয় নেই তা হতে পারে না। অর্থাৎ ইলম ও তাকওয়া অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। তদ্রূপ ধন-সম্পদ ও শয়তান পরস্পরের বন্ধু। সম্পদ আসলে তার সাথে সাথে অহংকারও চলে আসে। অবাধ্যতাও চলে আসে। তবে সম্পদ যদি হালাল পথে উপস্থিত হয় এবং যাকাত সদকা প্রভৃতি পরিশোধ করা হয় এবং সঠিক পথে ব্যয় হয় তাহলে তা অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন থেকে বেঁচে যায়।

আলেমগণ সংশোধন হওয়া ব্যতীত সাধারণ মানুষের সংশোধন সম্ভব নয়

এই শরীর জগতের সর্বোচ্চ মর্যাদা কলবের এবং পার্থিব জগতের সর্বোচ্চ মর্যাদা আলেমগণের। পৃথিবীর কলব যেন তারা। কলব যদি নষ্ট হয়ে যায়, পুরো জগতই নষ্ট হয়ে যাবে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কলব যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে পুরো শরীর নষ্ট হয়ে যাবে।' সুতরাং আলেমগণের কাজ হল সর্বপ্রকার ফাসাদ হতে দূরে

থাকার চেষ্টা করা এবং মানুষের সংশোধনের চেষ্টায় রত থাকা। হেদায়াত, কল্যাণ ও বুযুর্গীর পথে পৃথিবীকে পরিচালিত করা তাদের ব্রত হওয়া আবশ্যক। তারাও যদি সাধারণ মানুষের মত দুনিয়ার মোহ ও চাকচিক্যে বিভোর হয় তাহলে জাতি অধপতিত হবে। তারা যে জাতির 'কলব' সে মর্যাদা তাদের রক্ষা করতেই হবে। তাদেরকে দুনিয়ায় ইমাম বানানো হয়েছে। সকল মুক্তাদী যদি অযু করে আসে আর ইমামের অযু না থাকে কিংবা ছুটে যায় তাহলে নামায হবে না। সকলের নামায তখনই শুদ্ধ হবে যখন ইমামের পবিত্রতা অর্জিত হবে।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) একটি ছেলেকে দৌড়ে যেতে দেখে বললেন, আস্তে চল, হোচট খাবে।

ছেলেটি বলল, আপনি আস্তে ও দেখে শুনে চলুন। আপনি যদি হোচট খান তাহলে পুরো জাতি হোচট খাবে।

সুতরাং সাধারণ মানুষদের নিয়ে আশঙ্কা নেই, আশঙ্কা হল বিশেষ ব্যক্তিদের নিয়ে। যাদের শুদ্ধির দ্বারা জাতির শুদ্ধি ও যাদের অধঃপতন দ্বারা জাতির অধঃপতন। সাধারণ মানুষ অনুসরণকারী মাত্র। তাদের সামনে আল্লাহর নাম নিলে তারা মাথা ঝুকিয়ে দেবে। যারা তাদের সামনে আল্লাহর নাম নেবে তারাই যদি খেয়ানত করে, আল্লাহ ও রাসূলের নামে নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে তাহলে সাধারণ মানুষের কী দোষ? তাদের কোন দোষ নেই। তাদের ধ্বংসের দায়ভার সে আলেমের উপরই বর্তাবে।

সাধারণ মানুষের সংশোধন আলেমগণের সংশোধনের উপর নির্ভরশীল। এ মর্যাদা আপনাকে আল্লাহ তাআলা দেওয়ার পর যদি আপনি ফাসাদের দিকে ধাবিত হন, তাহলে তা অত্যন্ত জঘন্য কাজ হয়ে দাঁড়ায়। টাকা কিভাবে আসবে, শান্তি কিভাবে মিলবে– এ চিন্তা তো আপনার নয়। এগুলো এমনিতেই আসবে। এটা আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহর ওয়াদার উপর কিছুটা তো ভরসা রাখুন। আলেম হওয়ার পরও যদি আল্লাহর উপর ভরসা করতে না পারেন তাহলে সাধারণ মানুষের দ্বারা কি করে আশা রাখা যাবে যে, তারা মহান সত্তার ওয়াদার উপর নির্ভর করবেন।

তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে সবকিছু পাওয়া যায়

আপনার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হল তাওয়াক্কুল ও অমুখাপেক্ষিতা। এতেই সবকিছু পাওয়া যায়। দীন তো পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যাবেই। দুনিয়াতেও অঢেল প্রাচুর্য না হোক, অল্প হলেও পাওয়া যাবেই। হয়তো আপনি লাখপতি কোটিপতি হবেন না। কিন্তু হাজারো কোটিপতি আপনার পায়ে মাথানত করবে। কোটিপতি হওয়াতে কোন সাফল্য নিহিত নেই। কোটিপতি আল্লাহতে সমর্পিত হওয়ার মধ্যেই সাফল্য নিহিত। আপনার কাছে হয়তো কোন ব্যক্তিগত গাড়ি নেই। কিন্তু আপনি যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই যদি গাড়ি উপস্থিত হয়ে যায় তাহলে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার ঝক্কি বহন করার কী প্রয়োজন? যখন যেটার প্রয়োজন তার ব্যবস্থা যদি স্বয়ং আল্লাহ করে দেন তাহলে তার পেছনে হন্যে হয়ে ঘোরার কী প্রয়োজন? আপনি ইলমে দীনের অধিকারী হওয়ার পরও যদি আল্লাহর উপর ভরসাশীল হতে না পারেন তবে তা কে পারবে? আপনি যে অবস্থানে পৌঁছেছেন এ অবস্থানের চাহিদাই হল আপনি পরিপূর্ণ আল্লাহর উপর ভরসা করবেন এবং নিজেকে আল্লাহর হাতে সঁপে দিবেন। আল্লাহর কাছে আপনার বক্তব্য হবে– আপনি যখন আমাকে আপনার কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন, তখন আমি আমার নফসকে আপনার হাতে সমর্পণ করলাম।

وَأُفَوِّضُ أَمْرِيْ إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ

আমি আমার সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহর কাছে সমর্পণ করলাম। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দার সবকিছুই দেখেন।

বান্দা যখন এভাবে আল্লাহর হাতে নিজেকে সমর্পণ করবে, তখন আল্লাহ তাকে ফিরিয়ে দেবেন না। দুনিয়াতেও যদি আপনি নিজেকে কারো হাতে এভাবে সমর্পণ করেন যে, আমি নিজেকে আপনার হাওয়ালা করে দিলাম, আমি আপনার উপর ভরসা করলাম, আপনার যা ইচ্ছা হয় তাই করবেন। তাহলে সে ব্যক্তি আপনার ব্যাপারে খেয়ানত করবে না। একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ– 'পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়া সাপকেও মানুষ মারে না, তার প্রতি দয়া করে।' সুতরাং আল্লাহর কাছে আপনি সমর্পিত হওয়ার পর তিনি আপনাকে ধ্বংস করবেন তা সম্ভব নয়।

প্রথম ওহী অবতরণের সময় হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যাওয়ার পর তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে হযরত খাদিজা (রা.) যে কথা বলেছিলেন তাতেও এ বিষয়টি ফুটে ওঠে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ভীত-কম্পিত হয়ে তাকে বলেছিলেন– 'আমাকে বস্ত্রাবৃত কর, আমি আমার জীবনের আশঙ্কা করছি।' তখন খাদিজা (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিভিন্ন সদগুণের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন– আল্লাহ আপনাকে কখনো ধ্বংস করতে পারেন না। তখন ইসলামের কিছুই সামনে ছিল না। তথাপি খাদিজা (রা.) বিশুদ্ধ স্বভাবের কারণে বলতে পেরেছিলেন, আপনার মত মানুষকে আল্লাহ ধ্বংস করতে পারেন না। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করার পর আপনাকে আল্লাহ কিভাবে ধ্বংস করবেন? এটা অসম্ভব ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, আল্লাহর প্রতি যদি আপনার কোন ভরসা না থাকে তাহলে সেটা ভিন্ন বিষয়। সুতরাং এটা সম্পূর্ণ ভরসা ও নির্ভরতার বিষয়। যখন আপনি দীনের পথে এসেছেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। আত্মার অমুখাপেক্ষিতা অর্জন করুন। আত্মার বেইজ্জতি আপনার বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। যার কাছে ইজ্জতের বস্তু নেই, তার হতে পারে। যার কাছে ইলমের মত ইজ্জতের বস্তু রয়েছে সে কখনো হীন ও লাঞ্ছিত হতে পারে না।

ইলম ও আবদিয়াতের বৈশিষ্ট্য

ইলম হল ঊর্ধ্বগামী বৈশিষ্ট্যময়। নীচতা ইলমের গুণ নয়। ব্যক্তির মধ্যে ইলমের বাষ্প প্রবিষ্ট হওয়ার পর তার মধ্যে নীচতা আসা অসম্ভব। সূক্ষ্ম জিনিসকে ঘন বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করালে সে নিম্নগামী হয় না। আপনি ফুটবলের মধ্যে বাতাস প্রবেশ করিয়ে যদি মাটিতে আঘাত করেন তাহলে সে অনেক ঊর্ধ্বে উঠে যাবে। যদি ফুটবলকে ছিদ্র করে বাতাস বের করে ফেলেন এবং মাটিতে আঘাত করেন তাহলে সে নিস্তেজ হয়ে মাটিতেই পড়ে রইবে। ওঠার শক্তি তাতে থাকবে না। এতে বুঝা গেল সূক্ষ্ম বস্তুর ভেতরে শক্তি নিহিত রয়েছে। মানুষের শক্তি ইলমের মধ্যে নিহিত। মানুষ যখন নিম্নগামী হবে কিংবা নিচুতা এসে তার মধ্যে ভর করবে তখন বুঝতে হবে হয়তো তার মধ্যে ইলম নেই, না হয় সে ইলমকে বুঝেনি। অর্থাৎ

ইলমের কদর ও মূল্য সে জানে না, ইলমের ব্যবহার সে জানে না। এ দুইয়ের কোনটি ছাড়া ইলমের অধিকারী ব্যক্তির মধ্যে নিচতা অনুপ্রবেশ করতে পারে না।

উচ্চতা ঊর্ধ্বমুখিতা ও অহংকার ইলমের বৈশিষ্ট্য বিধায় মানুষের জন্য আবদিয়াতকে আবশ্যক করা হয়েছে। কারণ শুধু ইলম থাকলে সে ইলম তাকে অহংকারী করে তুলবে। ইলম নিচতাকে সহ্য করতে পারে না। একজন আলেমের গর্ব, অহংকার ও অহমিকা যাতে আসতে না পারে সেজন্য আবদিয়াতের (আল্লাহর গোলামীর) ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কোন কামেল ব্যক্তির সামনে নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে দেয়া ব্যতীত আবদিয়াতের সৃষ্টি হতে পারে না। সুতরাং ইলমের অহংকারকে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্য আবদিয়াতের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এতে করে ইলমের অহংকারী রূপ মাহাত্ম্য ও গাম্ভীয়ে রূপান্তর হবে। ইলম ও আবদিয়াতের সমন্বয়ে আল্লাহর জন্য বিনম্রতার সৃষ্টি হবে। কারণ আবদিয়াত মূলত নিচতা ও হীনতা। কারণ আবদিয়াতের সাথে যখন ইলমের সমন্বয় ঘটে তখন ব্যক্তির মধ্যে হীনমন্যতার পরিবর্তে আল্লাহর জন্য তাওয়াযু বা বিনয় সৃষ্টি হবে। সুতরাং ইলম ও আবদিয়াতের সমন্বয়ে ইলমের অহংকার মাহাত্ম্য ও গাম্ভীর্যে রূপ নেয় এবং আবদিয়াতের হীনতা বিনয়ে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং প্রকৃত আলেমের মধ্যে মাহাত্ম্য ও বিনয় অবশ্যই থাকবে।

আলেমের অহংকার পৃথিবীর জন্য ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলতার কারণ হয়ে থাকে। আবার আবেদের হীনমন্যতাও পৃথিবীর জন্য ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে থাকে। হেদায়ার গ্রন্থাকার এক স্থানে লিখেছেন, যে আলেমের মধ্যে অহংকার রয়েছে সে বিশ্বজগতের জন্য ফেতনা। এ ধরনের ইলমের অপেক্ষা জাহেল থাকা তার জন্য ভাল ছিল। অহংকারপূর্ণ ইলম জগতে ফেতনা ছড়াবেই। তদ্রূপ ইলমহীন আবেদ ব্যক্তি বিদআত ও অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে যাবে। যা পৃথিবীর ফেতনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং ইলমের জন্যও একটি ফেতনা রয়েছে, যার সমাধান আবদিয়াতের মধ্যে। আর আবদিয়াতের জন্যও একটি ফেতনা রয়েছে যার সমাধান ইলমের মধ্যে। এ দুইয়ের সমন্বয় ব্যতীত কাজ হবে না।

আবদিয়াতহীন ইলম ও ইলমহীন আবদিয়াতের ফলাফল

আবদিয়াতহীন ইলম ও ইলমহীন আবদিয়াতের উদাহরণ পূর্ববর্তী দুই উম্মতের মধ্যে রয়েছে। এরা হল ইহুদী ও নাসারা। ইহুদীদের তাওরাতের মধ্যে বিস্তারিত ইলম দান করা হয়েছিল। তাদের প্রদত্ত শরীয়ত অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল, বিস্তারিত বিবরণসমৃদ্ধ ছিল। সকল শরীয়তে যেমন নবীর আনুগত্যের নির্দেশ রয়েছে তাদের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু তারা তা মানতে রাজি হল না। তাদের কথা হল, আমরাও মানুষ, তিনিও মানুষ। তদুপরি কিতাব আমাদের সামনে রয়েছে; তার আনুগত্য কেন মেনে নিতে হবে?

ফলাফল এই দাঁড়ালো, আবদিয়াতের মাধ্যমে যে অহংকার মুক্তি ঘটে তা ঘটল না। অহংকারের ফলে কিতাব বুঝতে গিয়ে তারা অনুমাননির্ভর হয়ে পড়ল। খালেস যে ইলম তাদের দান করা হয়েছিল তা আর রইল না। ইহুদী জাতি ইলমী ফেতনায় লিপ্ত হয়ে পড়ল।

নাসারাগণ আমলী উম্মত ছিল। ইঞ্জিল কিতাবে তাদেরকে আমলের দিকে ধাবিত করা হয়েছে। লোভ-লালসা ত্যাগ, সাধনা ও তাসাউফের কিতাব ছিল ইঞ্জিল। তাসাউফের বৈশিষ্ট্য হল মানুষ ব্যক্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে। সুতরাং তারা হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর সাথী রহবানীগণের দিকে ঝুঁকে পড়ল। তারা এমনভাবে ঝুঁকল যে ইঞ্জিল থেকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। বলতে লাগল, কিতাব দিয়ে কী হবে? এ বুযুর্গগণই তো সবাক কিতাব। নির্বাক কিতাবে কী দরকার। এরা যা বলবেন তাই শরীয়ত, এরা যা করবেন তাই শরীয়ত। এর ফলাফল এই দাঁড়াল, তারা স্পষ্ট কিতাব ছেড়ে দিয়ে ঐ সমস্ত ব্যক্তির প্রতি পরিপূর্ণ ঝুঁকে পড়ল। এতে তাদের মধ্যে বিনয়ের বদলে ব্যক্তিস্বার্থ ও নফসের সুখ অনুসন্ধান ঢুকে পড়ল। ঐ ব্যক্তিদের কাজকেই শরীয়ত মনে করতে গিয়ে নানা প্রকার বিদআতে লিপ্ত হয়ে পড়ল। বহুবিধ অন্যায়ে জড়িয়ে পড়ল। এক পর্যায়ে তারা ব্যক্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ল। সুতরাং নাসারা সম্প্রদায় যেন এক বিদআতী সম্প্রদায়। এভাবেই এক দল ইলমী ফেতনায় লিপ্ত হয়ে অহংকারে ধ্বংস হল, আরেক দল আমলী ফেতনায় লিপ্ত হয়ে বিদআত ও অপদস্থতায় ধ্বংস হল।

উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে পূর্ববর্তী উম্মতের অনুসরণের আগ্রহ ও তার ফল

হাদীস শরীফে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা ছোট বড় সকল কাজে ইহুদী ও নাসারাদের অনুকরণ করবে। আকিদা, আমল, লেনদেন, জীবনযাপন, এমনকি তারা যদি কোন অন্যায় কাজ ও বিদআত করে তবু তোমরা তাদের অনুসরণে পিছপা হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ ভবিষ্যদ্বাণী এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে। উম্মতে মুহাম্মদীর একটি বড় অংশ দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আমাদের মধ্যে এমন এক দল রয়েছে আত্মঅহংকার ও ইলমের অহংকারে নিমজ্জিত। তারা ইহুদীদের মতই বলছে, সলফের অনুসরণ করা আবশ্যক নয়। কুরআন ও হাদীস রয়েছে, আমাদের মধ্যে বুদ্ধি আছে, কেউ কেউ আবার আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে হাদীসকেও অস্বীকার করে বলছে যে, তাও তো একজন মানুষেরই কথা। সুতরাং আল্লাহর কুরআন ও আমাদের বুদ্ধি বিবেকই যথেষ্ট। অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। এ দলটি ইহুদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আত্মঅহমিকা ও নফসের ধোকায় লিপ্ত রয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে আরেকটি দল রয়েছে যারা বলছে, বুযুর্গানে দীন যথা শায়খ জুনায়েদ, শিবলী, বায়েজীদ বোস্তামী, আবদুল কাদের জিলানী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ হলেন সবাক কিতাব। নির্বাক কিতাবের প্রয়োজন নেই। এরা যা বলেছেন বা করেছেন তাই শরীয়ত। এ ধরনের লোকদের অধিকাংশ বিদআতে লিপ্ত। কারণ আল্লাহর ওলীদের বহু আমল তাদের বিশেষ অবস্থার মধ্যে প্রকাশ পেয়ে থাকে। যা শরীয়ত পরিপন্থী যদিও নয়; কিন্তু অনেক সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে শরীয়তের সাথে তার সরল সম্পর্ক স্থাপন করা কঠিন হয়ে পড়ে। তারা বাহ্যিক রূপকে দেখে আমল করে বিধায় বিদআতে রত হয়ে পড়ে। এজন্যই হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বলেন, আমাদের আলেমদের মধ্যে যারা ফাসাদে লিপ্ত হয়ে পড়েন তাদের মধ্যে ইহুদীদের মিল রয়েছে আর আবেদগণের মধ্যে যারা ফাসাদে লিপ্ত হয়ে পড়েন তাদের মধ্যে নাসারাদের মিল রয়েছে।

হকপন্থীদের পরিচয়

হকপন্থী কারা? এরা হলেন তারা, যারা অহংকার কিংবা হীনতার কোনটাতেই লিপ্ত হয় না। বরং তারা নফসের দৃঢ়তা বিনয় দ্বারা সজ্জিত থাকেন। তারা মধ্যমপন্থী, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত। যাদের এক হাতে আল্লাহর কিতাব আরেক হাতে আল্লাহওয়ালাদের জীবন। না তারা আল্লাহ ওয়ালাদের ছেড়ে শুধু কিতাবুল্লাহ নিয়ে বিভোর থাকেন, না তারা কিতাবুল্লাহকে ছেড়ে আল্লাহওয়ালাদের নিয়ে বিভোর থাকেন। তারা কিতাবুল্লাহ হতে ইলম অর্জন করেন এবং আল্লাহওয়ালাদের থেকে আমল ও আমলের নমুনা সংগ্রহ করেন। তারা ঠিক সিরাতুল মুস্তাকিমে রয়েছেন। না আছে তাদের মধ্যে বাড়াবাড়ি, না আছে সংকীর্ণতা।

এ কথাগুলো আলোচনা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হল, বিশুদ্ধ কলব হল সেই কলব যার মধ্যে বাড়াবাড়িও নেই, সংকীর্ণতাও নেই। আপনি যেহেতু আলেম ও জাতির কলব, সেহেতু আপনার মধ্যেও এ বিষয়টি থাকতে হবে। অহংকার ও অপদস্থতার কোনটিই আপনার মধ্যে থাকতে পারবে না। আপনাকে আল্লাহ যখন ইলমও দিয়েছেন এবং বিনয় ও সৎস্বভাবের ব্যক্তিত্বও দিয়েছেন, সুতরাং এর কদর করা আপনার আবশ্যক। এ মহান দৌলত প্রাপ্তির পর অন্যের সম্পদকে লালসার দৃষ্টিতে দেখে আপনি যদি বলেন, আমাদের এটা নেই, ওটা নেই; তাহলে তা হবে ইলমের চরম অবমাননা। নিজের অবস্থান আপনার বোঝা উচিত। বোঝা উচিত আপনার অবস্থান দুনিয়াতে হাত পায়ের মত নয় কিংবা কান, নাক ও চোখের মতও নয়; বরং আপনি জগতের কলব সমতুল্য।

অল্প ইলমও আনুগত্যের দ্বারা দ্বিগুণ গ্রহণযোগ্যতা পায়

সার্বিক প্রচেষ্টা ও মনোযোগের মাধ্যমে ইলমের প্রতি আপনাদের মনোনিবেশ করা উচিত। পরিপূর্ণ আদবের সাথে ইলম শিখবেন। কারণ, বেয়াদব ব্যক্তির ইলম নসিব হয় না। শিক্ষকের শানে বেয়াদবী করলে সর্বদাই ইলম হতে বঞ্চিত থাকবে। যদি মেহনত নাও করে এবং বিনয়ী হয় তাহলে অন্তত ইলম হতে বঞ্চিত হবে না। দারুল উলুম দেওবন্দে এমন

বহু নজির রয়েছে। আমার সাথীদের মধ্যেও এমন অনেক কেউ আছেন যারা পরীক্ষায় সব সময় ফেল করতেন কিন্তু অটল বিশ্বাসে আন্তরিকতার সাথে উস্তাদের খেদমতে লেগে থাকতেন। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভাল ভাল যোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্রগণ মানুষের সংশোধনের জন্য সে কাজ করতে পারছেন না যা পারছেন সেই কম যোগ্যতাশীলগণ। কিছু দুআ, কিছু বরকত সঙ্গী হলে অল্প ইলমও অনেক হয়ে যায়। আবদিয়াতের সংযোগে ইলম দ্বিগুণ হয়ে যায়, উপকার বেশি অর্জিত হয়।

এর কারণ হল, দুনিয়ায় কাবিলিয়াত বা যোগ্যতায় কাজ হয় না, মাকবুলিয়াত বা গ্রহণযোগ্যতায় কাজ হয়। আপনি যদি আগাগোড়া যোগ্যতার পেছনেই লেগে থাকেন, গ্রহণযোগ্যতার মাধ্যম পরিপূর্ণ ত্যাগ করেন তাহলে দুনিয়ায় ফলপ্রসূ কোন কাজ করতে পারবেন না। যোগ্যতার জন্য কিতাবের পড়াশোনাই যথেষ্ট। কিন্তু গ্রহণযোগ্যতা আসে আখলাকের সংশোধন, আমলের সংশোধন, আল্লাহমুখিতা ও আল্লাহর নৈকট্য দ্বারা। আর গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি যে কাজ করবে তাও গ্রহণযোগ্যতা পাবে। আল্লাহর বিশেষ প্রিয় ব্যক্তিদের সব কাজ গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে এবং হাজারো বরকতের মাধ্যম হয়ে যায়।

নৈকট্যশীলগণের সামান্য ত্রুটিও হাজারো বরকত বয়ে আনে

হযরত আদম (আ.)-এর ব্যাপারে আপনারা বলে থাকেন যে তাঁর সামান্য ত্রুটি হয়ে গিয়েছিল। অথচ দেখুন, সেই ভুলটুকুই হাজারো বরকতের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

کار پاکاں را قیاس از خود مگیر ☆ گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر

নিজের উপর ধারণা করে পবিত্র ব্যক্তিদের কাজকে মূল্যায়ন করতে যেও না। শের (বাঘ) ও শির (মধু) লিখতে এক রকম হলেও তাদের মধ্যে সুদূর বিভাজন রয়েছে।

আল্লাহওয়ালাদের অসাবধানতাজনিত সামান্য ভুলও আমাদের হাজারো ইবাদত অপেক্ষা বহু উত্তম হয়ে থাকে। 'লাইলাতুত্ তারিস'-এ সূর্যোদয়ের

পূর্ব পর্যন্ত হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘুম ভাঙলো না। ফজরের নামায কাযা হয়ে গেল। বাহ্যত নামায কাযা হওয়াকে ত্রুটি মনে হচ্ছে, অথচ এমনটি যদি না হত তাহলে কাযা সংক্রান্ত অসংখ্য ইলম ও আহকাম এবং কোন আদর্শ থাকত না। সুতরাং এক একটি কাজকে মাকবুল বানাবার চেষ্টা না করে স্বয়ং ব্যক্তিকেই মাকবুল বা গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

ইলমের দ্যুতি হল আদব

কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে আদবের তালিম দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ

নবীর আওয়াজের চেয়ে তোমাদের আওয়াজকে উচ্চ করো না। তোমরা পরস্পরে যেভাবে উচ্চৈঃস্বরে কথা বল তার সামনে সেভাবে বলো না। যাতে করে তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের আমলসমূহ নষ্ট হয়ে না যায়।

হাদীসে এসেছে, হযরত উমর (রা.) ছিলেন দরাজ কণ্ঠের অধিকারী। স্বভাবগতভাবেই তিনি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতেন। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি এত আস্তে কথা বলতে শুরু করেন যে, মাঝে মাঝে কথা প্রায় শোনাই যেত না। তিনি বলতেন, আমার আশঙ্কা হয়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মজলিসে জোরে কথা বলে না জানি আমলসমূহ বিনষ্ট করে ফেলি। আল্লাহওয়ালাগণ শুধু দলিল প্রমাণ দিয়েই আমল করতেন না। বাতেনী তাকওয়ার কারণে সুদূর সম্ভাবনাকেও গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় রাখতেন। যাই হোক, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মজলিসের ব্যাপারে আদব শেখানো হয়েছে যেন উচ্চ আওয়াজে কথা বলা না হয়। বেয়াদবী করা না হয়। বিনা অযুতে বসা না হয়। কুরআন পাকের

ব্যাপারে অপবিত্র অবস্থায় তাকে স্পর্শ করা নিষেধ করা হয়েছে। মোট কথা, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহর কিতাব, আল্লাহর ঘর, আল্লাহর নিদর্শনাবলী– প্রত্যেকটির জন্য স্বতন্ত্র থাকার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত যা কিছু রয়েছে সবকিছুই আদব রক্ষা করতে হবে। আমাদের ভিত্তি আদবের উপর, বেয়দবীর উপর নয়। আমাদের থেকে ভুল-ত্রুটিও হয়ে যেতে পারে। তারও সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। যখন আদব, আনুগত্য ও অনুশোচনার অভ্যাস গড়ে উঠবে তখন আমাদের ইলম জ্যোতির্ময়তা পাবে। বেয়াদবী, বেতমিজী ও বেপরোয়া ভাব থাকলে তা হবে পাত্র বোঝাই ছাইয়ের মত। না আছে তাতে কোন দ্যুতি, না আছে ঔজ্জ্বল্য।

আহলে ইলমের দায়িত্বশীলতা

আপনারা ইলম অর্জনের জন্য এ মাদরাসায় এসেছেন। আপনাদের মর্যাদা অত্যন্ত উন্নত। আপনারা আল্লাহর শুকরিয়া যতই আদায় করেন না কেন, এ উচ্চ মর্যাদার জন্য তা কমই হবে। তবে মনে রাখবেন, মর্যাদা যত বড়, যত উন্নত তার দায়িত্বশীলতাও তত অধিক। সে দায়িত্ব আদায় করাও আবশ্যক। আপনারা এ পথের পথিক না হলে ভিন্ন কথা ছিল। কিন্তু যখন এ পথে এসেছেন তখন তার হক আদায় করতে হবে। চারিত্রিক শক্তি দিয়ে এ হক আদায় করতে হবে। মর্যাদাগত অবস্থানের কথা তো বললাম। কিন্তু বাস্তবতা হল আপনারা হীনমন্যতায় ভুগছেন। কোন কোন ছাত্রকে দেখা যায়, দুনিয়ার কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সামনে গেলে নিজেকে খুব দুর্বল নিচ মনে করে। নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অবয়বকে যেন সে খুব তুচ্ছ মনে করে আর ঐ ব্যক্তির সবকিছুকে সম্মানজনক মনে করে। এভাবে সে তার নিজের দায়িত্বশীলতাকে সম্পূর্ণ খুইয়ে ফেলে। তার তো দায়িত্ব ছিল তিরস্কারকারীর তিরস্কারকেও পরোয়া না করা আর বেজায়গায় উপদেশদাতার উপদেশেরও পরোয়া না করা। নিজের অবস্থানের ইজ্জত ও মর্যাদা রক্ষা করা।

হযরত হুজাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.)-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, যখন ইরান বিজয় হল তখন তিনি বাগদাদে তাশরিফ নিয়ে গেলেন। তিনি খাবার খাচ্ছিলেন আর এক ইরানী গোলাম তাকে খাবার পরিবেশন করছিল। হাত

থেকে একটি লোকমা মাটিতে পড়ে গেলে তিনি তা তুলে মাটি ঝেড়ে পরিস্কার করে খেলেন। ঐ ইরানী গোলাম বলল, আপনি এ কী করলেন? এটা একটি সভ্য এলাকা। বিখ্যাত পারস্য ভূখণ্ড এটি। নষ্ট হয়ে যাওয়া খাবারের লোকমাটি আপনি কুড়িয়ে খেলেন!

হযরত হুজাইফা (রা.) উত্তর দিতে গিয়ে কোন দলিল দিলেন না। শুধু বললেন–

أترك سنة حبيبى لهم لا ء الحمقاء

এই আহমকদের জন্য আমি কি আমার প্রিয় হাবীবের সুন্নতকে বিসর্জন দেব?

একটি সুন্নতের প্রতি তাঁর যে মর্যাদাবোধ ছিল পুরো সভ্যতার প্রতি তা ছিল না। একটি সুন্নতের বিপরীতে পুরো ইরান ও খোরাসানের সভ্যতাকে তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হয়েছে। তিরস্কারকারী তিরস্কার করুক, কোনো পরোয়া নেই। আমাদেরকে আমাদের হাবীবের সুন্নত আঁকড়ে ধরতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতের উপর যতক্ষণ পর্যন্ত এ দৃঢ়তা ও নির্ভরতা আসবে না ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে হবে সে আলেম নিজের মর্যাদাকে বুঝতে পারেনি, নিজের অবস্থানকে মূল্যায়ন করতে পারেনি। তার কর্তব্য হল পৃথিবীর যাবতীয় কিছুর চেয়ে এক একটি সুন্নতকে অধিক সম্মান প্রদর্শন করা। তবেই নিজ অবস্থানের হক আদায় হবে।

মাশাআল্লাহ! আপনারা এসব হক ভালভাবেই বুঝেন। আসাতাজায়ে কেরাম আপনাদের সামনে রয়েছেন, কিতাব সামনে রয়েছে। আহলে ইলমদের সামনে দাঁড়িয়ে আমার কিছু বলার আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু কিছু বলা ও শানানোর জন্য বড় হওয়া আবশ্যক নয়। ছোটরাও বড়দের সামনে বলতে পারেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মত বড় কেউ তো সৃষ্টি জগতে নেই। তথাপি তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করতেন। কখনো কখনো তাদের মতামতও গ্রহণ করতেন। বর্ণনাকারী যখন কুরআন হাদীসের বর্ণনা নকল করে শোনান তখন তা গ্রহণ করা কর্তব্য হয়ে যায়। যদি সে নিজের রায় উপস্থাপন করেন তখন তা দেয়ালে ছুঁড়ে মারার অধিকার আপনার আছে কিন্তু কুরআন হাদীসের কথা যদি কোন দেয়ালও নকল করে তবু তাকে গুরুত্ব দেয়া আপনার

কর্তব্য। যদিও সে জড় পদার্থ তবু তাতে নসিহত লেখা যা আপনাকে গ্রহণ করতে হবে, যদি সে নসিহত হক হয়। আপনি যদি আমাকে একটি দেয়ালই মনে করুন। অবশ্য মনে করারও প্রয়োজন নেই, আমরা সকলেই প্রকৃত অর্থে দেয়ালই। কী আমাদের ইলম? কী আমাদের বুঝ? কী আমাদের ইরফান? কিছুই নেই। শুধু এতটুকু আছে যে, আমরা আমাদের বুযুর্গদের নাম নিই, তাঁদের কিছু কথা আমাদের স্মরণ আছে, সেগুলো নকল করি।

একবার হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) দারুল উলুম দেওবন্দের মসজিদে ওয়াজ করছিলেন। ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, আমাদের তো রুটিরুজিও শুধু এজন্য জোটে যে আমরা পয়গাম্বরগণের কিছু নাম স্মরণ রেখেছি এবং সেগুলো বলে বেড়াই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, এত অধিক ইলমের অধিকারী আপনি কিভাবে হলেন?

তিনি বললেন–

لسان سئول وقلب عقول

অধিক জিজ্ঞাসু জবান ও অধিক বুঝদার কলবের বদৌলতে আমার এ ইলম হাসিল হয়েছে।

সুতরাং ইলমের ক্ষেত্রে বক্তা ছোট হওয়া বা কম যোগ্যতাপূর্ণ হওয়া বিবেচ্য নয়। এখানে বিবেচ্য হল সে নিজের কথা বলছে, না কি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছে। যদি উদ্ধৃতি হয় তবে গ্রহণ করা আবশ্যক। যদি নিজের কথা হয় তবে তা গ্রহণ করা আবশ্যকও নয়। আল্লাহ তাআলা আপনাকে ও আমাকে তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী পরিচালিত করুন, কবুলিয়াতের রাস্তা দান করুন এবং শেষফল কল্যাণকর করুন। আমীন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



বয়ান : ৮

ওয়াজে ইউসুফী

যাঁর বংশধারা উন্নত, চরিত্র উন্নত, সৌন্দর্য উন্নত এমন পবিত্র ব্যক্তিত্বের ওয়াজ যখন উপস্থাপন করা হবে তখন তা উন্নতই হবে। এমন পবিত্র ব্যক্তিত্বের মুখনিঃসৃত কালাম, যাকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করে কুরআনে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, ইউসুফ এ ওয়াজ করেছে– তখন তা কতই না উত্তম হবে! সুতরাং পয়গাম্বরের যে কথাকে আল্লাহ পছন্দ করে বর্ণনা করেছেন তার আলোচনার চেয়ে উত্তম ওয়াজ হতে পারে না।





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ الى كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى قَضَى الْاَمْرَ الَّذِىْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ، صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ

এ মুহূর্তে আমি আমার নিজের কোন ওয়াজ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব না। একজন উচ্চ মর্যাদাশীল পয়গাম্বরের ওয়াজ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। যে ওয়াজকে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুরআনে বর্ণনা করেছেন। কুরআন থেকে ইউসুফ (আ.)-এর ওয়াজ আমি আপনাদেরকে

শোনাব। ওয়াজ যিনি করেছেন তিনি যেমন উচ্চ মর্যাদাশীল একজন নবী, ওয়াজের বর্ণনাকারীও তেমনি সুমহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত। সুতরাং ওয়াজও কামিল আর তার বর্ণনাও কামিল। আমাদের নিজস্ব চিন্তা উপস্থাপনের চেয়ে এ ধরনের ওয়াজ আমাদের জন্য বরকত ও সৌভাগ্যময়।

আমি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ওয়াজ কুরআন থেকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। যিনি অনেক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একজন নবী ছিলেন।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য

হযরত ইউসুফ (আ.) সেইসব নবীগণের অন্তর্ভুক্ত যাঁদেরকে আল্লাহ স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছেন। সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হল তাঁর উচ্চতর বংশমর্যাদা। ধারাবাহিক বংশ পরম্পরায় তিনি অনন্য মর্যাদাশীল একজন নবী। তিনি নিজে যেমন উচ্চ মর্যাদাশীল একজন পয়গাম্বর, তাঁর পিতাও তেমন বুযুর্গ এক পয়গাম্বর। অর্থাৎ হযরত ইয়াকুব (আ.)। ইয়াকুব (আ.)-এর পিতাও একজন সম্মানিত রাসূল। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.)। ধারাবাহিক চার পুরুষ পর্যন্ত তাঁরা নবী ছিলেন। এ এক স্বতন্ত্র বরকত।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– কোন বান্দা যখন সংশোধন ও নেকীর পথ গ্রহণ করেন তখন আল্লাহ তার ভেতরে নেকী ছড়িয়ে দেন। সাত পুরুষ পর্যন্ত সে নেকীর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। উম্মতের ব্যাপারেই যখন সাত পুরুষ পর্যন্ত নেকী ছড়িয়ে পড়ে তখন পয়গাম্বরদের ক্ষেত্রে কেমন হবে? তাঁদের চেয়ে অধিক নেকীকারী পৃথিবীতে আর কে আছেন?

আল্লাহর নবী আরো বলেছেন, উম্মতের মধ্যে কেউ খারাপ আমল করলে তার প্রভাবও সাত পুরুষ পর্যন্ত বলবৎ থাকে। এজন্যই মুসলমানদের উপর জিম্মাদারী বেশি। আল্লাহ না করুন, কেউ যদি বদ আমলে রত হয়ে যায়, তবে সে সাত পুরুষের বরবাদীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইউসুফ (আ.)-এর চারিত্রিক ও শারীরিক সৌন্দর্য

নবীগণের চরিত্রের ব্যাপারে কিছু বলার অবকাশ রাখে না। আল্লাহ তাঁদেরকে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী করে প্রেরণ করেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল, নবীগণ থেকে অন্যায় কাজ প্রকাশ পায় না। জন্মগতভাবেই তাঁরা নিষ্পাপ হয়ে থাকেন।

হযরত ইউসুফ (আ.)কে অপরূপ শারীরিক সৌন্দর্যের অধিকারী করা হয়েছিল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা সৌন্দর্য সৃষ্টি করে পৃথিবীতে বণ্টন করেছেন। মোট সৌন্দর্যের অর্ধেক একা হযরত ইউসুফ (আ.)কে দান করা হয় আর বাকী অর্ধেক পুরো জগতকে। তাঁর সৌন্দর্য দেখে মানুষ হুঁশ হারিয়ে ফেলত। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারত না। সে ঘটনা হয়তো আপনারা শুনে থাকবেন। বিখ্যাত ঘটনা।*

যুলাইখার শেষ প্রচেষ্টা

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি যুলাইখার আসক্তি ছিল সীমাহীন। আপ্রাণ প্রচেষ্টায় সে ইউসুফ (আ.)কে তার প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছে কিন্তু সফল হতে পারেনি। পবিত্র সত্তার অধিকারী পয়গাম্বর হওয়ার কারণেই যুলাইখাকে বার বার ব্যর্থ হতে হয়েছে। শেষ প্রচেষ্টাস্বরূপ যুলাইখা একটি আলিশান ঘর তৈরি করাল। সে ঘরকে ফার্নিচার দিয়ে সজ্জিত করল। সুসজ্জিত সাত কক্ষ বিশিষ্ট ঘরের সর্বশেষ কক্ষে গিয়ে নিজে অবস্থান নিল। সে যুগে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দামী ও আকর্ষণীয় পোশাকে নিজেকে সজ্জিত করে হযরত ইউসুফ (আ.)কে সেখানে ডেকে পাঠাল। তার উদ্দেশ্য ছিল, শত হলেও ইউসুফ (আ.) তো মানুষ। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকবেই। আমার রূপ-সৌন্দর্য ও নির্জনতার কারণে সে আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। অন্যান্য প্রচেষ্টা তো ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। এটা ছিল তার শেষ চেষ্টা। আবেগকে উত্তেজিত করে তার প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য করা। এসবের কিছুই হযরত ইউসুফ (আ.) অবগত ছিলেন না। তাঁকে ভেতরে

---

* ইউসুফ (আ.)-এর শারীরিক সৌন্দর্য, যুলাইখার আসক্তি, অপবাদ নিরসনকল্পে মিসরের সম্ভ্রান্ত নারীদের নিয়ে যুলাইখার ভোজসভা প্রভৃতি বিষয়ে 'বয়ান : ১'-এ আলোচনা হয়েছে বিধায় পুনরায় তা পত্রস্থ করা হল না। –অনুবাদক

যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল বিধায় তিনি সেখানে চলে গেলেন। কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়ে রাখা ছিল, ইউসুফ (আ.) প্রবেশ করার পর সপ্তম থেকে প্রথম কক্ষ পর্যন্ত সবগুলোতে তালা লাগিয়ে দেবে। তারা তাই করল। ভেগে যাওয়ার কোন পথ ইউসুফ (আ.)-এর জন্য রইল না। নির্জনতা, যুলাইখার অপার সৌন্দর্য, সাজসজ্জা সর্বোপরি মানবিক আবেগ– এ এক এমন অবস্থা, যদি নবী ও অবুঝ না হতেন তাহলে রক্ষা পাওয়ার কোন সুরত ছিল না।

ইউসুফ (আ.) গিয়ে দেখলেন, অত্যন্ত আকর্ষণীয় সাজসজ্জা ও ভঙ্গিমায় যুলাইখা সেখানে উপবিষ্ট রয়েছে। যুলাইখা নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল। কুরআন তাকে এভাবে বর্ণনা করেছে–

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ

নিশ্চয়ই মহিলা তার বিষয়ে চিন্তা করেছিল এবং সেও মহিলার বিষয়ে চিন্তা করত, যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার মহিমা অবলোকন করত। [ইউসুফ : ২৪]

অর্থাৎ আল্লাহ কর্তৃক প্রদর্শিত প্রমাণ ও পয়গাম্বরের বরকত যদি সঙ্গী না হত তাহলে মানবিক আবেগ তাকেও গ্রাস করত।

ইউসুফ (আ.)কে আল্লাহর পক্ষ হতে হেফাযত

কোন কোন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইউসুফ (আ.) উপর দিকে নজর দিয়ে দেখতে পেলেন, পিতা ইয়াকুব (আ.) স্বীয় অঙ্গুলি দাঁতে চেপে তাঁকে হুঁশিয়ার করছেন।

আল্লাহর নিদর্শন দেখে ইউসুফ (আ.) সেখান থেকে দৌড়ে পালালেন। কক্ষগুলো তালাবদ্ধ ছিল। কিন্তু নবীর মুজেযার কারণে তালাগুলো খুলে খুলে পড়ে গেল। সাতটি কক্ষেরই তালা খুলে গেলে তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন। যুলাইখা দেখল, ইউসুফ (আ.) বাইরে গিয়ে লোকজনকে বলে দিলে বদনাম হবে। আমি বাদশাহর স্ত্রী। আমার মর্যাদা ধুলোয় মিশে যাবে।

নারী তো চক্রান্ত পটিয়সী। সূরা ইউসুফেই তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে–

إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ

তোমাদের চক্রান্ত খুবই মারাত্মক। [ইউসুফ : ২৮]

আর শয়তানের ব্যাপারে বলা হয়েছে–

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

শয়তানের চক্রান্ত খুবই দুর্বল।

শয়তানের চক্রান্ত গোপনে হয়ে থাকে আর নারীদেরটা প্রকাশ্যে। তারা কারো উপর চড়াও হয়ে এমনভাবে কথা বলে, বড় বড় জ্ঞানী পর্যন্ত বেকুব বনে যায়।

যুলাইখা দেখল, ইউসুফ (আ.) আসল কাহিনী বলে দিলে বদনাম হয়ে যাবে। তাই দৌড়ে বাইরে এসে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিল। বলতে লাগল, ইউসুফ (আ.) খারাপ ইচ্ছা নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। আমি যদি দৌড়ে বাইরে না আসতাম তাহলে আমাকে অপবিত্র করে দিত। লোকজন জড় হয়ে গেল। সে একইভাবে চিৎকার করতে থাকল– আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন। তার ইচ্ছা খারাপ ছিল (নাউযুবিল্লাহ)।

যুলাইখার স্বামী মিসরের বাদশাহ দেখল, তার স্ত্রী চেঁচামেচি করে লোকজন জড় করে ফেলেছে। ইউসুফ (আ.)-এর উপর অপবাদ দিচ্ছে। বাদশাহর বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিন্তু যুলাইখার জোরালো বক্তব্যে বাদশাহর মনে হল হয়তো ইউসুফ (আ.) খারাপ ইচ্ছাই করেছিল। যুলাইখার ইচ্ছা ছিল ইউসুফ (আ.)-এর উপর অপবাদ চাপিয়ে নিজের পবিত্রতা প্রমাণ করা কিন্তু আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল স্বীয় পয়গাম্বরের পবিত্রতা প্রকাশ করা। আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের ঘরের ছোট্ট একটি শিশু যার কোন বোধ ও বুঝশক্তিই নেই– সে বলে উঠল, ফয়সালার একটি সুরত আছে। কার দোষ তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। ইউসুফ (আ.)-এর গায়ের জামা দেখা হোক। যদি সামনে দিয়ে ছেঁড়া হয় তাহলে সে দোষী আর যদি পেছন দিক দিয়ে ছেঁড়া হয় তাহলে যুলাইখা দোষী।

ইউসুফ (আ.) যখন যুলাইখার হাত থেকে বাঁচার জন্য দৌড়ে পালাচ্ছিলেন তখন যুলাইখা পেছন থেকে জামা টেনে ধরেছিল বিধায় তা পেছন থেকে ছিঁড়ে গিয়েছিল। শিশুটির কথা অনুযায়ী লোকজন যখন ইউসুফ (আ.)-এর

দিকে তাকাল, দেখল পেছন থেকে তাঁর জামা ছেঁড়া। ইউসুফ (আ.)-এর নির্দোষিতা ও যুলাইখার অপরাধ সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। আযিযে মিসর তখন ক্ষমা চাইল–

يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا وَ اسْتَغْفِرِىْ لِذَنْبِكِ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ

ইউসুফ! এ প্রসঙ্গটি বাদ দাও! আর হে নবী! এ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে তুমিই পাপাচারিণী। [ইউসুফ : ২৯]

ইউসুফ (আ.)কে কেন কারাগারে পাঠান হল

আযিযে মিসর ঘরে বসে ইউসুফ (আ.)-এর নির্দোষিতার স্বীকৃতি দেয়া ও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা সত্ত্বেও দেশবাসীর কাছে নিজের স্ত্রীর বদনাম যাতে না হয় তাই ইউসুফ (আ.)কে কারাগারে পাঠিয়ে দিলেন। যাতে তারা বুঝতে পারে ইউসুফ (আ.)ই দোষী।

হযরত ইউসুফ (আ.) কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। যুলাইখার নানা কৌশল ও প্ররোচণা অপেক্ষা কারা জীবনকেই তিনি শ্রেয় মনে করলেন। ইতোমধ্যে রাজকর্মচারীদের থেকে দুই যুবকও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হল। একজন বাদশাহর বাবুর্চি ও অপরজন পানীয় পরিবেশক। খাদ্যে বিষ মিশিয়ে বাদশাহকে হত্যা প্রচেষ্টার অভিযোগে তারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হল। এ দুই যুবক স্বপ্ন দেখে ইউসুফ (আ.)-এর কাছে ব্যাখ্যা জানতে চাইল। কুরআনে তা এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ط قَالَ اَحَدُهُمَا اِنِّىْٓ اَرٰنِىْٓ اَعْصِرُ خَمْرًا ج وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّىْٓ اَرٰنِىْٓ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِىْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ط نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ ج اِنَّا نَرٰكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ

তাঁর সাথে কারাগারে দু'জন যুবক প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল : আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মদ নিঙড়াচ্ছি। অপরজন বলল : আমি দেখলাম যে, নিজ

মাথায় রুটি বহন করছি। তা থেকে পাখি ঠুকরিয়ে খাচ্ছে। আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলুন। আমরা আপনাকে সৎকর্মশীল দেখতে পাচ্ছি। [ইউসুফ : ৩৬]

স্বপ্নের তাবির একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র

স্বপ্নের সম্পর্ক গাইবের সাথে। অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে যারা অবগত হতেন সেই নবী রাসূলগণ স্বপ্নের ব্যাখ্যা ভাল বুঝতেন। সত্য স্বপ্ন নবুওয়াতের অংশ। স্বপ্ন সূক্ষ্ম বিষয় হয়ে থাকে। নানা ইঙ্গিতে স্বপ্নের মধ্যে বক্তব্য প্রদর্শিত হয়। নবুওয়াত পরবর্তীতেও আল্লাহ স্বপ্ন বোঝার ক্ষমতা মানুষকে দান করেছেন। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لم يبق من النبوة الا المبشرات

আমার আগমনের মাধ্যমে নবুওয়াতের সমাপ্তি ঘটেছে। তবে মুবাশশিরাত তথা সত্য স্বপ্নের ধারা বজায় রয়েছে।

স্বপ্নের ইশারা সবাই বুঝে না। যাদেরকে আল্লাহ এ জ্ঞান দান করেছেন কেবল তারাই বুঝতে পারেন। ইসলামী শরীয়তে স্বপ্নের তাবির একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করেছে। এ বিষয়ে কুরআন হাদীসে মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। যার ভিত্তিতে বিষয় ভিত্তিক বহু ইমাম ও আলেম তৈরি হয়েছেন।*

ইউসুফ (আ.)-এর কাছে তাবির জানতে চাওয়ার কারণ

রাজকর্মচারী যুবকদ্বয় তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা জেলারের কাছে জানতে না চেয়ে ইউসুফ (আ.)-এর কাছে ছুটে এসেছে। ইউসুফ (আ.)-এর সৎকর্মশীলতা, বুযুর্গী ও অবয়বে নবুওয়াত দ্যুতির বিচ্ছুরণ দেখে তারা বুঝে নিয়েছিল ইনি অবশ্যই একজন পবিত্র ব্যক্তি হবেন। ইনি ছাড়া অন্য কেউ আমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারবে না।

যুবকদ্বয় তাঁর কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রত্যাশার কারণ নিজেরাই উল্লেখ

---

* স্বপ্নের তাবির ও এ বিষয়ক কয়েকটি ঘটনা দ্বিতীয় বয়ানে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। --অনুবাদক

করেছে। বলেছে– আমরা আপনাকে 'মুহসিন'রূপে দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহর ইবাদত করার সময় ব্যক্তির অবস্থা যখন এমন হয় যে, আল্লাহকে যেন সে নিজের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে তখন তাকে মুহসিন বলা হয়। সুতরাং তাদের মনে হয়েছে, এত আবেদ যিনি, কেবল তাঁর পক্ষেই আমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব।

নবুওয়াতের হেকমত ও তাবলীগের পদ্ধতি

যুবকদ্বয় কর্তৃক তাবির জানতে চাওয়ার সাথে সাথেই তিনি তাবির বলে দেননি; বরং হেকমতের আশ্রয় নিয়েছেন। যেহেতু তিনি নবী, তাই চাচ্ছিলেন দীনের প্রচারের পথ বের করতে। যুবকদ্বয় যেহেতু তাঁর প্রতি আগ্রহী হয়েছে সেহেতু তাদের আগ্রহকে আরো বাড়িয়ে তাদেরকে দীনের দাওয়াত দেয়া ও তাদের নিয়ে অগ্রসর হওয়ার চিন্তা করলেন। নবীগণ এমনই হয়ে থাকেন। তারা চান, যে কোনভাবে হোক, লোকজন যেন দীনের পথে চলে আসে। সমগ্র পৃথিবীর মানুষ যাতে দীনের পথে আসতে পারে তার পথ তাঁরা খুঁজতে থাকেন। এখানেও ইউসুফ (আ.) তাই করলেন। যুবকদ্বয়কে তাবলীগ করার পদ্ধতি খুঁজলেন। তাঁর প্রতি আগ্রহকে পুঁজি করে এগিয়ে যেতে চাইলেন। তাই স্বপ্নের তাবির জানাবার বদলে প্রথমেই তিনি বললেন–

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهٖٓ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا

তিনি বললেন, তোমাদেরকে প্রত্যহ যে খাদ্য দেয়া হয়, তা তোমাদের কাছে আসার আগেই আমি তার ব্যাখ্যা বলে দেব। [ইউসুফ : ৩৭]

ইউসুফ (আ.) তাদের মনে আগ্রহ বাড়ানোর জন্য কিছুটা সময় নিলেন। আবার এও বলে দিলেন, খুব বেশি দেরি করব না। দুপুরের খাবারের পূর্বেই বলে দেব। লক্ষণীয়, তিনি যুবকদেরকে নিজের প্রতি পূর্ণ আগ্রহী করে তুলতে চাচ্ছিলেন। এতে তাঁর পরবর্তী দাওয়াতী বক্তব্য উপস্থাপন সহজ ও ফলপ্রসূ হবে। বেপরোয়া ব্যক্তির কাছে ওয়াজ না করাই বিধি। যে আগ্রহ নিয়ে শুনতে আসে তার কাছে বলা উচিত। তার মধ্যেই ওয়াজ

প্রভাব বিস্তার করবে। নবীগণ যখন দেখতেন অন্তরে হক কথা কবুল করার যোগ্যতা তৈরি হয়ে গেছে, তখন তাঁরা ওয়াজ করতেন। দুই যুবকের মধ্যে আগ্রহ থাকার পরও তিনি সে আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দেয়ার জন্য সময় নিলেন। এরপর তিনি বললেন–

ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِىْ رَبِّىْ

এ জ্ঞান আমার পালনকর্তা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। [ইউসুফ : ৩৭]

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে যে ব্যাখ্যা দেব তা শুধু আমারই কথা হবে না, আমার প্রভু আমাকে তাবিরের জ্ঞান দান করেছেন। আমি সে জ্ঞানের আলোকেই তার ব্যাখ্যা তোমাদেরকে জানাব। এতে তাবির সত্য হওয়ার ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ থাকবে না। আমার নিজের পক্ষ থেকে দিলে তা বাস্তব না হওয়ারও সম্ভাবনা থাকত। মোট কথা, তিনি তাদেরকে আশ্বস্ত করলেন, দ্রুতই তাবির জানাব এবং ইলমে নববীর দ্বারাই জানাব। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। এভাবে আশ্বস্ত হওয়ার পর তাঁর প্রতি যুবকদ্বয়ের আগ্রহ বহুগুণে বেড়ে গেল। তারা দেখল সঠিক জায়গাতেই আমরা এসেছি।

নিজের পরিচিতি ও পরকাল ভাবনা

অতঃপর নবী ইউসুফ (আ.) তাদের উদ্দেশে বললেন–

اِنِّىْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ

আমি ঐসব লোকদের ধর্ম পরিত্যাগ করেছি যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং পরকালে অবিশ্বাসী। [ইউসুফ : ৩৭]

এ কথা বলার উদ্দেশ্য হল, তোমরা প্রথমে আমার পরিচয় সম্পর্কে অবগত হয়ে যাও যে আমি কে। কারণ, ব্যক্তিত্বের প্রভাবে কথার মূল্যায়ন হয়ে থাকে। একই কথা যখন আমি বলব তখন তার গুরুত্ব থাকবে না। কিন্তু দেশের প্রেসিডেন্ট বললে সে কথা দেশব্যাপী আলোড়ন তুলবে, মন্তব্য মতামত শুরু হয়ে যাবে। কোন কোন কথায় রাষ্ট্রক্ষমতা পর্যন্ত পাল্টে

যাবে। জাতিসংঘের প্রধান ব্যক্তির কথা হলে সে কথা বিশ্বজোড়া প্রচার পাবে, সারা বিশ্বের সংবাদ মাধ্যম তাকে ফলাও করে প্রচার করবে। একই কথা আমি বললে তা কেউ শুনবে না। এ হল ব্যক্তিত্বের প্রভাব। ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মানুষ প্রভাবিত হয়। খুব কম মানুষ আছে যারা কথার প্রভাবে প্রভাবিত হয়। সামান্য কথাও ব্যক্তির কারণে অনেক বড় কথা হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হক কথাতেই প্রভাবিত হওয়া আবশ্যক। চাই তা যে কেউ বলুক না কেন। যাই হোক, মানুষের সাধারণ অভ্যাসের দিকে দৃষ্টি রেখেই ইউসুফ (আ.) তাবির বলার পূর্বে দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্র তৈরি করার মানসে নিজের পজিশন তাদের সামনে তুলে ধরতে চাইলেন। যাতে তাঁর কথা তাদের মনে প্রভাব বিস্তার করে।

আয়াতের পরবর্তী অংশে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পরিচিতিমূলক বক্তব্য আলোচিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি ঐ সমস্ত লোকের ধর্ম পরিত্যাগ করেছি যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং পরকালে অবিশ্বাসী আর তাদের অন্তরে ঈমানী চেতনাও নেই। আমি আল্লাহ, তাঁর রাসূলগণ ও পরকালেরও স্বীকৃতি দেই। আমি আরো বিশ্বাস করি, একদিন আমাকে আল্লাহর মুখোমুখি হতে হবে। দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি কাজ ও কথার জবাবদিহী করতে হবে, জীবনের হিসাব দিতে হবে। পরকালের ভাবনা আমার রয়েছে। আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই যারা পরকালের পরোয়া করে না, যারা পার্থিব জীবনের সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসকেই জীবনের চরম পরিসমাপ্তি মনে করে। সকলেরই মনে রাখা আবশ্যক, পার্থিব জীবনের সুখভোগের জবাবদিহী একদিন করতে হবে। আল্লাহ বলেন–

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ

অতঃপর সেদিন তোমরা পার্থিব জীবনের নেয়ামতরাজি সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। [তাকাসুর : ৮]

হাদীস শরীফে এসেছে, গরমের দিনে ঠাণ্ডা পানি ও ঠাণ্ডার দিনে গরম পানি 'নেয়ামত'-এর অন্তর্ভুক্ত। এর ব্যাপারেও হিসাব হবে যে, তোমরা এ নেয়ামতকে ব্যবহার করেছ কিন্তু তার বিপরীতে কত পরিমাণ সিজদায়ে শুকুর আদায় করেছ? এত ফোঁটা ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করেছ তার বিনিময়ে কত পরিমাণ শুকুর আদায় করছ? নাশুকুরী করনি তো? নেয়ামতের অস্বীকার করনি তো? এ তো গেল সামান্য পানির ব্যাপার। এ ছাড়াও যে

লক্ষ লক্ষ নেয়ামত রয়েছে তার ব্যাপারে কত প্রশ্ন হতে পারে? আখেরাতের ভাবনা যখন থাকে তখন মানুষ নেয়ামত ব্যবহারের ব্যাপারে সতর্ক হয়। নেয়ামতের মালিকের অনুমোদিত অংশ পর্যন্ত তারা ব্যবহার করে।

যাই হোক, হযরত ইউসুফ (আ.) নিজের পরিচয় উপস্থাপন করতে গিয়ে আল্লাহ ও পরকাল অস্বীকারকারী সম্প্রদায়কে ত্যাগ করে আসার কথা বললেন। তাদের পরকালের অস্বীকৃতি ছিল বিশ্বাসগত। দাহরিয়া সম্প্রদায়ের লোকদের মত, যাদের বিশ্বাস হল– পার্থিব জীবনই জীবনের পরিসমাপ্তি। মানুষ জন্ম নেয়, মৃত্যুবরণ করে, এখানেই জীবনের শেষ। এরপর অন্য কোন জীবন আর নেই। সুতরাং জীবনকে উপভোগ করে নাও। আর তো পৃথিবীতে আসতে পারবে না, একটাই তো জীবন। কবির ভাষায়–

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ

উৎফুল্ল চিত্তে জীবনকে উপভোগ কর, দ্বিতীয় আর জগত তো নেই।

এসব কেবল তার পক্ষেই করা সম্ভব যে সম্পূর্ণ পরকাল ভাবনা মুক্ত। যার মধ্যে এ ভাবনা রয়েছে যে, আমাকে দ্বিতীয়বার জীবন দেয়া হবে, আখেরাতে সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সামনে আসবে–

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

অতঃপর কেউ অনু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে। [যিলযাল : ৭]

হযরত ইউসুফ (আ.) যাদেরকে ছেড়ে আসার কথা বলেছিলেন তারা বিশ্বাসগতভাবে আখেরাতকে অস্বীকার করত। কিছু লোক এমনও আছে যারা বিশ্বাসগতভাবে পরকালকে অস্বীকার না করলেও তাদের কর্মকাণ্ড দেখে মনে হয়, আখেরাতের ভাবনা তাদের মধ্যে নেই। বহু মুমিন মুসলমানও এমন আছে যারা ঈমানের ভিত্তিতে আখেরাত সম্পর্কে জ্ঞাত কিন্তু অন্তরে তার প্রভাব নেই। তাদের জীবন বলে দেয়, তারা পরকাল ভাবনা মুক্ত। ভুলেও তাদের খেয়াল হয় না যে, আমাদের মরতে হবে, কবরে যেতে হবে, হাশর ময়দানে উপস্থিত হতে হবে, আল্লাহর সামনে

দণ্ডায়মান হতে হবে। ইউসুফ (আ.) ঘোষণা করলেন, আমি বিশ্বাসগত ও কর্মগত উভয়ভাবেই পরকালের স্বীকৃতি দেই।

হযরত ইউসুফ (আ.) স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার পূর্বে আরো কিছু আলোচনা তাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। বললেন–

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَاۤءِىْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ

আমি আপন পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের ধর্ম অনুসরণ করছি। [ইউসুফ : ৩৮]

ইতোপূর্বে তিনি যাদেরকে ছেড়ে এসেছিলেন তাদের ব্যাপারে অবহিত করেছিলেন। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসতে পারে, আপনি তাহলে কোন পথের অনুসারী? এমন প্রশ্নের উত্তর প্রদানের নিমিত্তে তিনি উপর্যুক্ত কথাগুলো বললেন। অর্থাৎ আমার পিতৃপুরুষ, যাঁদের কাছে আল্লাহর ওহী আসত সেই সম্মানিত নবীগণের আনীত দীনের উপর আমি প্রতিষ্ঠিত রয়েছি, যাঁদের দীনের মূল ভিত্তি ছিল তিনটি– এক. আল্লাহর সত্তার স্বীকৃতি, দুই. পরকালের স্বীকৃতি ও তিন. শরীয়তের স্বীকৃতি। এ তিনটির কোন একটি না থাকলে ব্যক্তি হক পথের অনুসারী হতে পারে না।

হযরত ইউসুফ (আ.) ইশারা করলেন, তোমরা বুঝে নাও আমি কোন দলভুক্ত। আমার দল হযরত ইবরাহীম, হযরত ইসহাক ও হযরত ইয়াকুব (আ.)দের দল। বংশগতভাবে আমি যেমন তাঁদের সন্তান, দীনগতভাবেও আমি তাঁদেরই পথের পথিক।

উপদেশ দেয়ার জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করা

হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁর তিন পিতৃপুরুষের কথা উল্লেখ করে যুবকদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। এক জনের নাম উল্লেখ করলেও চলত, কিন্তু দৃঢ়তা আনয়নের জন্য তিন জনের কথা উল্লেখ করলেন। এভাবেই তিনি শ্রোতাদের মনোযোগ তাঁর দিকে কেন্দ্রীভূত করলেন। এটা ছিল নবীগণের বিশেষ তরিকা। উপদেশ দেয়ার পূর্বে তা গ্রহণের যোগ্যতা ব্যক্তির মধ্যে নিশ্চিত করে তবেই তারা উপদেশ দেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনেও আমরা এ বিষয়টি দেখতে পাই। হাদীসে এসেছে, একবার একই বাহনে হযরত

মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর করছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সামনে এবং মুয়াজ (রা.) পেছনে। তাদের দু'জনের মধ্যে কোন দূরত্ব ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়াজ (রা.)কে ডাক দিলেন– ইয়া মুয়াজ!

প্রতিউত্তরে মুয়াজ (রা.) বললেন– লাব্বাইকা ওয়া সায়দাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! (হে আল্লাহর সম্মানিত রাসূল! আমি উপস্থিত)। এভাবে তিনবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাক দিলেন এবং প্রতিবার তিনি একইভাবে উত্তর দিলেন। এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলার তা বললেন।

এত কাছে থাকা সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন তাকে তিনবার ডাক দিলেন? কারণ ঐ একটাই। পরিপূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করা।

হযরত ইউসুফ (আ.)ও এই চার পাঁচটি বাক্যের মাধ্যমে তাদের আগ্রহ বাড়িয়ে তুললেন। এর পর তিনি তার মূল বক্তব্য উপস্থাপন করলেন। তখনও কিন্তু স্বপ্নের ব্যাখ্যা তাদেরকে বলেননি।

হযরত ইউসুফ (আ.) কর্তৃক তাওহীদের পাঠদান

مَاكَانَ لَنَا اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ

আমাদের জন্য শোভা পায় না যে, কোন বস্তুকে আল্লাহর অংশীদার করি। [ইউসুফ : ৩৮]

এক খোদার মুখে স্বীকৃতি দিয়ে কর্মের মাধ্যমে তার অংশীদার সাব্যস্ত করা একাধিক খোদার স্বীকৃতিরই নামান্তর। একত্ববাদের স্বীকৃতি দিয়ে কিছু আল্লাহর ইবাদত ও কিছু গাইরুল্লাহর ইবাদত করা, সামনে মূর্তি রেখে এই দাবী করা যে, আমরা তো আল্লাহরই ইবাদত করি, এগুলো কিবলার অনুরূপ মাত্র– এগুলো একত্ববাদের দাবী নয়। অথবা একজন স্রষ্টার স্বীকৃতি দিয়ে বহু কাজে অন্য আরেকজনকে মেনে নেয়া, যেমন ছোটখাটো খোদা ইলম দেয়, সন্তান দেয়, বড় খোদা বড় বড় কাজগুলো আঞ্জাম দিয়ে থাকে। যেমন আসমান জমিন বানানো বড় খোদার কাজ প্রভৃতি। এগুলো

প্রকৃত তাওহীদ নয়। সুতরাং সত্তা, গুণাবলী ও কাজে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা তাওহীদ পরিপন্থী। আম্বিয়া (আ.) যে দীন নিয়ে এসেছেন তার মূল কথা হল এই– যাঁর ইবাদত আমরা করছি তিনি এক, একক সত্তা, না তাঁর কোন শরীক আছে, না কোন সহযোগী আছে, না কোন সমকক্ষ আছে। তাঁর গুণাবলীও শরীক মুক্ত। তাঁর গুণের অনুরূপ গুণ কারো নেই। আমাদের হায়াত অপ্রকৃত, তাঁর হায়াত প্রকৃত ও মৌলিক, তাঁর অস্তিত্ব সত্তাগত, আমাদের অস্তিত্ব তাঁরই প্রদত্ত। আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র– অস্তিত্বমান সকল কিছুরই স্রষ্টা তিনি, আমরা কোন কিছুরই স্রষ্টা নই। তিনিই সবকিছুর অস্তিত্ব আনয়নকারী, আমরা কোন কিছুকেই অস্তিত্ব প্রদান করতে পারি না। তাঁর দেয়া বস্তুকে সংযুক্ত করে আমরা নতুন একটি জিনিস উদ্ভাবন করতে পারি কিন্তু নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারি না। আল্লাহ কর্তৃক কোন কিছু উদ্ভাবনের মানে হল অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করা আর মানুষ কর্তৃক উদ্ভাবনের মানে হল অস্তিত্বমান বস্তুকে নানা প্রক্রিয়ায় অন্য রূপ দেয়া। তাঁর কাজও শরীকহীন। তিনি প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। আমরা প্রাণী সৃষ্টি করতে পারি না। আমরা পাখির আকৃতি বানিয়ে তাতে জ্বালানি ভরে ওড়াতে কিংবা নড়াচড়া করাতে পারি কিন্তু প্রাণ দিতে পারি না, বুদ্ধি ও অনুভূতি দিতে পারি না। মাছের আকৃতিতে উড়োজাহাজ বানিয়ে শূন্যে সাঁতার কাটাতে পারি কিন্তু জীবন ও অনুভূতি তাতে দিতে পারি না। আর আল্লাহ যা বানান তাতে প্রাণ, অনুভূতি ও জ্ঞান থাকে।

[তাওহীদের বিশাল বিস্তৃত বিষয়কে সূরা ইখলাসের মধ্যে আল্লাহ তাআলা অতি সংক্ষেপে পূর্ণাঙ্গভাবে আলোচনা করেছেন। বিশদভাবে জানার জন্য এ সূরার তাফসির দেখা যেতে পারে।]

খৃষ্টানদের বিশ্বাস প্রতিহত করার একটি মজার ঘটনা

এ মুহূর্তে আমার একটি ঘটনা মনে পড়ল। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম সফরে মুদাররিসীন হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহ.), যিনি ছিলেন আলেমে কামেল, আরিফ বিল্লাহ এবং কাশফ ও কারামতের অধিকারী। তাঁর সময়ের ঘটনা। মাদরাসার নিচের দিকের জামায়াতে পড়ুয়া এক ছাত্র মাদরাসা থেকে বেশ দূরে কোথাও গিয়েছিল। সেখানে খৃষ্টানদের এক সভা চলছিল। তাদের একজন পাদ্রী আলোচনা করছিল

আর লোকজন তা শুনছিল। এ ছাত্রটিও সেখানে অংশগ্রহণ করল। আলোচনার এক পর্যায়ে পাদ্রী হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে বলল, তিনি ছিলেন আল্লাহর ছেলে। এরপর পাদ্রী নিজের মত করে তা প্রমাণ করতে লাগল। উক্ত তালিবে ইলম তা সহ্য করতে না পেরে প্রতিবাদ করতে লাগল। বলল, এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। আল্লাহর সন্তান হওয়া কী করে সম্ভব? ছাত্রটি দলিল দিতে শুরু করল আর পাদ্রী তা খণ্ডন করতে লাগল। পাদ্রী খুব বুঝদার ব্যক্তি ছিল আর বেচারা তালিবে ইলম মাত্র কয়েক জামায়াত পড়েছে। কুরআন হাদীসের কিছুই সে জানে না। পাদ্রীর সামনে বেশিক্ষণ টিকতে পারল না। সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব প্রভাব পড়ল। তারা তো জানে না যে এ একজন ছাত্র। তারা মনে করেছে দারুল উলুম দেওবন্দের একজন আলেম, পাদ্রী তাকে হারিয়ে দিয়েছে। তার সামনে কথাই বলতে পারেনি।

সভাস্থলের পাশেই খাদ্যসামগ্রী বিক্রির একটি দোকান ছিল। দোকানদার দোকানে বসে আলোচনা শুনছিল। তার খুব খারাপ লাগল। বলল, আমাদের দারুল উলুমের তো আরো বদনাম হয়ে যাবে। সে দোকান থেকে লাফিয়ে নেমে এল। ছাত্রটিকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে বলল, মৌলভী সাহেব! এখান থেকে সরে যাও। এ পাদ্রী জাহেল, আর জাহেলের সাথে জাহেলই লড়তে পারে। এটা আলেমের কাজ নয়। ওকে আমি বুঝাচ্ছি।

দোকানদারের আগমন ছাত্রটির কাছে গনিমতের মত মনে হল। যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে খুব পেরেশান হচ্ছিল।

দোকানদার এবার পাদ্রীর দিকে মুখ করে বলল, জি পাদ্রী সাহেব, কী বলছিলেন?

পাদ্রী বলল, আমি বলছি, ঈসা (আ.) আল্লাহর ছেলে।

দোকানদার বলল, আপনি বলছেন ঈসা (আ.) আল্লাহর ছেলে? আল্লাহ তাঁর পিতা? আল্লাহর বয়স কত?

পাদ্রী বলল, বেয়াকুব! আল্লাহ তো অনাদি, তাঁর বয়স কি করে হতে পারে? বয়স তো তার জিজ্ঞেস করা যায় যে প্রথমে ছিল না, পরেও থাকবে না। জন্ম তারিখ ধরে তার বয়স নিরূপন করা যায়। যিনি অনাদি ও অনন্ত তাঁর বয়স জানতে চাওয়া বেয়াদবী ছাড়া আর কী?

দোকানদার বলল, এত দীর্ঘ জীবনে তাঁর কতজন সন্তান হয়েছে?

পাদ্রী বলল, একজন, হযরত ঈসা (আ.)।

দোকানী বলল, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! আরে, আমি বায়ান্ন বছরের জীবনে বারজন সন্তান জন্ম দিয়ে ফেলেছি, আর আল্লাহ তাআলার লক্ষ কোটি অজস্র অসংখ্য বছরের জীবন, আর মাত্র একটি সন্তান! বারটি সন্তান তো কেবল আমারই হয়ে গেছে! জোয়ান তাজা ছেলেগুলো এই সামনেই রয়েছে। পাদ্রীর কাছে এর কী-ই-বা জবাব ছিল? সে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু জনতার আওয়াজে তা থেমে গেল। তারা বলল, দোকানী তো ঠিকই বলেছে! এত বড় যখন জীবন, তখন তো অজস্র অসংখ্য সন্তান হওয়া আবশ্যক। সর্ব সাকুল্যে মাত্র একজন সন্তান! এ তো মানুষের জন্যেও দোষের কথা যে, একশ' বছরের জীবনে সাকুল্যে একটি সন্তান জন্ম হয়েছে। লোকেরা বলবে, কোন পাত্রের খানা খেয়েছ! তোমার মধ্যে কোন জীবন কী আছে, না নেই? অনাদি হতে অসীম কালের জীবন যার, অসীম যার শক্তি সামর্থ্য, তার সন্তান মাত্র একটি। বিষয়টি সাধারণ মানুষকে খুব প্রভাবিত করল। তারা তালি দিতে শুরু করে দিল।

পাদ্রী বেচারা চিল্লিয়ে কিছু বলতে চাচ্ছিল, কিন্তু লোকজন বলল, তুমি ভুয়া! তোমার মুখে কথা সরছে না।

মোট কথা, বিতর্কের ইশতেহার ঘোষণা হল– মুসলমান জিতে গেছে আর পাদ্রী হেরে গেছে।

যাই হোক, আমার এ কথা বলার ছিল যে, এ ঘটনা যখন মাওলানা ইয়াকুব (রহ.)-এর কাছে জানান হল তখন তিনি বললেন, দোকানদার খুব বড় আলেমসুলভ উত্তর দিয়েছে। কিন্তু তার কাছে ইলমী শব্দ ছিল না। কথা যা বলেছে তা বড় ইলমী কথা।

তিনি বললেন, জওয়াবের নির্যাস এই– যদি সন্তান হওয়া আল্লাহর জন্য কামালিয়াতের বিষয় হত তাহলে আল্লাহর অন্যান্য কামালিয়াত যেমন সীমাহীন, এখানেও তাই ঘটত। অর্থাৎ তাঁর সন্তানও অসীম হত, গুনে শেষ করা যেত না। আর যদি সন্তান হওয়া আল্লাহর কামালিয়াতে না হয় তা হলে একজন সন্তান হওয়াও দোষের। তিনি একজনও সন্তান হওয়া হতে পবিত্র। দোকানদারের কাছে ইলমের শব্দ ছিল না বলে জাহেলসুলভ কথা বলেছে। কিন্তু কথা যা বলেছে তা সত্যই বলেছে।

একেই হযরত ইউসুফ (আ.) এভাবে বলেছেন, আল্লাহর মত মহান পবিত্র ও অতুলনীয় সত্তার সাথে বিশ্বাসে ও ইবাদাতে কাউকে শরীক করা আমাদের জন্য শোভা পায় না।

শিরকের সূচনা

শিরকের ব্যাপারে ইসলাম সর্বোচ্চ কঠোরতা প্রদর্শন করেছে। অন্যান্য হক ধর্মও শিরককে প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু ইসলাম শুধু শিরককেই প্রত্যাখ্যান করেনি, যা কিছু শিরক-এর মাধ্যম হতে পারে তাকেও প্রত্যাখ্যান করেছে। যাতে শিরক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও দূর হয়ে যায়। যেমন- ছবি তোলা বা ছবি আঁকা। শিরকের সূচনা ছবি দ্বারা হয়ে থাকে বিধায় তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে অপারগতার বিষয় হলে তা ভিন্ন কথা। যেমন- হজ করতে গেলে ছবি তোলা ছাড়া সম্ভব নয়। হজের ফরয আদায় করতে হলে আপনাকে ছবি তুলতেই হচ্ছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরাম ছবিকে অনুমোদন করেছেন। এক্ষেত্রে ছবি তোলা আপনার নিজের কাজ নয়, আপনার অপারগতা। এভাবে আরো কিছু নিষিদ্ধ কাজও কখনো কখনো অনুমোদন পেয়ে যায়। যেমন- জিহাদের সময় মুজাহিদদের সাথে কিছু মূর্খ লোকও অংশগ্রহণ করল। তারা গান বাজনা করল। এমন ক্ষেত্র হলেও উলামায়ে কেরামের জিহাদে অংশগ্রহণ করে ফরয দায়িত্ব পালন করতে হবে। সুতরাং অপারগতার বিভিন্ন সুরত থাকে। তখন অবস্থা বিচারে নিষিদ্ধ কাজ অনুমোদন পায় কিন্তু মূল নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকে।

প্রাণী ছাড়া অন্য কিছুর ছবি তোলা বা আঁকায় অসুবিধা নেই। যেমন- গাছপালা, পাহাড়-পর্বতসহ নানা প্রাকৃতিক দৃশ্য। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে, বিনা অপারগতায় প্রাণীর ছবি তোলা শিরকের অভ্যাস তৈরি করে।

পৃথিবীতে শিরকের সূচনা ছবি বা প্রতিকৃতি দিয়েই হয়েছিল। কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে, শিরকের সূচনা হযরত নূহ (আ.)-এর কওম দ্বারা হয়েছিল। আদম (আ.)-এর ছেলে কাবিল, যে অন্যায়ভাবে ভাই হাবিলকে হত্যা করেছিল। তার বংশধর থেকে শিরকের সূচনা হয়েছিল। কাবিলের সপ্তম পুরুষের হাতে এর সূচনা। অন্যায়ভাবে হত্যা করার পর আল্লাহর

লানত তার উপর পড়েছিল। তারই প্রভাবে কাবিলের সপ্তম পুরুষ হতে শিরক প্রকাশ পায়। শুধু তাই নয়, পৃথিবীতে যত হত্যাকারী রয়েছে তাদের অধিকাংশই কাবিলের বংশধর।

হযরত নূহ (আ.) যে কওমের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন সে কওমে পাঁচজন বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। যাদের নাম কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে তারা হলেন– ওদ্দা, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউস ও নাসর। এরা পাঁচজন সালেহ বান্দা ছিলেন। এদের মজলিসে বসে ইলম ও ঈমান তাজা হত, তাদের হেদায়াত দ্বারা মানুষ নেকীর দিকে মনোযোগী হত। এদের ইন্তেকালের পর কওম আফসোস করতে লাগল– এখন আমরা কার মজলিসে যাব? কিভাবে হেদায়াত হাসিল করব? শয়তান তাদের অন্তরে এ কথা উদয় করে দিল, ঐ বুযুর্গগণ তো চলে গেছেন। এখন উত্তম পদ্ধতি হল তাদের মূর্তি বানিয়ে ইবাদতখানায় রেখে দাও। এতে তাদের আকৃতি দেখে আল্লাহকে তোমাদের স্মরণ হবে এবং অন্তরে আল্লাহর যিকির সৃষ্টি হবে।

তারা তাদের বুযুর্গদের মূর্তি নির্মাণ করে ইবাদতখানায় রাখত। শিরক উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে দেখে ঈমান তাজা করা, ভালভাবে ইবাদত করা। প্রথম দিকে তারা তাই করতে লাগল। কোনভাবেই তারা মূর্তিপূজা করেনি। মূর্তিগুলো তাদের কাছে আল্লাহকে স্মরণের মাধ্যম ছিল মাত্র। দ্বিতীয় প্রজন্মের মারেফাত প্রথম প্রজন্মের মত ছিল না। তবে তারাও মূর্তিপূজা করেনি কিন্তু তাদেরকে খুব সম্মান প্রদর্শন করত। তৃতীয় প্রজন্মে এসে ঐ মূর্তিগুলোর পূজা শুরু হয়ে গেল। তাদের নামে মানত শুরু হল। নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য তাদের কাছে আবেদন করতে লাগল, তাদের কাছে সন্তান প্রার্থনা করতে শুরু করল। আল্লাহকে ভুলে তারা মূর্তিকে সিজদা করতে থাকল এবং নিজেদেরকে মূর্তিদের বান্দা বলে ঘোষণা করতে লাগল। এই হল মূর্তিপূজা ও শিরকের সূচনার কথা। এ শিরক হতে মুক্তির মানসে আল্লাহ হযরত নূহ (আ.)কে প্রেরণ করলেন। সুতরাং মূর্তিপূজার সূচনা প্রতিকৃতি নির্মাণের মাধ্যমে হয়েছিল। এজন্যই ইসলাম শিরককে সমূলে উৎখাত করার জন্য ছবি তোলা, আঁকা ও নির্মাণ করাকে নিষিদ্ধ করেছে। কোন বাধ্যবাধকতা সামনে এলে আলেমগণ যদি ফতোয়া দেন তবে অবকাশ রয়েছে, অন্যথায় নিষিদ্ধ। শখের বশে ছবি তোলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ঘরের সৌন্দর্য বর্ধনের বা

পত্র-পত্রিকার আকর্ষণ বর্ধনের জন্য ছবির ব্যবস্থা রাখা, ছবির প্রচলন এ পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া যে ছুরিতে ছবি, কলমে ছবি, চামচে ছবি, টাকা-পয়সায় ছবি– এই যে সকল কিছুতে শুধু ছবি আর ছবির প্রচলন– ইসলাম একে নিষিদ্ধ করেছে।

ছবির ব্যাপারে একটি সন্দেহের জবাব

হয়তো আপনি বলবেন, খৃষ্টানদের মধ্যে তো ছবির ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। কই তারা তো মূর্তিপূজা করছে না। আমরাও যদি ঘরে ছবি রাখি এবং পূজা না করি তাহলে ক্ষতি কী?

এর জবাবে বলা যায়, প্রথমত তাদের মধ্যে মূর্তিপূজা নেই– এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়। হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত মরিয়ম (আ.)-এর ছবি গির্জাসমূহে রাখা হয়। এ এলাকায় তেমন দেখা না গেলেও পূর্ব আফ্রিকায় যখন গিয়েছিলাম তখন দেখেছি। সেখানে সম্ভবত রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানদের সংখ্যা বেশি। চার্চও অনেক। প্রত্যেক গ্রামে ও শহরে চার্চ রয়েছে। সেখানে আমি দেখেছি, হযরত ঈসা (আ.)-এর মূর্তি জায়গায় জায়গায় বানানো রয়েছে। যখন তারা সেখান থেকে যায় তখন মাথা ঝুঁকিয়ে যায়। এ ইবাদত নয় তো কী? দ্বিতীয়ত তারা যে ছবি বানিয়ে রেখেছে তা যে হুবহু ঈসা (আ.)-এরই ছবি তাও তো নয়। কাল্পনিকভাবে একটি ছবিকে তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর ছবি বলে মেনে নিয়েছে। তা না হলে এগুলো যে হযরত ঈসা ও মরিয়ম (আ.)-এর হুবহু ছবি তার কী প্রমাণ আছে? যখন নেই, তখন তার মানে হল এগুলো শুধুই নাম ছাড়া কিছুই নয়। একেই কুরআনে বলা হয়েছে–

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ

> এগুলো নিছক কিছু নাম, যা তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ রেখেছে। এ বিষয়ে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি।

অর্থাৎ যে মূর্তিগুলোর তোমরা ইবাদত করছ তার কোন যথার্থতা নেই। তোমরা নিজেরা এর নামকরণ করে নিয়েছ। মেনে নেয়ার ভিত্তিতে তোমরা ইবাদত করছ। তোমাদের ইবাদত হল হাওয়াই ইবাদত, তোমাদের সামনে

না রয়েছে কোন ব্যক্তি, না রয়েছে কোন মাবুদ।

যাই হোক, হযরত ইউসুফ (আ.) যুবকদেরকে বললেন, 'কোন বস্তুকে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করা আমাদের জন্য শোভন নয়। এটা আমাদের প্রতি ও অন্যসব লোকদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ লোক অনুগ্রহ স্বীকার করে না।' অর্থাৎ শিরক হতে বেঁচে থাকা বুদ্ধি জ্ঞান দিয়ে সম্ভব নয়। যখন আল্লাহ অনুগ্রহ করেন তখন মানুষ এ থেকে বাঁচতে পারে। শুধু বুদ্ধি অন্যায় থেকে বাঁচাতে পারে না। কত বড় জ্ঞানী মুশরিক পৃথিবীতে অতীতেও ছিল আজও আছে। রাষ্ট্র পরিচালনার মত জ্ঞান ও যোগ্যতা নিয়েও মানুষ মূর্তিকে সিজদা করে।

আল্লাহ কর্তৃক তাওফিক দেয়া প্রসঙ্গে একটি ঘটনা

আল্লাহ কর্তৃক তাওফিক দেয়া প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ল। এক ব্যক্তির ঘরে এক বৃদ্ধ কর্মচারী ছিল। বৃদ্ধের মনিব কখনো মসজিদেও যেত না। কোনদিন সিজদাও করেনি।

একদিন মনিব তার বৃদ্ধ কর্মচারীকে নিয়ে বাজার করার উদ্দেশে বের হল। পথিমধ্যে মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত হলে বৃদ্ধ নামায পড়তে চাইল। মনিব তাকে নানা তিরস্কার করার পরও বৃদ্ধ বলল, আপনি মনিব। আপনার কথা আমি মানব, তবে নামায আমাকে পড়তেই হবে। অগত্যা নামাযের অনুমতি দিতে হল। বৃদ্ধ মসজিদে গিয়ে নামাযে দাঁড়াল আর তার মনিব সিঁড়িতে বসে রইল। ফরয শেষ করে বৃদ্ধ সুন্নত পড়ল। মনিব মনে করল এবার আসবে। কিন্তু না, বৃদ্ধ আওয়াবিন নামাযের নিয়ত করল। বাইরে দাঁড়িয়ে মনিব খুব পেরেশান হয়ে রইল। বহু কষ্টে সবর করল। বৃদ্ধ দুই রাকাত শেষ করে সালাম ফিরালে মনিব জোরে ডাক দিয়ে বলল, জলদি আস।

বৃদ্ধ বলল, আমাকে আসতে দিচ্ছে না। এই বলে পুনরায় নিয়ত করল। বৃদ্ধের মনিব আগুন গরম হয়ে বসে রইল। দুই রাকাত শেষ করার পর বৃদ্ধ যখন সালাম ফিরাল মনিব তখন আগের মত জলদি আসতে তাড়া দিল। কিন্তু বৃদ্ধ সেই আগের মতই 'আমাকে আসতে দিচ্ছে না'– বলে নামাযে দাঁড়িয়ে গেল। বৃদ্ধ রেগেমেগে একাকার হয়ে বসে রইল। ছয় রাকাত

নামায শেষ করে বৃদ্ধ যখন এল তখন মনিব জানতে চাইল, কে তোমাকে আসতে দিচ্ছিল না?

বৃদ্ধ সরল উত্তর দিল, আপনাকে যে ভেতরে আসতে দিচ্ছিল না, সেই আমাকে বাইরে আসতে দিচ্ছিল না।

সুতরাং প্রকৃত কথা হলো, যে নামায পড়ে সে তার নিজের আগ্রহে নয়, আল্লাহর দেয়া তাওফিকের কারণেই পড়ে। লক্ষ লক্ষ জ্ঞানী ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু সিজদার তাওফিক হচ্ছে না। তাই যারা সিজদা করছে না তারা যেন মনে না করে, আমি সিজদা করছি না; বরং তাদের দ্বারা করানো হচ্ছে না। আর যারা সিজদা করতে পারছেন তারাও নিজের থেকে করছেন না, তাদেরকে কবুল করে নেয়া হয়েছে, তাদের দ্বারা করানো হচ্ছে। ইবাদত পরিত্যাগকারী যেন না বলে, আমি ইবাদত ছেড়ে দিয়েছি। তার কী ক্ষমতা আছে ইবাদত ছেড়ে দেয়ার? তাকে কবুল করা হয়নি, তাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ইবাদত করতে পারা না পারা সম্পূর্ণ আল্লাহর তাওফিকের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। তাই নেকের কাজ করে কেউ যেন গর্ব না করে।

অহংকার আমলকে ধ্বংস করে দেয়

হাদীস শরীফে এসেছে, কোন বান্দা যদি বলে, হে আল্লাহ! আমি নামায পড়েছি, আমি রোযা রেখেছি– তাহলে আল্লাহ তাআলা সাথে সাথে বলেন, আরে নির্বোধ! তুমি কী করেছ? শক্তি তো আমি তোমাকে দিয়েছি। তোমার মধ্যে ইবাদতের ইচ্ছা আমি তৈরি করেছি, তোমার সামর্থ আমারই দেয়া, কী তুমি করেছ? আর সবকিছু করে কেউ যদি এমন বলে– হে আল্লাহ! আমার দ্বারা তো কিছুই হয়নি, যা কিছু হয়েছে তার সবই তোমার অনুগ্রহ। তুমি অনুগ্রহ না করলে আমি নিয়তও করতে পারতাম না, আমলও করতে পারতাম না। তোমার করানো কাজই আমি করে যাচ্ছি। আমি তো কিছুই করিনি। তখন আল্লাহ তার প্রশংসা করেন। বলেন, ইচ্ছা তো তুমিই করেছিলে, মসজিদ পর্যন্ত তুমিই গিয়েছিলে, তুমিই তো সবকিছু করলে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যে কৃতিত্ব দাবী করছে আল্লাহ তার দাবীকে প্রত্যাখ্যান করছেন আর যে সকল কৃতিত্ব আল্লাহকে দিচ্ছে আল্লাহ সে কৃতিত্ব ব্যক্তিকে দিয়ে পুরস্কৃত করছেন। তাই ইসলামে যা কিছু হয় তা আল্লাহর অনুগ্রহের দ্বারাই হয়, বুদ্ধি ও জযবা দ্বারা হয় না।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কাউকেই তার আমল নাজাত দেবে না। পরকালে কেবল আল্লাহর অনুগ্রহের মাধ্যমেই নাজাত মিলবে।

এ কথা শোনে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, আপনার আমলও কি আপনাকে নাজাত দেবে না?

এমন প্রশ্নের কারণ হল, নবীগণের আমল অনেক ওজনদার, অনেক মর্তবাশীল হয়ে থাকে। উম্মতের আমল ও তাঁদের আমলের মধ্যে আসমান জমিন পার্থক্য। কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, আমার আমলও আমাকে মুক্তি দেবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ অনুগ্রহ করেন।

[যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে পরবর্তী কিছু অংশ রেকর্ড হয়নি।]

স্বপ্নের তাবির

ইউসুফ (আ.) যুবকদেরকে যে উদ্দেশ্যে ওয়াজ করেছিলেন তা সফল হয়েছিল। তারা ঈমান গ্রহণ করেছিল। মুমিন হয়ে যাওয়ার পর তিনি তাদের স্বপ্নের তাবির বলে দিলেন– যে মদ নিঙড়াতে দেখেছে তার অপরাধ ক্ষমা করা হবে এবং সে পুনরায় পূর্বের দায়িত্বে ফিরে যাবে আর যে নিজ মাথায় রুটি বহন করতে ও তা থেকে পাখিদের খেতে দেখেছে তার ফাঁসি হবে।

পরবর্তীতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর তাবিরই বাস্তবায়িত হয়েছিল।

নসিহত কেমন হওয়া উচিত

কাউকে উপদেশ দেয়ার সময় ভালবাসা নিয়ে উপদেশ দিতে হবে। উদ্দেশ্য থাকতে হবে যেন সে তা কবুল করে। অনেকের নসিহতের ধরন এমন হয়ে থাকে যে, আমার দায়িত্ব আমি আদায় করে যাব, সে চাই জান্নাতে যাক বা জাহান্নামে। নসিহতের পদ্ধতি এটা নয়। নবীগণ এভাবে নসিহত করতেন না। তাঁদের নসিহতের ধরন ছিল সন্তানের প্রতি পিতার নসিহতের মত। পিতা দায়িত্বশীলতার সাথে সন্তানকে উপদেশ দিয়ে থাকেন। প্রয়োজনে

আদর করেন, প্রয়োজনে শাসন করেন। আশার কথা শোনান, সর্বনাশের ভয় দেখান। সার্বিক প্রচেষ্টায় পিতা চান তার সন্তান যেন সঠিক পথে চলে আসে। নবী রাসূলগণও তদ্রূপ উম্মতের প্রতি দায়সারা দায়িত্ব পালন করেন নাঃ বরং উম্মতকে হেদায়াতের পথে নিয়ে আসার জন্য নসিহত করেন।

সুতরাং কখনো ভয় দেখান, কখনো আদর করেন। কখনো দুনিয়ার কল্যাণের লোভ দেখান, কখনো পরকালের নেয়ামতের লোভ দেখান। আপ্রাণ প্রচেষ্টায় তাঁরা চান, যে কোনভাবে মানুষ যেন মেনে নেয়, দীনের পথে আসে।

উম্মতগণ নবীগণের খলিফা হয়ে থাকেন বলে তাদেরও দায়িত্ব হয়ে যায় পরস্পরকে নসিহত করা। সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ-এর দায়িত্ব পালন করা। যাতে উম্মতের সবাই সঠিক পথে চলে আসে। কাউকে অন্যায় করতে দেখে কখনো তাকে নিষেধ করব না– এমন যেন না হয়ে যায়। তাহলে সকল উম্মত ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে। কারো মধ্যে কোন অন্যায় দেখলে কোন কোন সময় ভালবাসা নিয়ে তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। সে আজ না হয় কাল, কাল না হয় কোন একদিন তো মেনে নেবে। নিরাশ হওয়াও উচিত নয়, আবার কঠোরভাবেও বলা উচিত নয়।

হযরত শাহ ওলীউল্লাহ (রহ.)-এর সাহেবজাদা হযরত আবদুল কাদের (রহ.) ছিলেন একজন কামেল ওলী ও বড় মুহাদ্দিস। একদিন তিনি মসজিদে বসেছিলেন। এমন সময় দেখলেন, এক নওজোয়ান ছাত্র তাড়াহুড়ো করে অযু করল। পা ধোয়ার পরও তার গোড়ালী শুকনো রইল। হাদীসে এসেছে–

ويل للاعقاب من النار

যে পায়ের গোড়ালী শুকনো থাকবে তা জাহান্নামে জ্বলবে।

শাহ সাহেব ঐ ছাত্রকে নসিহত করলেন। অপূর্ব ছিল তাঁর নসিহতের ধরন। ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন– বাবা, আমার কাছে একটু বস। ছেলেটি এলে তার মাথায় হাত রেখে বললেন, বাবা! আমি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি, মাঝে মাঝে আমার এমন হয়, অযু করতে গেলে গোড়ালী শুকনো থেকে যায়। অথচ হাদীসে এসেছে, যে গোড়ালী শুকনো থাকবে তা

জাহান্নামে জ্বলবে। তুমি একটু দেখ তো, আমার গোড়ালী শুকনো রইল কি না?

তাঁর কথা শুনে ছেলেটি খুবই অনুতপ্ত হয়ে বলল, হযরত! আপনার গোড়ালী কেন শুকনা থাকবে, এ গুনাহ তো আমার হয়ে গেছে। আমি তওবা করছি, সামনে কখনো এমন হবে না। পরিপূর্ণভাবে অযু করব।

শাহ সাহেব ছেলেটির পিঠ চাপড়ে দিয়ে আদর করলেন, দুআ করলেন এবং শাবাসী জানালেন। তিনি যদি ওভাবে না বলে ধমক দিতেন কিংবা জাহান্নামের ভয় দেখাতেন, তাহলে ছেলেটির মধ্যে বিপরীত প্রতিক্রিয়াও দেখা দিতে পারত। সুতরাং উপদেশ দেওয়ারও পদ্ধতি রয়েছে। ব্যক্তির মানসিকতা বুঝে ভালবাসা ও অনুরাগ নিয়ে কথা বললে অন্তরে তা প্রভাব বিস্তার করবে।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ওয়াজ থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত। সামান্য সুযোগ পেয়েই সাথে সাথে উপদেশ দিয়েছেন এবং অন্তরে ঈমান প্রবেশ করিয়েছেন। এটাই আমাদের সবার কর্তব্য হওয়া উচিত। সংশোধন ও মানার যোগ্যতা কারো মধ্যে সামান্য পরিমাণে দেখা গেলেই সত্য কথা উপস্থাপন করা উচিত। কিন্তু তা বলতে হবে ভালবাসা ও হেকমতের সাথে। হযরত ইউসুফ (আ.) এ পথ বাতলে দিয়েছেন এবং আল্লাহ তাঁকে পছন্দ করে কুরআনে উল্লেখ করেছেন। আর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে আমাদেরকে তার তালিম দিয়েছেন। দীনের পরিচয় লাভ করা যেমন ফরয, বান্দার পথকেও ঠিক করা তেমন ফরয।

নসিহতের সৌন্দর্য

নসিহত প্রদানে সৌন্দর্য হল একাকী নসিহত করা। ভর মজলিসে কাউকে সম্বোধন করে নসিহত করা হলে সে লজ্জিত হয়। এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। হাদীস শরীফে এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মজলিসে বায়ু নির্গমনজনিত কারণে অযু ছুটে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাদের মজলিসে কেউ যেন বিনা অযুতে না বসে। যার অযু ছুটে গেছে সে যেন অযু করে আসে। কিন্তু

ঐ বেচারার জন্য ওঠা কঠিন হয়ে গেল। উঠলেই সবার সামনে লজ্জা পেতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, যার অযু নেই সে যেন উঠে যায়। আমাদের মজলিসে বিনা অযুতে যেন না বসে। কিন্তু এবারও ঐ ব্যক্তির ওঠার সাহস হল না। এ সময় হযরত আব্বাস (রা.) আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাদের সকলকে অযু করে আসার অনুমতি দিন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিলেন। সকলে গিয়ে অযু করে এলেন। ঐ ব্যক্তি অন্তরালে রইলেন। সুতরাং ভর মজলিসে যদি সম্বোধন করে কাউকে উপদেশ দেয়া হয় তাহলে সে লজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই হয়তো একাকী উপদেশ দিতে হবে, না হয় কাউকে সম্বোধন না করে সাধারণভাবে বলে যাবে।

লোক সমাবেশে নসিহতের পদ্ধতি

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাস ছিল, যদি কারো থেকে অন্যায় প্রকাশ হয়ে পড়ত তাহলে সকলকে মসজিদে একত্র হতে বলতেন। তিনি এভাবে বলতেন না যে অমুকের থেকে অন্যায় প্রকাশ পেয়েছে কিংবা অমুকে ভুল করেছে। বরং বলতেন–

مابال اقوام يفعلون كذا اوكذا

লোকজনের কী হল, তারা এমন এমন অপরাধ করে, এই এই অন্যায় করে।

কারো নাম নিতেন না, যাতে সে লজ্জিত না হয়। সুতরাং নসিহত করার সময় এটাও লক্ষ রাখা কর্তব্য যে, কেউ যেন লজ্জিত না হয়। স্নেহ, ভালাবাসা ও হেকমতের মাধ্যমে নসিহত করতে হবে।

নসিহত করা শুধু আলেমগণেরই দায়িত্ব নয়

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ওয়াজের ঘটনা আমি আপনাদের শুনিয়েছি এ কারণে যে, এ দায়িত্ব আমাদের উপরেও বর্তায়। যা আমরা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছি। এখন ব্যাপক ভিত্তিতে এ অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, নসিহত করা

কেবল আলেমগণের কাজ, সাধারণ লোকজনের কাজ নয়। এটা একটা ভুল ধারণা। উলামাগণ তাদের স্থানে নসিহত করবেন, সাধারণ মানুষ তাদের স্থানে নসিহত করবেন। প্রত্যেকেরই কর্তব্য তার দায়িত্ব পালন করা। এতে অন্যকিছু যদি নাও হয়, নিজে অন্তত অন্যায় ও খারাবী থেকে রক্ষা পাবেন।

সুতরাং সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের নিষেধ সত্যের তাবলীগ, মাসআলার প্রচার– এগুলো জরুরিয়াতে দীন তথা দীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রত্যেক মুমিন নারী-পুরুষের জন্য আবশ্যক। এজন্যই আমি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ওয়াজ আপনাদেরকে শুনিয়েছি। আমার কথা হলে হয়তো বলতে পারতেন, আপনার কথা শোনার দায় আমাদের নেই। কিন্তু যখন পয়গাম্বরের ওয়াজ শোনানো হবে তখন তো মানতেই হবে। এজন্যই আমি কুরআন থেকে নবী ইউসুফ (আ.)-এর ওয়াজ শুনিয়েছি এবং তার কিছু ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছি।

আমার মনে হয় এ আলোচনায় উদ্দেশ্য আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ এবং দীনের নসিহত সর্বব্যাপী হওয়া আবশ্যক। এর ব্যাপক প্রসার তখনই হবে যখন ইলম ও তালিমের প্রসার ব্যাপক হবে। কিন্তু তার অপেক্ষা করা যাবে না। কারো একটি মাসআলা জানা থাকলে সে সেই একটিই বর্ণনা করবে। কারো দুটি জানা থাকলে সে দুটি বর্ণনা করবে। কোন আলেমের পঞ্চাশটি জানা থাকলে সে পঞ্চাশটি বর্ণনা করবে। মোট কথা, দীনের ব্যাপক চর্চা হওয়া একান্ত আবশ্যকীয়।

আল্লাহ তাআলা তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী চলার তাওফিক আমাদেরকে দান করুন। আমীন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত